১৭ জুন ২০১৮

প্রেম

দুইয়ে পক্ষ

নিউ ইন্ডিয়া গ্লোবাল মেডিক্লেম পলিসি

ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে চিকিৎসা - নিউ ইন্ডিয়ার প্রতিশ্রুতি

পৃথিবীর অগ্রণী চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে (WLMCs) চিকিৎসার খরচ এই পলিসির অন্তর্ভুক্ত

- ক্যানসার ধরা পড়লে প্রাথমিক স্তরে চিকিৎসা
- করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফ্‌ট (সিএবিজি) সার্জারি
- নিউরোসার্জারি
- হার্ট ভালভ সার্জারি
- লিভিং অর্গ্যান ডোনর ট্রান্সপ্লান্ট
- বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট

- পলিসি শুধুমাত্র ভারতে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের ইস্যু করা যাবে। NRI, OCIs, PIOs বা ভারতে চাকরিসূত্রে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকরা এই পলিসির আওতায় আসবেন না।
- এই প্রডাক্টটি যে কোনও যোগ্য ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ, যাঁর ৮ লাখ টাকা বা তার বেশি টাকার স্বাস্থ্যবিমা করা আছে। যে কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রিমিয়ামের উপর ৫% ছাড় দেওয়া হবে, যদি তাঁর নিউ ইন্ডিয়ার স্বাস্থ্যবিমা পলিসি করা থাকে।
- প্রবেশের বয়সসীমা ১৮ থেকে ৬৫ বছর।

ঝুঁকির বিষয়ে আর নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও জানতে হলে অনুগ্রহ করে কোনার অংশে পলিসি ডকুমেন্ট খুঁটিয়ে পড়ে নেবেন। *শর্তাবলী প্রযোজ্য

প্রস্তাবকদের কোন কল ও মিথ্যা*জোচ্চুরিজনিত অফার থেকে সাবধান : IRDAI জনসাধারণকে সুস্পষ্ট করছে যে : IRDAI বা তার আধিকারিকরা কখনওই কোনও বিমা বা আর্থিক পণ্য বা নিবেশ সংক্রান্ত ছিনিয়ে বিক্রির সঙ্গে যুক্ত নয়। IRDAI কোনও বোনাস ঘোষণা করে না। জনসাধারণ এরকম কোনও ফোন কল পেলে অনুগ্রহ করে ফোন করলে বিবরণ ও নম্বর সহ পুলিশে অভিযোগ জানান।

UIN: NIAHLIPI 8121V0117 18

A	B
USD ০.৫ মিলিয়ন (USD ১ মিলিয়ন লাইফটাইম (এশিয়া ট্রিটমেন্ট প্ল্যান)	USD ১ মিলিয়ন (USD ২ মিলিয়ন লাইফটাইম (ওয়র্ল্ডওয়াইড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান)

www.newindia.co.in Toll free 1800-209-1415

NEW INDIA ASSURANCE

দি ন্যু ইন্ডিয়া এশ্যুরেন্স কংপনী লিমিটেড
The New India Assurance Co. Ltd

Regd & Head Office: New India Assurance Bldg., 87, M.G. Road, Fort, Mumbai-400 001, INDIA

IRDAI REGN. No. 190 CIN: L66000MH1919GOI000526 Advt. No. NIA/CCD/17-18/63

দেশ

২ আষাঢ় ১৪২৫ • ১৭ জুন ২০১৮ • ৮৫ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

সূচিপত্র

প্রচ্ছদকাহিনি

১৪

দুইয়ে পক্ষ

'দেশ' পত্রিকার আয়োজনে মুখোমুখি দুই কবি— শ্রীজাত ও বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের আন্তরিক কথোপকথন স্পর্শ করে গেল কবিতা থেকে ব্যক্তিগত, তাঁদের সত্তার প্রায় সব স্তর। সূত্রধর পৌলোমী সেনগুপ্ত।

মন্তব্য

১০

যুগাবতার, যুগাবসান

রুশ দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ২০১৮-র সঙ্গেই কিন্তু শেষ হতে চলেছে লিওনেল মেসি-ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর প্রজন্ম। লিখছেন ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়।

ভালোবাসার বইঘর পত্রভারতী

সমরেশ মজুমদার
বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত নবকুমার ট্রিলজির শেষ পর্ব
ফিল্মস্টার নবকুমার 200/-
প্রথম কলিকাতায় নবকুমার 300/-
দ্বিতীয় ক্যালকাটায় নবকুমার 200/-

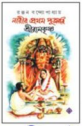

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
নারীর প্রথম পূজারি শ্রীরামকৃষ্ণ 200/-
প্রাণসখা বিবেকানন্দ [৩ খণ্ডে]
১ম 225/- ২য় 250/- ৩য় 325/-

চুমকি চট্টোপাধ্যায়
৩২টি আলোমাখা মধুর গল্পময়
সুন্দর আর ভালো 200/-

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
গায়ে কাঁটা দেওয়া ৬ কল্পবিজ্ঞান
সবুজ মানুষ 300 /-
বারে বারে আসে। সবুজ মানুষ। নরসের। টুই। দানো। রাজলক্ষণ

জয়দীপ চক্রবর্তী চার রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার
জাদুকরের ল্যাবরেটরি 200/-

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
মোটেও ছোটদের নয়!
বড়দের বারো 175/-
গোপন প্রেমের গল্প 150/-
ভীষ্ম-কাহিনি তুমি, পিতামহ 100/-

সৈকত মুখোপাধ্যায় ভয়ংকর, নৃশংস, আতঙ্ক
ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রূণ 180/-
নাইটির প্রতি বারমুডা 180/-
অর্কিড রহস্য 175/-

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
জীবন্ত উপবীত 225/-
বন্দর সুন্দরী 350/- খাজুরাহ সুন্দরী 225/-

পত্রভারতী bookspatrabharati.com এখন সর্বত্র হাজির
বইঠেক বেঙ্গালুরু। বাতিঘর ঢাকা-চট্টগ্রাম। কষে কষা রেস্তোরাঁর সব আউটলেট (কলকাতা, শিলিগুড়ি, বেঙ্গালুরু), অক্সফোর্ড বুক স্টোর। স্টারমার্ক...ও সব অনলাইন প্ল্যাটফর্মে।
3/1 কলেজ রো কলকাতা 9 ফোন 9433075550, 9830806799

পুণ্য জন্মমাস

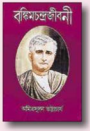

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী ৬০০.০০

বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য জীবনী এ-পর্যন্ত লিখিত হল না। অবশ্য জীবনী নামে অনেক গ্রন্থ আছে, তাদের মূল্য অস্বীকার না করেও বলা চলে যে, কোনওখানিই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবনের যোগ্য নয়— আক্ষেপ করে লিখেছিলেন বঙ্কিম-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। তিরিশ বছর ধরে বঙ্কিম-গবেষণায় আত্মনিয়োজিত আরেক বঙ্কিম-বিশেষজ্ঞের রচিত এই গ্রন্থ বুঝি সেই আক্ষেপকেই এতদিনে দূর করল।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ মঠ: উৎস সন্ধানে ২৫০.০০

আমাদের জাতীয় জীবনে আনন্দ মঠের ভূমিকা অনন্য। অসাধারণ প্রভাবশালী এই উপন্যাস পরাধীনতার বন্ধনমোচনের সংগ্রামে দুর্জয় এক হাতিয়ার। এই গ্রন্থের প্রথমভাগে আনন্দ মঠ রচনার সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে আলোচনা এবং তার সপক্ষে তথ্যাদির সমাবেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে আছে আনন্দ মঠের প্রথম সংস্করণের ফোটোকপি। নানা স্বল্পজ্ঞাত তথ্য ও নতুন ব্যাখ্যার সমাবেশ পাঠকদের নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দ মঠ অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধ করবে।

উপন্যাস সমগ্র

কমলকুমার মজুমদার
উপন্যাস সমগ্র ৪০০.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
উপন্যাস সংগ্রহ ৬৫০.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৭৫০.০০ • ২য় ৭৫০.০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৬০০.০০ • ২য় ৬০০.০০
৩য় ৭৫০.০০ • ৪র্থ ৪৫০.০০ • ৫ম ৫০০.০০

প্রমথনাথ বিশী
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৬০০.০০ • ২য় ৬০০.০০

বিমল কর
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৪০০.০০ • ২য় ৪৫০.০০
৩য় ৬০০.০০ • ৪র্থ ৬০০.০০ • ৫ম ৬০০.০০
৬ষ্ঠ ৬০০.০০ • ৭ম ৭৫০.০০ • ৮ম ৬০০.০০
৯ম ৬০০.০০

রমাপদ চৌধুরী
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৩৫০.০০ • ২য় ৩৫০.০০
৩য় ৫৫০.০০ • ৪র্থ ৫৫০.০০ • ৫ম ৪০০.০০
৬ষ্ঠ ১২৫.০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
উপন্যাস সমগ্র ৪৫০.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৪৫০.০০ • ২য় ৫০০.০০
৩য় ৫০০.০০ • ৪র্থ ৪৫০.০০ • ৫ম ৫০০.০০
৬ষ্ঠ ৪৫০.০০ • ৭ম ৭৫০.০০ • ৮ম ৬০০.০০
৯ম ৬০০.০০

সন্তোষকুমার ঘোষ
উপন্যাস সমগ্র (দুখণ্ড একত্রে) ১০০০.০০

সমরেশ মজুমদার
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৬৫০.০০
২য় ৭৫০.০০ • ৩য় ৭৫০.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৫০০.০০ • ২য় ৬০০.০০
৩য় ৬০০.০০ • ৪র্থ ৬০০.০০ • ৫ম ৬০০.০০
৬ষ্ঠ ৬০০.০০ • ৭ম ৬০০.০০ • ৮ম ৬০০.০০
৯ম ৬০০.০০ • ১০ম ৫০০.০০ • ১১শ ৭৫০.০০
১২শ ৬৫০.০০ • ১৩শ ৭৫০.০০

সুচিত্রা ভট্টাচার্য
উপন্যাস সমগ্র ১ম ৬০০.০০
২য় ৬০০.০০ • ৩য় ৬০০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭ • ই-মেল publishers@anandapub.in

সূ চি প ত্র

৬৬

ভ্র ম ণ

জলের মধ্যে শহর

সেই সুদূর কুয়াশায় ভরা মধ্যযুগ থেকে রেনেসান্সের উষালগ্ন আর ফ্যাসিস্ট রাত্রির অন্ধকার পেরিয়ে, ট্যুরিস্টনন্দিত যুগে এসেও ভেনিস তার চরিত্র বদলায়নি। লিখছেন কৌশিক সেন।

৭৯

গ্র ন্থ লো ক

দুর্গার বিবর্তনের ইতিহাস

আলোচ্য 'হিরোইক শাক্তিজ্বম' গ্রন্থের লেখক বিহানী সরকার দুর্গার বিবর্তনের গবেষণায় পাথরে উৎকীর্ণ লিপি থেকে শুরু করে পুরাণ, শাস্ত্র, সাহিত্য সবকিছু গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। আলোচনায় কৃষ্ণা বসু।

২১ জুন সংগীত দিবস দে'জ-এর সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ সম্ভার

আলপনা রায় — গানের নাটক নাটকে গান ৪৫০
আলপনা রায় সম্পাদিত — রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান ১০০
সর্বানন্দ চৌধুরী — একত্রে মিলিল যদি আলাউদ্দিন ও রবীন্দ্রনাথ ১৫০
সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা [সম্পাদিত] (১ম) ৪০০
(বিষয় রবীন্দ্রনাথ)
প্রবীর গুহঠাকুরতা — রবীন্দ্রসঙ্গীত মহাকোষ (১) ৫০০ (২য়) ৮০০
কিরণশশী দে — রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামাণ্য সুর ৬৫
রবীন্দ্রসংগীত সুষমা ১৫০
বিবিধ প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রগীতিচর্চা ৫০
রবীন্দ্রসংগীত; রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ ৩৫
মানস বসু — জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জীবনধারা ও গান ১০০০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত শেষ সংস্করণ
গীতবিতান দুই খণ্ডে একত্রে ৬০০
(তত্ত্ব সম্পূরণ ও সংযোজন : প্রবীর গুহঠাকুরতা)
অরুণকুমার বসু — বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত ৪৫০

শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ (৫ম) ৪০০ (৬ষ্ঠ) ৪০০ (৭ম) ৩৫০
পঞ্চম খণ্ডে কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, উর্বশীর হাসি, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ
ষষ্ঠ খণ্ডে কবির অভিপ্রায়, এ আমির আবরণ, নির্মাণ আর সৃষ্টি
সপ্তম খণ্ডে ছন্দোময় জীবন, দামিনীর গান, কল্পনার হিস্টিরিয়া, অবিশ্বাসের বাস্তব।

উজ্জ্বলকুমার দাস — তুমি রবে নীরবে [সুচিত্রা মিত্র সম্পর্কে গ্রন্থ] ৭৫
দেবব্রত বিশ্বাস — দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে ৫০০
পুলক চন্দ সম্পাদিত — জাগরণের চারণ মুকুন্দ দাস ও তাঁর রচনাসমগ্র ৪৫০
রেবা মুহুরী — বিঠ্ঠনবাঈ [সম্পাদনা : ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায়] ১৮০

অভীক মজুমদার ও ঋতচেতা গোস্বামী
জন্মদিনের কালিকাপ্রসাদ ২৯৯

সুমিত্রা সেন — স্মৃতিসুধায় ১৫০
শান্তিদেব ঘোষ — স্মৃতি ও সঞ্চয় ১৫০
সলিল চৌধুরী — রচনাসংগ্রহ ৬৫০
হেমাঙ্গ বিশ্বাস — রচনাসংগ্রহ (১) ৬৫০
কিংবদন্তিসম গীতিকার-সুরকারের সমস্ত বাংলা গানের অখণ্ড সম্ভার
প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতকারের গান ও গানবিষয়ক রচনার একত্র সংকলন

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — রচনাবলী (৩য়) ৬০০
সুর ও সঙ্গতি, কথা ও সুর এবং অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলি

কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — মাহ্‌ফিল ১২৫ খেয়াল ও হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের অবক্ষয় ১৫০
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — গঙ্গা আমার মা : পদ্মা আমার মা ২০০
সন্ধ্যা সেন — সুরের আগুন ৪০০
নিত্যপ্রিয় ঘোষ — মেঠো সুরে তানসেন ৪০
শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় — ছোটদের গানের ক্লাশ ৮০

প্রকাশিত হচ্ছে
শুভজিৎ মজুমদার
আলাপ
খ্যাতনামা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকার ও যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীদের সাক্ষাৎকারের মূল্যবান সংকলন

দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
ফোন : 2241-2330 Fax : (033) 2219-7920

সংসদ -কিশোর সাহিত্য

চঞ্চলকুমার ঘোষ
সুরেশ্বরের অভিযান ₹ 90

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়
ইকারাস ₹ 80

রাজেশ বসু
বাদুড়বাড়ির রহস্য ₹ 80
কে? ₹ 40
নেফ্রিখেফের কবলে ₹ 65
উল্কাপাতের দ্বীপে ₹ 110
নফরগড়ের হাম্বিরমহল ₹ 90
পালামপুরের ট্রেনে ₹ 75
মেরুদ্বীপে ভয়ংকর ₹ 65
মৌমাছির বিষ ₹ 65

অনির্বাণ বসু
মঙ্গল গ্রহের পাথর ₹ 65

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
রাতের ট্রেনের সঙ্গী ₹ 125

প্রসিত রায়চৌধুরী
কিশোর ঐতিহাসিক উপন্যাস ₹ 50

চিত্তরঞ্জন মাইতি
মুমবা ₹ 100

পলাশ বরন পাল
নানা দেশ নানা গল্প ₹ 100

শ্যামল দত্ত চৌধুরী
গুপ্তধনের ঠিকানা ₹ 70
পাগল পাদরি ₹ 65

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চাঁদের পাহাড় ₹ 100
হিরে মানিক জ্বলে ₹ 95
মিস্‌মিদের কবচ ₹ 65
আম আঁটির ভেঁপু ₹ 90

শিশির বিশ্বাস
আম বাগানের পদ্মগোখরো ₹ 50
মৃণ্ময়ী মন্দিরের তোপদার ₹ 65
সোনার পাহাড় ₹ 100
পাথরের চোখ ₹ 100

ইরেন চট্টোপাধ্যায়
রোব্বোস ₹ 30
অচেনা দ্বীপের আতঙ্ক ₹ 80

অনন্যা দাশ
যক্ষমূর্তি রহস্য ₹ 85
মৎস্যকন্যার অভিশাপ ₹ 70
নাভাহোদের খপ্পরে ₹ 70

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
রানি হাটশেপসুটের মমি ₹ 60
আঁধার রাতের বন্ধু ₹ 75
যুদ্ধ যখন জঙ্গলে ₹ 65

কৃষ্ণেন্দু দেব
শোলাইপুরে শোরগোল ₹ 75

সৈকত মুখোপাধ্যায়
মারাং গ্রামের পান্থশালা ₹ 65

অমিতাভ পাল
গজমুক্তা রহস্য ₹ 100
ইনফিনিটি থেকে ফেরা ₹ 60

উল্লাস মল্লিক
ভূত মন্তর ফুস ₹ 70

রতনতনু ঘাটী
সব গল্পই ভূতের ₹ 100

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ₹ 40

অভিজিৎ সেনগুপ্ত
লাল প্রবালের ফুল ₹ 75

সম্পাদনা: রামরঞ্জন রায়
কিশোর গল্প: প্রেমেন্দ্র মিত্র ₹ 150

সম্পাদনা: কার্তিক ঘোষ
কিশোর সাহিত্য সম্ভার: প্রেমেন্দ্র মিত্র ₹ 150

সম্পাদনা: উত্তম ঘোষ
কিশোর গল্প: সুবোধ ঘোষ ₹ 100

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
কিশোর গল্প ₹ 230

হেমেন্দ্রকুমার রায়
কিশোর রহস্য উপন্যাস ₹ 225
জয়তু জয়ন্ত ₹ 85

সংসদ-এর বই পাওয়া যায়

স্টার মার্ক : লর্ড সিনহা রোড, সিটি সেন্টার, সাউথ সিটি, মনি স্কোয়ার। স্টোরি : এলগিন রোড, দমদম, দুর্গাপুর। কথাশিল্প : কলেজ স্ট্রিট। দাশগুপ্ত এন্ড কোং : কলেজ স্ট্রিট।
বাংলাদেশ : বাতিঘর (ঢাকা) বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মোটর ঢাকা ১০০০। ☎ ০১৯১১-৫০৯৬৯৬
(চট্টগ্রাম) গ্রেসক্রাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড। ☎ ০৩১২৮৬৯৯১১/০১৭৩৩০৬৭০০৫

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯
ফোন : ২৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫ ফ্যাক্স : ৩৩ ২৩৬৩ ৩৫০৮
e-mail : ss_samsad@yahoo.in
website : www.samsadbooks.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৯

মন্তব্য ১০

প্রচ্ছদ কাহিনি

দুইয়ে পক্ষ • আলাপচারিতায় পৌলোমী সেনগুপ্ত ১৪

দেশ বিতর্ক ২৪

জীবন যে রকম

সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত নেতৃত্ব • সুমিত মিত্র ২৭

কবিতা

পিনাকী ঠাকুর • স্নেহাংশু বিকাশ দাস • সুনীলকুমার মোদক
সঙ্ঘমিত্রা হালদার • অর্ঘব সাহা • বিতস্তা ঘোষাল
শ্রাবণী খাঁ • তাপস রায় • সুমনা ভট্টাচার্য ২৮

গল্প

পরিযায়ী • স্বপ্না মিত্র ৩২
রগড় • দেবব্রত পাল ৪০
ভুলভুলাইয়া • প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৬
পুষ্যি • দেবাশিস চৌধুরী ৫২

ধারাবাহিক উপন্যাস

জোনাকিদের বাড়ি • স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ৫৭

ভ্রমণ

জলের মধ্যে শহর • কৌশিক সেন ৬৬

পরবাস থেকে

গোপন কথাটি • মণীশ নন্দী ৭৭

শিল্পসংস্কৃতি ৭১ • গ্রন্থলোক ৭৯ • চিঠিপত্র ৮৩
নামমাত্র ৮৯ • সুদেকু ৯০ • শেষকথা ৯০

প্রচ্ছদের ফোটো: শুভম দে সরকার

দেশ ওয়েবসাইট: www.desh.co.in

ইমেল: desh@abpmail.com

এগজ়িকিউটিভ এডিটর, বাংলা ম্যাগাজ়িন পৌলোমী সেনগুপ্ত

সম্পাদক সুমন সেনগুপ্ত

এপিসি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রণীত্ব বিশ্বাস কর্তৃক ও প্রত্যুষ সরকার ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাহুল : ১.০০ টাকা (অন্যমান ও মণিপুর)

RNI vol. 61 issue 16 Regd 2537/57

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

কবিপক্ষে বিশেষ বই ৫০% বিশেষ ছাড়

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেসব গল্প ও উপন্যাস সিনেমা এবং নাটক হয়েছে (দুই খণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে)

মূল রচনার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও সমালোচনার তালিকা ইত্যাদি

প্রতি খণ্ড ৫৩০৲ • মাত্র কয়েকদিনের জন্য ২৫০ টাকায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচটি বাছাই উপন্যাস ৪৫০৲
নির্বাচিত পঞ্চাশটি গল্প ৪০০৲

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

মরণের ডাক (১০টি রহস্য-রোমাঞ্চ কিশোর উপন্যাস সংকলন) ৪০০৲
সাহারার সন্ত্রাস (১০টি রহস্য-রোমাঞ্চ কিশোর গ্রন্থ এক মলাটে) ৪০০৲
গা ছমছম রহস্য-রোমাঞ্চ ভৌতিক ৪০০৲
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বর্তমান সময়ের যশস্বী লেখকদের একটি করে বাছাই গল্প

রূপক চট্টরাজ সম্পাদিত

শুকতারার ১০১

কল্পবিজ্ঞান ও রহস্য গল্প ৪৫০৲
রূপকথার গল্প ৩৫০৲
হাসির গল্প ৩০০৲
গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩০০৲
ভূতের গল্প (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ২৫০৲
সেরা শুকতারা ১ম খণ্ড ১৬০৲
সেরা শুকতারা ২য় খণ্ড ১৪০৲

নবকল্লোলের ১০১

প্রেমের গল্প ২২৫৲
সরস গল্প ২২৫৲
বাছাই গল্প ২৫০৲
বিশ্বসাহিত্যের গল্প ২২৫৲
হাজারো রান্না ২০০৲
৫০ বছরে গল্পসমগ্র (১ম ও ২য় খণ্ড) ২৫০৲
নবকল্লোলের পঞ্চকন্যা (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩০০৲
পাঁচজন প্রথিতযশা লেখিকার উপন্যাস সংকলন

৫০০ টাকার ওপর নিচের ফোন নম্বরগুলিতে অর্ডার দিলে হোম ডেলিভারি ফ্রি
(033) 2350-4294 / 4295 / 7887

আমাদের বই ও পত্রিকা সম্বন্ধে জানতে লগ ইন করুন
www.devsahityakutir.com

অনলাইনে বই কিনতে যোগাযোগ করুন
readbengalibook.com, amazon, flipkart
ও আমাদের ওয়েবসাইটে

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
দূরভাষ - (০৩৩) ২৩৫০ ৪২৯৪/৯৫/৭৮৮৭
E-mail : dev_sahitya@rediffmail.com • Website : www.debsahityakutir.com

আমার হাঁটু আমার জীবন বিশ্বমানের নি-রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি

হাঁটুর আরথ্রাইটিস সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের অক্ষমতা এবং ব্যাথার অন্যতম প্রধান উৎস, যা জয়েন্ট কার্টিলেজের ক্ষয় –ক্ষতির কারণে ঘটে থাকে।এর ফলে হাঁটুর ব্যাথা,কাঠিন্য, হাঁটু ফুলে ওঠা,জয়েন্টের অক্ষমতা এবং অঙ্গবিকৃতির মত সমস্যাও দেখা দিতে পারে।পরবর্তীকালে স্বাভাবিক চলা ফেরায় অসুবিধা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবও বহুক্ষেত্রে দেখা যায়। অ্যাডভান্সড নি আরথ্রাইটিসের ক্ষেত্রে হাঁটুর প্রতিস্থাপনই একমাত্র নিশ্চিত সমাধান।

জানাচ্ছেন বিখ্যাত অর্থোপেডিক ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন **ডাঃ সন্তোষ কুমার**

কাদের হাঁটু প্রতিস্থাপন করা হয়?

ডাঃ সন্তোষ কুমার- যাদের অ্যাডভান্সড নি আরথ্রাইটিসের সমস্যা আছে,এই সমস্যার জন্য যদের সামাজিক,কর্মজীবন দিনের পরদিন বিঘ্নিত হচ্ছে, যারা প্রতিদিন বাইরে বেরোলে,সিড়ি দিয়ে উঠলে এবং বাড়িতে দৈনন্দিন কাজ করতে গেলে ব্যথা অনুভব করে থাকেন, তাদের নি রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন।

নি রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভবনা কতটা?

ডাঃ সন্তোষ কুমার-চিকিৎসা বিজ্ঞানে সফল সার্জারিগুলির মধ্যে হাঁটু প্রতিস্থাপন অন্যতম। এই সার্জারিটি বিগত কয়েক বছর ধরে আমি নিয়মিত করেছি। উপরন্তু নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনিকের ব্যবহারের ফলে সার্জারিটি আরও যথাযথ ভাবে করা সহজ হয়ে পড়েছে। এতে আরোগ্য লাভ অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা যায়। রোগী সার্জারির পরের দিন এমনকি সার্জারির দিনই হাটতে পারেন এবং তিনদিন পর বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। সার্জারির পরেরদিন টয়লেট যাওয়া এবং দুদিন পরে কিছু ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠাও সম্ভব। এমনকি কেউ কেউ অপারেশনের পরে এসে জানিয়ে গেছেন তাদের বয়স যেন ২০ বছর কমে গেছে, এমনই অনুভূতি নি রিপ্লেসমেন্টের পরে।নি রিপ্লেসমেন্ট যাতে ব্যথাহীন ভাবে ঘটে তার জন্য আমরা ব্যাপক রুপে রিসার্চ করে থাকি।

এক্ষেত্রে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনলজির ভূমিকা কি?

ডাঃ সন্তোষ কুমার- নি রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেকনলজি অভাবনীয় ভাবে যথাযথ ও নির্ভুলতার (prediction and precision) মাত্রাবৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে সমস্তরকমের অনিশ্চয়তাও দূরীভূত হয়। আমি ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার আসিস্টেড সিস্টেম ব্যবহার করে থাকি,এটি 'অর্থোপাইলেট' নামে পরিচিত, যা আরও উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

হাঁটুর ক্ষেত্রে সর্বত্তম ব্র্যান্ড কোনটি?

ডাঃ সন্তোষ কুমার- হাঁটুর ক্ষেত্রে সর্বত্তম ব্র্যান্ড বলে কিছু হয় না।এটা বোঝা উচিৎ সার্জারির ফলাফল তার যথাযথতার ওপর নির্ভর করে। ব্র্যান্ডের ওপর নয়।

'হাই ফ্লেক্সন নি' কী?

ডাঃ সন্তোষ কুমার- আমাদের সমাজে হাঁটু মুড়ে বসার(নি বেন্ডিং) উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়,বিশেষতঃ ধর্মীয় আচারের সময় যেখানে হাঁটুর ১৪৫° মুভমেন্ট প্রয়োজন। সাধারন নি রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এই মুভমেন্ট ৯০° হয়। হাই ফ্লেক্সন নি ব্যবহার করলে এই নি বেন্ডিং অনেক বেশী হয়।

ইমপ্ল্যান্টের স্থায়িত্ব কী প্রকার?

ডাঃ সন্তোষ কুমার- সার্জারির যথাযথতার উপর ইমপ্ল্যান্টের আয়ু নির্ভর করে, সিমেনটিং পদ্ধতি ইমপ্ল্যান্টের মেমোরিয়ালের ওপরও এর আয়ুস্কাল নির্ভরিত হয়। আমি চেষ্টা করি সারাজীবনের জন্যই নতুন ভাবে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করার।

এখন আপনার সমস্যা
whatsapp এর মাধ্যমেও
জানাতে পারেন
98319 11584

যোগাযোগ করুন
98312 66632
santdr@gmail.com
www.mykneemylife.org
Poorva to 56161

POORVA ORTHOPAEDIC

ডঃ সন্তোষ কুমার
বেলভিউ ক্লিনিক
রুম নং ঃ ১৫ ডক্টরস্ চেম্বার
৯, লাউডান স্ট্রীট, কোলকাতা ১৭

Private Chamber
Dr. Santosh Kumar
Knee Foundation
Plot 902,Laketown, Block-A,
Near Yes Bank,Kolkata-700089

রসিকতা, জনশ্রুতি মিলেমিশে একাকার

সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সংবাদ এখন অনেক দ্রুতগামী। আলোর গতিবেগের ন্যায় চরম ক্ষিপ্রগতিতে বিশ্বজুড়ে আছড়ে পড়ে সংবাদের নানা অনুষঙ্গ। বিশ্বের একপ্রান্তে ঘটে চলা ঘটনাবলির কথা হাজার হাজার মাইল দূরে পৌঁছে যায় নিমেষে। সংবাদপত্র বা টেলিভিশনও এত দ্রুততায় সংবাদ পরিবেশন করতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং সচেতনতার দিকটি নিয়ে ভাবার কথা বলা হয়ে থাকে। সামাজিক মাধ্যমগুলির অপব্যবহারও আধুনিক জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছে। সমস্যা গভীরতর হয়েছে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াকে একাসনে স্থান দেওয়ার ইতিউতি মানসিকতায়। দু'টি মাধ্যম যে পৃথক, সে ধারণা অনেকের মন থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে ক্ষণিকের জন্য। আর এর ফলে ইদানীং নানাবিধ অশান্তির উদ্রেক ঘটছে। সাম্প্রতিক অতীতে দেশের নানা প্রান্তে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন পোস্ট বা উৎসকানিমূলক সংবাদ-সূত্রের ফলে একাধিক অশান্তি এমনকী সংঘর্ষ-প্রাণহানিও ঘটেছে। অতি সম্প্রতি উৎসব উপলক্ষে সরকারি ছুটির ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল ফেলেছে। এ ঘটনায় জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার বিষয়টি ফের ভাবিয়ে তুলছে এবং এক্ষেত্রেও কীভাবে সূত্রের সত্যতা যাচাই না-করে বিষয়টি নিয়ে অহেতুক বিতর্কের সূত্রপাত হল, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। এমনিতে সরকারি স্তরে ছুটির তালিকা ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে, সেই সঙ্গে মানুষের ছুটিবিলাসের প্রবণতাও গগনচুম্বী আকার নিয়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে ছুটি সংক্রান্ত রসিকতা আর গুজব মিলেমিশে যাচ্ছে এবং তা প্রচারিতও হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়নি অথবা সম্প্রচারিত হয়নি, তা মুহূর্তে ভারচুয়াল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। তৎক্ষণাৎ তা থেকে ভেসে আসছে নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া— এটি বিপজ্জনক প্রবণতা। নিরবচ্ছিন্ন ছুটির কথা সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করলে, নিশ্চিতভাবে সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনে তা সংবাদ-শিরোনাম হত। সেরকম যখন কিছু ঘটেনি, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র উড়ো খবর অথবা ভুয়ো বিজ্ঞপ্তির ওপর ভরসা করার যৌক্তিকতা কোথায়! যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন, তাঁদের বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। সরকার বা প্রশাসন নিশ্চয়ই জনমানসে প্রভাব বিস্তারকারী কোনও ঘোষণা হোয়াটসঅ্যাপ করে জনতাকে জানাবেন না। এই সব ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে এবং রেডিয়ো-টেলিভিশনে তা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত হবে। দায় শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। সোশ্যাল মিডিয়াতেও বহু ক্ষেত্রে তথ্য ও সংবাদের সঠিক সম্পাদনা হয় না, ই-দুনিয়ায়তেও নানা অপরাধ ক্রমবর্ধমান। এসব অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা মনে রেখে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের আরও সতর্ক হতে হবে। জনশ্রুতির ওপর ভরসা না করে সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে বড়সড় কোনও বিপর্যয় ঘটতে পারে।

নিরবচ্ছিন্ন ছুটির কথা সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করলে, নিশ্চিতভাবে সংবাদপত্রে অথবা টেলিভিশনে তা সংবাদ-শিরোনাম হত। সেরকম যখন কিছু ঘটেনি, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র উড়ো খবর অথবা ভুয়ো বিজ্ঞপ্তির ওপর ভরসা করার যৌক্তিকতা কোথায়!

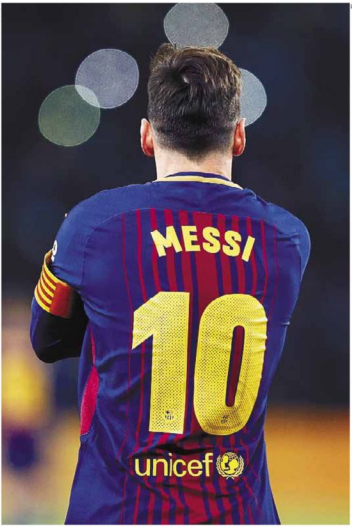

লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর খেলা একসঙ্গে, একই যুগে, এমনকী একই লিগে দেখতে পেয়েছি আমরা

ফু ট ব ল

যুগাবতার, যুগাবসান

ফুটবল ইতিহাসের এক অতি রোম্যান্টিক পর্বের অবসান।

ধৃ তি মা ন গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

ক্রীড়ার জগতের সঙ্গে স্বপ্নপূরণ... প্রায়-অসম্ভব স্বপ্নপূরণের জগতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তার। আর এর মধ্যে ফুটবলের জায়গাটা যেন আরও কিছুটা বিশেষত্বের। সাবঅল্টার্নকে জিতিয়ে দেওয়ার, সব হিসেব মাঠে বুঝে নেওয়ার খেলা যে এটিই। এখানে দামি কিটের প্রয়োজন নেই, রাজারাজড়ার মানানসই সাদা ফ্লানেল নেই। আছে একটা গোলক এবং স্কিল। যে-কারণে মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্ট ইয়র্কশায়ারের খেলাটির ওই ঐতিহাসিক মূল্য। রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত অবস্থায় মাঠে নামছে ২২জন খেলোয়াড়। ফলে একটা কার্নিভালেস্ক, সব স্তর মিলিয়ে দেওয়ার আবহ আছে খেলাটিতে। হ্যাঁ, অনেকেই বলবেন ফুটবল আর এত সহজ জায়গায় নেই, সেখানে বহু টাকা, অসাধারণ জুতো, সুইঙ্গিং বল ইত্যাদির কাহিনি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এই টাকা যে-পর্যায়ে আসে, তার আগের জগৎটি কিন্তু খুব সাধারণ। এবং সে-কারণেই খেলাটির ওই রোম্যান্স। হতদরিদ্র বাড়ির, প্রায়-অশিক্ষিত, অভব্য ছেলে শুধুমাত্র স্কিলের জোরে খ্যাতি, যশ, অর্থের শিখরে উঠতে পারে এই খেলায়। সেদিনের পেলে-মারাদোনা থেকে আজকের রোনাল্ডো, মেসি, নেমার, সালাহ্‌... গরিব দেশের গরিব বাড়ির ছেলেরাই বিশ্বজয় করে এসেছে। সাবঅল্টার্নের জয়ের খেলায় হাতে অঢেল টাকা পেয়ে অনেকসময় বিচ্যুতিও ঘটেছে গ্ল্যামারের হাতছানিতে, কিন্তু সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। বরং আলোচনা করা যাক, এই প্রজন্মের সৌভাগ্য নিয়ে। সত্যিই এই প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমীরা বড় ভাগ্যবান।

লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর খেলা একসঙ্গে, একই যুগে, এমনকী একই লিগে দেখতে পেয়েছি আমরা। তার সঙ্গে 'খুচরো' লাভ, নেমার-বেল-ইব্রাহিমোভিচ-গ্রিজ়ম্যানরা। অন্য তারকাদের কথা বাদই দিলাম, এমনকী মহাতারকা নেমারকেও যদি হিসেবের বাইরে রাখি, তবু হতাবক হয়ে যেতে হয়। পেলে আর মারাদোনা এক যুগে, একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেননি। তবু তাঁদের সর্বোত্তমতা নিয়ে তুলনার সীমা নেই। সেখানে মেসি আর রোনাল্ডোর প্রতিযোগিতা, মহাতারকাসুলভ বলয়, প্রতিভা এবং সর্বোপরি যুগ্ম প্রভাব হিসেব করলে তা অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হয় বই কী। বার্ল দ'অর-কে তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছেন, গোলের মালা এবং মহাকীর্তির মাধ্যমে ক্লাব এবং ভক্তকুলকে সুখের সাগরে ভাসিয়েছেন। ভক্তর কথায় মনে পড়ল, যে-উন্মাদনা দুই খেলোয়াড়ের ভক্তকুল বিভাজিতভাবে প্রদর্শন করে থাকে, আদতে তো তা সম্মিলিত। মাত্র দু'টি মানুষকে ঘিরে এই গণউন্মাদনা আসলে বিভাজিত নয়, এক করছে অনেকগুলি মানুষ, অনেকগুলি দেশকে। কাগজে প্রকাশিত সেই বিখ্যাত ছবির মতো, রমজানের নমাজ পড়ছে মেসি আর রোনাল্ডোর জার্সি পরিহিত দুই শিশু... সিরিয়া অথবা প্যালেস্তাইনে। ওই মুহূর্তে যুদ্ধের চেয়ে অনেক বড় ওই দুই তারকার সম্মিলিত বলয়। তা বেঁচে থাকার বাৎলটা তৈরি করে যে! ধনী-দরিদ্রের সীমারেখা লজ্জিত হয়েছে তাঁদের সৌজন্যে, কাদামাঠে জার্সির রং মিলেজুলে গিয়ে অনেকগুলি স্বপ্ন একসঙ্গে গাঁথা হয়েছে। আমরাও পারি! কঠিন রোগ নিয়ে, ছোট শরীর নিয়ে যদি একটি ছেলে আর্জেন্তিনা থেকে স্পেনে এসে বিশ্বজয় করতে পারে, যদি একটি দুর্বল শরীরের পাঁটুগিড় ছেলে শারীরিক শক্তি এবং প্রতিভাকে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে নিয়ে চলে যায়... আমরাও পারি, এই বিশ্বাসটা করতে বাধ্য করেছেন মেসি ও রোনাল্ডো।

এই যে স্বপ্ন দেখার সাহস দেওয়া, এই মহাযুগের কিন্তু শেষ আসতে চলেছে। এবং তা-ও হয়তো অসাফল্যে। যতই সর্বত্র সমাদৃত হোন, আর্জেন্তিনার মানুষ মেসিকে এখনও সর্বোত্তমের আসনে বসাতে পারেননি। কারণ, মেসি দিতে পারেননি বিশ্বকাপ। তবুও নিজেকে আবার প্রমাণ করতে, বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার খড়কুটো হয়ে নামবেন মেসি। ওদিকে রোনাল্ডোর কাছে কেউ বিশ্বকাপ না দাবি করলেও, তিনিও তাঁর দেশের একমাত্র ভরসা। এ যুগের ফুটবলে তাঁকে ইউসেবিওর মতো হারিয়ে যেতে হবে না, একথাও ঠিক। তবে ভক্তকুলের কাছে যা প্রবল বেদনার, তা এই যে, ২০১৮-র বিশ্বকাপে মেসি এবং রোনাল্ডো সম্ভবত শেষবার দেশের জার্সি পরে মাঠে নামবেন। তাঁরা দু'জনেই ৩০ পেরিয়েছেন। ক্লাব ফুটবলে বিশ্বজয়কে তো এখনও আমরা ঠিক বিশ্বজয় বলে মানি না, দেশকে উপরে রাখিই। সেই ফুটবল রোম্যান্টিকতায় প্রশ্ন থেকে যাবে, তাঁরা কি পারবেন মনে রেখে দেওয়ার মতো সোয়ানস বাঁধতে? বিশ্বজয় না হয় না-ই হল, পতন হবে না তো দুই তারকার? কাঁদতে হবে না তো? অথবা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম না বোঝার অবস্থা হবে না তো ভক্তকুলের? নেমার নিশ্চয়ই আবার খেলবেন, নতুন প্রজন্ম আবার তারকার জন্ম দেবে। কিন্তু এমন দুই তারকা একসঙ্গে? একসঙ্গে দুই তারকার সরে যাওয়া যে বিরাট এক শূন্যতার জন্ম দেবে।

চোখের জল সামলে বরং এখন তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করার সময়। শেষবারের মতো স্বর্গীয় খেলায় স্বর্গীয় দুই পা...

শি ক্ষা

মেধার দৌড়

সাফল্যই শুধু চর্চিত হচ্ছে যথারীতি। ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের কোনও সংস্কৃতি গড়ে উঠছে না।

চি ত্রি তা চ ক্র ব র্তী

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে স্বভাবতই প্রচারের আলোয় উঠে এসেছে সফল পরীক্ষার্থীদের নাম। সংবাদপত্রের পাতার পর পাতা ভরিয়েছে কৃতীদের সাফল্যের কাহিনি। তাদের অনুশীলন, একাগ্রতা, নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর খবর নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এই উদ্‌যাপনের মাঝখানে অন্য যে-পরিসংখ্যানটি ঢাকা পড়ে যায়, তা এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে সফল পরীক্ষার্থীর পাশে যদি অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর তালিকাটি রাখা হয়, তা হলে এই আলোর উৎসব নিমেষের মধ্যেই হয়তো অমাবস্যার রূপ নেবে। এবারের ফলাফলে যে-বিষয়টি সামনে এসেছে তা হল, অকৃতকার্যতার হার ক্রমবর্ধমান। রাজ্যবাসী যখন কৃতীদের সাফল্য নিয়ে মাতোয়ারা, উলটোদিকে তখন ব্যর্থতার ভারে বিপর্যস্ত অজস্র কৈশোর। শতাংশের খেলায় কে কতটা দড়, তা নিয়ে যখন চুলচেরা বিচার চলছে সংবাদপত্রে-টেলিভিশনে, তখন ব্যর্থতার লজ্জা ঢাকতে কেউ কেউ বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ। প্রশ্ন হল, অকৃতকার্যতার এই দায় কি শুধুই পরীক্ষার্থীদের? উত্তর অবশ্যই 'না'। তা হলে দায় কার?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রতি পদে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। কেননা, সরষের মধ্যেই ভূত! রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার হাল যে নিম্নমুখী, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রী কৃতীদের নিয়ে উৎসবে মাতলেও, ব্যর্থতার অন্ধকার ঢাকা থাকে না। শিক্ষাব্যবস্থার কতিপয় পরীক্ষার্থীর সাফল্যের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সামগ্রিক চিত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখব, এই বছর উচ্চ মাধ্যমিকে 'সি' গ্রেড (চল্লিশ শতাংশ থেকে উনপঞ্চাশ শতাংশ) প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। নব্বই শতাংশের রমরমার দিনেও এই দৈন্য আশঙ্কা জাগায়। এ রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি স্কুলপড়ুয়া বারো বছরের স্কুলের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারে না। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণিতে যে-হারে ছাত্রছাত্রীদের দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণিতে সেই সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে। ফলে মাধ্যমিক

অকৃতকার্যতার দায় কি শুধুই পরীক্ষার্থীদের? উত্তর অবশ্যই 'না'

কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাচ্ছে, এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোটেই অনুপাতে বেশ কম। কাজেই কতজন পরীক্ষার্থী সফল হল, সেদিকে মন না দিয়ে আমাদের উচিত কতজন সফল হতে পারল না, সেই পরিসংখ্যানে নজর দেওয়া। এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের না-পারার দায়কে গ্রহণ করা। এই দায় কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর কিংবা বিদ্যালয়ের নয়, বরং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সামনে এমনই এক লক্ষ্য হাজির করেছে, যেখানে নব্বই শতাংশ নম্বর পাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানবিষয়ে তো বটেই, সাহিত্যেও আটানব্বই কিংবা নিরানব্বই শতাংশ পাওয়াটা বিস্ময়কর নয়। প্রশ্ন জাগে এখানেই। বিজ্ঞান আর সাহিত্য তো ভিন্ন দু'টি ধারার বিষয়। তাই মূল্যায়নের মানদণ্ডও পৃথক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নম্বরের প্রতিযোগিতায় সেই দিকটি নিয়ে ভাবতেই নারাজ শিক্ষামহল। এই অনীহা কিন্তু ভবিষ্যতে সুফল আনবে না। শিক্ষার্থীদের মস্তবড় শিক্ষাদানের মাধ্যমে ভূরি-ভূরি নম্বর পাইয়ে দেওয়াই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে কোনওদিনই পশ্চিমবঙ্গ মেধার দৌড়ে খই পাবে না। কলকাতা জেলাকে টেক্কা দিল, নাকি জেলা কলকাতাকে— সেই তরাজায় না মেতে, বরং যেসব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারল না, তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়াই আশু প্রয়োজন। নয় কি? জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা যাতে পিছিয়ে না-পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষাপদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাবজেক্টিভ প্রশ্নের পরিবর্তে অবজেক্টিভ প্রশ্নের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে যারা একটু মেধাবী, তারা সহজেই প্রচুর নম্বর পাচ্ছে। কিন্তু মেধার নিরিখে যারা পিছিয়ে, তাদের শিক্ষাগ্রহণ অসম্পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, ভিতটাই তৈরি হচ্ছে না।

আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ক্লাসরুমে শিক্ষকদের মনোযোগ থাকে কতিপয় ভাল ছাত্রের দিকে। 'ব্যাক বেঞ্চার'রা তাঁদের নেকনজরে থাকে না। ক্লাসরুমের তুলনামূলক 'মেধাবী' ছাত্র পিটিয়ে নম্বরের দৌড়ে শামিল করানোর প্রক্রিয়াটা সহজতর। এতে শিক্ষকমশাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়, বিদ্যালয়ের মানও বাড়ে। এই প্রবণতা কিন্তু ভয়াবহ। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাস্তব এটাই। ফলে শতকরা নিরানব্বই, আটানব্বই, পঁচানব্বই-এর উদীপনার কাছে চাপা পড়ে যায় চল্লিশ, আটত্রিশ কিংবা ত্রিশের ম্লান মুখগুলি। তাদের প্রিয়মাণতার পিছনে লুকিয়ে থাকা কারণটি খতিয়ে দেখতে নারাজ উৎসবমুখর রাজ্য।

এর বাইরেও অন্য যে-কারণটি শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে, তা হল উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব। পশ্চিমবঙ্গের ক'টা স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা পাঠোপযোগী পরিবেশ পায়? তাদের পাঠগ্রহণে সহায়ক ব্যবস্থা নেওয়ার মতো পরিকাঠামো দিতে পারে হাতেগোনা কয়েকটি স্কুল। তাদের বাদ দিলে দেখব, এমন অজস্র বিদ্যালয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামো তো দূরের কথা, উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষকও গরহাজির। সরকারি নানা প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলছুটদের সংখ্যা কমানো গেছে, বিদ্যালয়মুখী করা গেছে অনেককেই। কিন্তু যথার্থ পাঠদানের প্রক্রিয়াটিই যদি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হলে শিক্ষার্থীর মানোন্নয়ন ঘটবে কীভাবে?

সিবিএসই, আইসিএসই বোর্ডের তুলনায় নম্বরের দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই একটু পিছিয়ে। সেই খামতি দূর করতে 'চালাও' নম্বরের ব্যবস্থা হলেও, মেধার দৌড়ে আদৌ পশ্চিমবঙ্গ কতটা এগোল, সেটা কিন্তু ভেবে দেখার বিষয়।

অ ন্য ক থা

জনসেবা ও কল্যাণে মাধবী পাহাড়ি সদানিয়োজিত

স্বপ্ন এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসাকে সম্বল করে মাধবীদেবী সেবা ও সংসার দুইয়েই পারদর্শী

প্রকৃত HEROES

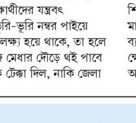

মাধবী পাহাড়ি

অবসরপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মী মাধবী পাহাড়ি কলকাতার কুদঘাটের বাসিন্দা। ১৯৯২ সাল থেকে নাকতলায় অবস্থিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম' নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। ওই প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুঃস্থ পরিবারের পাঁচ থেকে আঠারো বছর বয়সি মেয়েরা আশ্রয় পায়। তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থানও করে ওই প্রতিষ্ঠান। আনন্দ আশ্রমের গভর্নিং বডি হিসেবে কাজ করার সময় থেকেই সেবামূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন মাধবী। এই কাজে সর্বদাই পাশে পেয়েছেন নিজের স্বামীকে। তাঁরা নিঃসন্তান দম্পতি বলেই হয়তো আশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত কন্যাদের কাছের বলে ভাবতে পারেন। তাদেরকে সন্তানজ্ঞানে কাছে টেনে নিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার যেমন হন, তেমনই তাদের মুখে হাসি ফোটাতেও সদাসচেষ্ট থাকেন। অবসরের পর শুধু নিজের সমস্ত সময়ই দেননি, নিজের পেনশন থেকে প্রাপ্ত অর্থও দান করে দিয়েছেন আশ্রমের কন্যাদের জন্য। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে তাদের সাহায্য করা হয় ঠিকই, কিন্তু সেই সাহায্য যথেষ্ট নয়। তাই নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন মাধবী পাহাড়ি।

কলকাতার বাড়িতে যৌথ পরিবারে বাস করেন মাধবীদেবী ও তাঁর স্বামী। পরিবারের সদস্যদের প্রতিও তিনি সমান যত্নশীলা। যে-কোনও উৎসব পার্বণে আদি শ্বশুরবাড়ি মেদিনীপুরে একত্রিত হয় মাধবীদেবীর বিশাল পরিবারের অধিকাংশ সদস্য। তখন তাদের সকলের খেয়াল রাখার দায়িত্ব নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নেন মাধবীদেবী। আশ্রমের মেয়েদের প্রতিও তিনি একইরকম অনুভূতিসম্পন্ন। তাই তো তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মুহূর্তে উপেক্ষা করেন নিজের বয়স ও শারীরিক কষ্ট। কারণ এদের জীবনের স্বপ্নগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাই তাঁর প্রধানতম স্বপ্ন।

Neurobion Forte®
সঙ্গী... প্রকৃত HEROES-দের
Neurobion Forte

MERCK

Neurobion Forte®

সঙ্গী... প্রকৃত HEROES-দের

Neurobion Forte®

INDIA'S NO.1* VITAMIN BRAND

বি ভিটামিনের
ঘাটতি থেকে জাত
শারীরিক সমস্যাগুলিকে
দূরে রাখে।

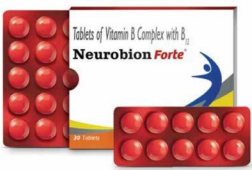

বিস্তারিত জানতে কল করুন এই টোল ফ্রি নম্বরে - 1800 103 8888 বা SMS করুন "Neurobion" - 88613 08888-এ | ওয়েবসাইট: www.neurobion.in**

রোজ একটা ক'রে ট্যাবলেট ডাক্তারের নির্দেশমত খান (শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)। নিউরোবিয়ন ফর্টি ট্যাবলেটে ছিটামিন বি সমূহের ঘাটতি ছাড়া অন্য কোনও কারণ থাকলে অবস্থার উন্নতি না-ও ঘটিতে পারে। বিশদ জানতে আজই আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। কাল্পনিক চরিত্রাভিনয়। সৃজনমূলক দৃশ্যায়ন। **ব্যবহারকারীর ব্যবহৃত টার্মিক প্ল্যান অনুযায়ী সর্বোচ্চমাত্রায় এইএমএস চার্জ প্রযোজ্য হবে।

*As per SSA MAT December 2017 in terms of units in the Vitamins/Minerals/Nutrients Category.

IND-NEU-1803-0137

দেবীপ্রসাদ সিংহ

'শ্রীজাত ভাবলে বিনায়ক এবং বিনায়ক ভাবলে শ্রীজাত..'.

দুইয়ে পক্ষ

দুই কবি, কবিতার ভিন্ন স্বর। প্রতিভাবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ প্রভৃতি বিশেষণে একজন অন্যজনের কাছে পরিচিত, তবে সব ছাপিয়ে শ্রীজাত ও বিনায়ক বন্ধু। খোলামন আড্ডার সূত্রধর পৌলোমী সেনগুপ্ত।

'দেশ' পত্রিকার আয়োজনে দুই কবির কথোপকথন অনায়াসেই হয়ে উঠল নানা বিষয়ে বিদগ্ধ আলোচনা, বাদ গেল না ব্যক্তিগত জীবনও— কথাবার্তার কেন্দ্রে ছিল কবিতা, পাশাপাশি উঠে এল গদ্য, সংগীত, রাজনৈতিক মতামত, প্রেম। মতৈক্য, মতানৈক্যের মধ্য দিয়ে দুই কবি খুঁজে নিলেন পরস্পরকে।

পৌলোমী: আমার প্রথম প্রশ্ন আমি দু'জনকেই একসঙ্গে করছি। একই সময় কবিতা লেখা আরম্ভ, কুড়ি বছরেরও বেশি পেরিয়ে গিয়েছে। নিজের-নিজের পথে দু'জনে এগিয়েছে। কিন্তু বাংলা কবিতার জগতে একটা ধারণা আছে, বিনায়ক এবং শ্রীজাত শুধু সমসাময়িক নয়, বন্ধুত্বের জায়গা থেকেই তারা উঠে এসেছে। মতের অমিল তোদেরও নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি যতদূর জানি, মুখ দেখাদেখি বন্ধুর মতো কোনও ঘটনা কখনও ঘটেনি। এইরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি প্রথমে শ্রীজাতকে জিজ্ঞেস করব, যদি তিনটে শব্দে বিনায়ককে ডিসক্রাইব করতে বলা হয়, কোন শব্দ হবে সেগুলি?

শ্রীজাত: (ভেবে) আবেগপ্রবণ, প্রতিভাবান... অনেক কিছুই মনে আসছে।

পৌলোমী: আচ্ছা, তবে তিনের বেশি নেওয়া যাক।

শ্রীজাত: আবেগপ্রবণ, প্রতিভাবান, বন্ধু, প্রিয় কবিদের একজন এবং চিরকালের লেটলতিফ।

পৌলোমী: আচ্ছা। চিরকালের লেটলতিফ— এটা বিনায়ক কেন? মানে, মোটামুটি সকলেই ধরে নেয়, বিনায়ক দেরি করে পৌঁছবে, কোথায় যেতে হবে, সেই জায়গাটা বিনায়ক ঠিক চিনতে পারবে না, ট্যাক্সিচালক সারা কলকাতা ঘুরিয়ে

গন্তব্যে নিয়ে যাবে... এটাই তোর স্বাভাবিক, নাকি তুই নিজেকে এইভাবে তৈরি করেছিস?

বিনায়ক: আমি যখন আইওয়া-তে ছিলাম, সেখানেও দেখেছি এই নিয়ে কথা উঠেছে। ওরা আমাকে কী সুন্দর একটা নাম দিয়েছিল, 'জাস্ট টু মিনিটস'! কারণ, আমি সবসময়ই বলতাম, কামিং, ইন জাস্ট টু মিনিটস। টু মিনিটস-টা হয়তো ফোর বা ফাইভ মিনিটস হত। আসলে, শ্রীজাতর মতো অতো প্রফেশনাল ডিসিপ্লিন আমার নেই। কিন্তু কোথাও যাওয়ার থাকলে আমি বেরোই কিন্তু ঠিক টাইমেই। হয় কী, রাস্তায় এত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যে, প্রত্যেকের সঙ্গেই দু' মিনিট করে কথা বললেও তো দেরি হয়ে যায়। আমি যে ইচ্ছে করে দেরি করি, এমন নয়।

পৌলোমী: একটা শব্দ শ্রীজাত সম্বন্ধে ব্যবহার করলি, ডিসিপ্লিন...

শ্রীজাত: এটা শুনলে দুবি খুব খুশি হবে। তোমাকে লিখে সই করে দিতেও বলতে পারে, বাড়িতে টাঙিয়ে রাখবে।

পৌলোমী: আচ্ছা, শ্রীজাতকে কোন-কোন শব্দে ডিসক্রাইব করবে বিনায়ক?

বিনায়ক: শৃঙ্খলাপরায়ণ, প্রতিভাবান, লক্ষ্যে স্থির, উইটি এবং ডিক্লোম্যাটিক।

পৌলোমী: বিনায়ক কি শ্রীজাতকে হিংসে করে?

বিনায়ক: না। কেন হিংসে করব? জনপ্রিয়তার কারণে? সেলেব্রিটি স্টেটাস ব্যাপারটা মেভ্যাবে শ্রীজাত হ্যান্ডল করতে পারে, আমি সেটা পারি না। আমি আড়ালেই বেশি কমফর্টেবল। কিন্তু আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, শ্রীজাতর মাথায় একটা ফ্রিজ বসানো আছে। একটা ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচে জিদান প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে দিল এবং রেড কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। শ্রীজাত আমাকে বলল, 'এই যে তোমার মতো কাজটা করল!' খেলতে নামলে কেউ না কেউ তো ব্লেজিং করবেই। আমি প্রোভোকড হয়ে গিয়ে রিঅ্যাক্ট করে বসি। এইটা আমি শিখতে পারলাম না। কিংবা ধরা যাক, আমরা বর্ধমানে গেছি, ও খেল শুধু এক কাপ চা। অটোগ্রাফ নেওয়ার ভিড় ছিল, ওর দিকে কুড়িজন, এদিকেও ধরো বারোজন। কিন্তু আমি বললাম, মাছের ঝোলটা খুব ভাল হয়েছে, আর-একটা মাছ দিন। মানে ওটা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করলাম না। কিন্তু দেখলাম, তিন নম্বর মাছটা আমি যখন খাচ্ছি, আমার অটোগ্রাফের লাইনটা বারো থেকে পাঁচ হয়ে গেল! ফিল্ম লাইনে আমি শ্রীজাতর আগে থেকে কাজ করেছি, আমি দেখেছি 'স্টার' হয়ে থাকতে গেলে সারা জীবন নিজেকে বঞ্চিত করে বাঁচতে হয়। এবং আমি সেটা পারব না।

পৌলোমী: শ্রীজাত কি নিজেকে বঞ্চিত করে বাঁচে?

শ্রীজাত: না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, 'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়'। নিজের গণ্ডির মধ্যে যেহেতু খুব অল্প উপকরণ নিয়ে আমি বাঁচতে অভ্যস্ত, তার মধ্যে কোনও কিছু আমি খুব একটা ছাড়তে চাই না। কিন্তু বিনায়ক যে হ্যান্ডলিং-এর কথা বলল, আমার কাছে সেটাই ভাল লাগা। আমরা যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, তখন কেউই হয়তো ভাবিনি যে, আমাদের কবিতা কোনও কাগজে ছাপা হবে বা একটা প্রকাশনা থেকে বই বেরোবে। সেখানে যদি কেউ লেখালিখির পনেরো-কুড়ি বছর পর একটা সই নিতে আসেন বা একটা ছবি তুলতে আসেন, তিনি একজনই হোন বা দশজন, হেসে করমর্দন করে ছবি তোলার মধ্যে একটা ভাল লাগা কাজ করে। জীবন হয়তো আমায় এই উপহার দিল। এই প্রাপ্তি একদিন আছে, পরদিন না-ই থাকতে পারে। আসল কাজ হচ্ছে লিখে যাওয়া। আমিও নিজেকে বঞ্চিত করি না। নিজের সঙ্গে যে-সময়টা কাটাতে চাই, ঠিক সেভাবেই কাটাই, যতটুকু নিজের কাছ থেকে পেতে চাই, নিংড়ে নিতে চাই, তা-ই করি। ওর যেমন মাছের পিসের প্রতি দুর্বলতা, আমারও যেসব জিনিসের প্রতি দুর্বলতা আছে, সেগুলো যে খুব ছেড়ে দিই তা নয়। কিন্তু এ-ও বলি, আমি ব্যাপারটাকে হ্যান্ডল করা হিসেবে দেখি না এখনও, কারণ একজন লেখকের জনপ্রিয়তা কতই-বা হবে! তার সঙ্গে কখনওই একজন স্পোর্টসম্যান বা ফিল্মস্টারের জনপ্রিয়তার তুলনা করা যায় না। একজন লেখকের দু'জন থেকে সাতজন পাঠক হলেই সে ভাবে আমি জনপ্রিয় হয়ে গেলাম। আমরা এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। সেখানে সাত থেকে দশজন যদি সেলফি তুলতে আসেন, সই নিতে আসেন, সেটা আমি এখনও আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি। যে, আমার লেখার কপালে এটা জুটছে। মেভ্যাবে বন্ধু-আত্মীয়দের সঙ্গে মিশি, পাঠকের সঙ্গেও কিন্তু আমার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। এটা আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমি নিজের জন্য যা-যা বরাদ্দ রাখি, তার কিছু ছাড়ি না।

পৌলোমী: এই সূত্র ধেকে বিনায়কের কাছে একটা অন্য প্রশ্ন রাখছি। প্রশ্নটা এই— বাংলা কবিতা কারা পড়েন? যাঁরা লেখেন, তাঁরা পড়েন এরকম তো আমরা শুনে আসছি। একটা সার্কল আছে, যাঁরা লেখেন বা পত্রিকা প্রকাশ করেন, পরস্পরের লেখা আমরা পড়ি। এর বাইরে পাঠক কারা? তোরা দু'জনেই নব্বইয়ের কবি এবং নব্বইয়ের স্তম্ভ হিসেবে আমরা যে-কজন কবিকে ধরি, তাঁদের মধ্যে তোদের দু'জনের নাম অবশ্যই করতে পারি। শ্রীজাত ভাবলে বিনায়ক এবং বিনায়ক ভাবলে শ্রীজাত...

শ্রীজাত: বাঙালি জুটি ছাড়া ভাবতে পারে না। আচ্ছা আমি একটু বলতে চাই, বিনায়ক কীভাবে নেবে জানি না, আমার মনে হয় আমাদের স্তম্ভ না বলে 'combo' বলাই ভাল। নব্বই তো কম্বোর যুগ, তা আমরাও বোধ হয় সেরকমই, যাদের একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, পড়া যায়, শোনা যায়।

পৌলোমী: বেশ। আমি যেটা বলছিলাম, কবিতা লিখেই তো তোদের পরিচিতি। এই পরিচিতিটা কার বা কাদের কাছে? শ্রীজাত যেমন পার্কিং লটের যুবকের কথা লিখেছিল।

শ্রীজাত: অবশ্যই। বইমেলার পার্কিং লটে যে-যুবকটি ছিলেন, তিনি বারোদিন বইমেলার পার্কিং সামলাচ্ছেন, কিন্তু একদিনও মেলায় যেতে পারছেন না। তিনি আমার লেখা ফেসবুকেই ফলো করেন। দু'দিন নিয়ম ভেঙে এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পার্কিং ফি তিনি নিতে চাননি। দ্বিতীয়দিন যখন ফি নিলেন না, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরকম করছেন কেন? তিনি বলেছিলেন, দাদা, যেদিন শেষ যাবেন বইমেলা থেকে, আপনার একটি বই আমার নামে লিখে দিয়ে যাবেন। সেটাই আপনার পার্কিং ফি। আমি তাই করেন। সেটাই আমি মনে করি আমার প্রাপ্তি। ওঁর চেয়েও আমার প্রাপ্তিটা বেশি। এই পাওয়াটা আমার কাছে খুব বড় ব্যাপার।

বিনায়ক: আমার এরকম একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে একটি ছেলে সই নিয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলাম যে, তার বাবা খেতমজুরের কাজ করেন এবং ছেলেটি তখনও ছাত্র। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের সাংসারিক অবস্থা কীরকম। ছেলেটি বলেছিল, দিনপিছু একশো টাকা হয়। আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, যে-সংসারে মাসিক রোজগার তিন হাজার টাকা, সেই ঘরের একটা ছেলে আশি টাকা দিয়ে আমার একটা বই কেন কিনল? কী পাবে? সে বলেছিল, আমি আপনার কবিতা পড়ে বেঁচে থাকার জোর পেয়েছি। তখন মনে হয়েছিল, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর হয় না এবং আমাকে এর যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু বাংলা কবিতা যারা পড়ত, সেই 'এলিট' সমাজের অনেকেই আর বাংলা কবিতা পড়ছে

তিনি বলেছিলেন, দাদা, যেদিন শেষ যাবেন বইমেলা থেকে, আপনার একটি বই আমার নামে লিখে দিয়ে যাবেন। সেটাই আপনার পার্কিং ফি। আমি তাই করি। সেটাই আমি মনে করি আমার প্রাপ্তি। এই পাওয়াটা আমার কাছে খুব বড় ব্যাপার।

◆◆◆◆◆◆◆◆

না। কবিতা হয়তো পড়ছে, কিন্তু বাংলা নয়। এরকম অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, যারা নিজেদের লেখালিখিটা ইংরেজিতে করছে, কেউ-কেউ হিন্দিতেও। আমার মনে হয়, নতুন একটা জায়গা থেকে বাংলা কবিতার পাঠক উঠে আসছে, যারা হয়তো অটোচালক, কৃষক, শ্রমিক... আমরা কি তাদের জন্য লিখতে পারছি? এটা একটা বড় প্রশ্ন। নাকি যারা বাংলা কবিতা ছেড়ে চলে যেতে চাইছে, আমরা ক্রমাগত তাদেরই টেনে আনতে চাইছি?

শ্রীজাত: বিনায়ক ঠিকই বলেছে। আমারও মনে হয় একটা নতুন পাঠকশ্রেণি তৈরি হচ্ছে। এটা চিরকালই হয়তো হয়ে এসেছে। এবং এখন আমরা স্বীকার করি বা না-ই করি, পরে হয়তো প্রমাণিত হবে, এই ডেমোগ্রাফিক্যাল চেঞ্জ-এ সোশ্যাল মিডিয়ার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। আমি নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ বলে খুব হাতেনাতে টের পাই। একটা লেখার প্রতিক্রিয়া কোন কোণ থেকে আসবে এবং কে এগিয়ে এসে কী বলবেন, এটা এতটাই আনএক্সপেক্টেড যে, প্রতিটি লেখার ক্ষেত্রেই সেগুলো পালটে-পালটে যায়। যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা লেখা পড়ার জন্যে আমায় টাকা খরচ করতে হচ্ছে না, বইয়ের দোকানে যেতে হচ্ছে না, একটা বৃহত্তর পাঠকশ্রেণি আমার মনে হয় তৈরি হচ্ছে। হয়তো কেউ বই পড়ার সময়ই পান না, কিন্তু অফিসে যাওয়ার পথে গাড়িতে বসে দেখে নিচ্ছেন, আজকে বিনায়ক কি কোনও আপডেট দিল? অমুকে কি কোনও কবিতা লিখল? এইটা অনেকের কাছে পৌঁছনোর একটা উপায় হয়েছে। আর বই-বিমুখতা যদি হয়েও থাকে, খুব ক্লিশেড শোনালেও বলব, বইমেলায় গিয়ে সেটা টের পাই না। সেখানে এত-এত মানুষকে বই কিনতে দেখি! আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার লেখাও তো বইতে যায়, কিন্তু সেই বই তাঁরা যখন কিনে আমাকে দেখান, বুঝতে পারি বইয়ের জন্য পাঠকের একটা আলাদা মমত্ব আছে। বহুবার পয়া লেখাও সে দু'মলাটের মধ্যে কিনে বাড়িতে রাখতে চায়।

বিনায়ক: একটা অবজ্যর্ভেশনের কথা একটু বলি। আমরা অনেকসময় বলি, বাঙালি বই কেনা বা পড়া কমিয়ে দিয়েছে। এটা পুরোটা মিথ্যেও নয়। আবার একইভাবে আমরা দেখি বাঙালির খাওয়াদাওয়ার অভ্যেসও পালটে গিয়েছে। ভাত, শুক্তো, ডাল, পাবদা মাছ— এই খাওয়াটা বদলে গিয়ে বিরিয়ানি আর মাটন চাঁপ-এ চলে গেল, এই দুইয়ের মূলে কিন্তু স্পেস ক্রাঞ্চ! আমরা থাকি ছোট-ছোট ফ্ল্যাটে, বেশি বই রাখতে পারি না, নিমন্ত্রণবাড়িতেও এমন খাবারের আয়োজন করতে হয় যেগুলো দাঁড়িয়ে খাওয়া যায়। এই সোশ্যাল চেঞ্জগুলোও আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু তিরিশ বছর আগেও দেখেছি, আমার মামা— তিনি সিউড়ির বিডিও ছিলেন— এবং তাঁর বন্ধুদের সান্ধ্য আড্ডাটা হত 'দেশ' পত্রিকার কোনও গল্প বা প্রবন্ধকে ঘিরে। আজকে, সরাসরি সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, এরকম কারও আড্ডায় সাহিত্য কতটুকু ভূমিকা নেয়, সে বিষয় কিন্তু ভেবে দেখা যেতে পারে। সাহিত্য আড্ডার গণ্ডি থেকে সরে গেছে, তাৎক্ষণিক আপডেঙগুলো আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

শ্রীজাত সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলল, ওর কাছে আমি জানতে চাইব— একটা লেখা হল, তার উত্তরে অজস্র কমেন্ট পড়তে লাগল, অনেক বিরূপ মন্তব্য আসতে থাকে, সভ্যতার সীমানার বাইরের মন্তব্যও আসতে থাকে। সেগুলো মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আবার সব ভুলে লেখার কাছে ফিরে যাওয়া, সেটা কীভাবে সম্ভব হয়?

শ্রীজাত: আমার মনে হয় এটার একটা আন্তরিক প্রক্রিয়া আছে। সব কিছুই আসলে অভিযোজন। পার্শ্ববর্তী পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সব প্রাণী এবং উদ্ভিদকেই অভিযোজনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মানুষ হিসেবে এগোতে-এগোতেও আমার মনে হয় প্রত্যেকের একটা অভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আজ থেকে তিন বছর আগে আমার লেখার তলায় দশটা বিরূপ মন্তব্য আমাকে যেভাবে প্রভাবিত করতে পারত, হয়তো আজকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। অবশ্য এটা শুনে এরকম মনে হতে পারে, বিরূপ মন্তব্য বলেই আমি সেভাবে নিচ্ছি না, আর কেউ যদি প্রশংসাসূচক কিছু লেখেন, তাঁকে আমি মাথায় করে রাখব। জিনিসটা তা-ও নয়। সমস্ত বক্তব্যেরই আমার মনে হয় একটা সীমা পর্যন্ত গুরুত্ব আছে, কিন্তু এইটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত যে, আমরা লেখাটা লিখছি নিজের জন্যে এবং লেখাটার জন্যে। হ্যাঁ, পোস্ট করছি অবশ্যই সেটাকে অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, কিন্তু সেটা নিয়ে কতদিন আমি মেতে থাকতে পারি? বা কতক্ষণ সেটার পিছনে পড়ে থাকতে পারি এইটা দেখার জন্যে যে, কে কী বলছেন। গঠনমূলক প্রশংসা বা নিন্দা আমি নিতে পারি, কিন্তু যে-জায়গাটার কথা বিনায়ক বলল, অকারণ কুৎসায় নেমে যাওয়া বা কদর্য আক্রমণ করা, এটা তো আমাদের সঙ্গে প্রায়শই হয়, এককরম অভ্যাসই হয়ে গেছে। আমি নিজেকে আস্তে-আস্তে শিখিয়ে নিয়েছি, আমার চারপাশে একটা পরিখা আছে, যে-পরিখাটা পার করে কিছু জিনিস আর আমার মাথার মধ্যে ঢুকতে পারে না।

> আমাকে অনেকেই বলেন, আপনাকে এতজন এত কথা বলে যান, আপনি কী করে আবার পরের দিন একটা অন্য পোস্ট দিতে পারেন বা নর্মাল থাকেন? কিন্তু এই ডিফেন্স মেকানিজম-টা তৈরি হয়ে যায়।

◆◆◆◆◆◆◆◆

বিনায়ক: এটা তো ভয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ তো আনন্দেও কবিতা লেখে।

বিনায়ক: হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি বলছি যে, আমি যেমন ভাবছি সেটা সরাসরি কথায় লিখতে পারছি না। কিন্তু ভেতরে একটা চানিং হতে-হতে

কবিতা হয়ে জন্ম নেয়। বা গদ্যও হতে পারে। আমি তো কখনও খাতায়-কলমে কবিতা লিখিনি, মাথায় ঘুরতে-ঘুরতে লেখা হয়েছে।

পৌলোমী: এই যে মাথায়-মাথায় লেখা, সেটা ফাইনালি খাতায়-কলমে কখন লেখা হয়?

বিনায়ক: শ্রীজাত যেমন রোজ লেখে। আমি সেটা করি না।

শ্রীজাত: অনেকসময় রোজও কবিতা এসেছে। খুব সুন্দর একটা কথা আমাকে সুনীলদা বলেছিলেন, সেটা আমি মান্য করি। উনি বলেছিলেন, লেখা আসুক না আসুক, প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ সাদা পাতার সামনে বসবে।

পৌলোমী: এটা আমার সামনেও সুনীলদা বলেছিলেন, সাদা পাতা সামনে রেখে সাধনা করতে হয়।

শ্রীজাত: এবং ওইটা হচ্ছে তোমার মনঃসংযোগের সময়, তুমি যদি সেদিন একটি শব্দও লিখতে না পার, নিজেকে ব্যর্থ ভাববে না, কারণ দিনের শেষে তুমি জানবে যে তুমি চেষ্টা করেছিলে। আমার সাদা পাতা মানে দীর্ঘদিনই ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ড ডকুমেন্ট। আজ বহুবছর হল আমি যেখানেই থাকি, যে-কাজের মধ্যেই থাকি, দিনের অন্তত কিছুটা সময়ে আমি আমার ল্যাপটপ নিয়ে একটা ওয়ার্ড ফাইল খুলে বসি।

বিনায়ক: আমি সেভাবে খাতায় কলমে লিখিনি। এমনকী, দীর্ঘকবিতাও নয়। ধীরে-ধীরে মাথায় লেখা হয়।

পৌলোমী: কিন্তু সেগুলো তো জমা দিতে হয়েছে!

বিনায়ক: হ্যাঁ, আমি হয়তো বছরে তিনদিন কবিতা লিখি। একদিন আটত্রিশটা, একদিন বাইশটা, একদিন ষোলোটা। আমার মাথায় তিরিশ-চল্লিশটা কবিতা জমে, জমতে থাকে। তার মধ্যে অনেকগুলো ভুলে যাই, যেগুলো মনে থাকে, একদিন বসে লিখে ফেলি। জয়দা আমাকে বলেছিলেন, এরকম কবিতা যখন মাথায় আসবে, সমাজ-সংসার থেকে চারদিনের জন্য পালিয়ে যাবে। এখানে একটা কথা মনে পড়ছে, আমি বাবার খুব ক্লোজ ছিলাম। বাবার আচমকা মৃত্যুর পর আমি চার-পাঁচমাস কিছু লিখতেই পারিনি। তখন দেশ পত্রিকা থেকে আমার কাছে একটি দীর্ঘকবিতা চাওয়া হয়, আমি হর্ষদাকে বলি যে, আমি এখন লেখার জায়গায় নেই। আমি পারব না। উনি বললেন, আর সাতটা দিন দেখো। যদি পার জানিয়ো। সেদিনই হঠাৎ ফেরার সময় আমি চোখ বন্ধ করলাম, আর কেন দেখলাম জানি না, কন্যাকুমারীর ওই রকটার উপরে স্বামীজির পা দুটো দুলছে। ওই ছবিটা থেকে কয়েকটা শব্দ এল— 'না আমি এখনও আদেশ পাইনি'। এই কয়েকটা শব্দ এল রাত

ছবি: শ্রীজাত ফেসবুক

বাবা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা শ্রীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীজাত

ন'টায় আর পুরো কবিতাটা শেষ হল পরদিন ভোর পাঁচটায়। এই 'বাবা আমার হাতটা ধরো' কবিতাটা আমার মনে হয় আমায় ফিরে আসতে, উঠে দাঁড়াতে খুব সাহায্য করেছিল।

পৌলোমী: বিনায়কের প্রথম কবিতা দেশ পত্রিকায় কবে ছাপা হয়েছিল?

বিনায়ক: আমার কবিতা প্রথম দেশ-এ ছাপা হয় ১৯৯৫ সালে।

পৌলোমী: কী নাম?

বিনায়ক: 'প্রতিবেশী'। বলে রাখি, আমার বাবা কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন আবার বাংলার খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যেও একজন ছিলেন। যদিও তেমন কোনও স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে বাংলা বই পড়ার অভ্যেস তৈরি করে দিয়েছিল আমার বইপোকা মা। আর আমার ছোড়দি নন্দিনীর উৎসাহেই দেশ পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা পাঠানো। কবিতাটা ছাপা হওয়ার সপ্তাহখানেক বাদে র‍্যাশনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, চেনা এক অধ্যাপক রিকশা থামিয়ে আমায় বলে যান, দেশ-এ কবিতা বেরিয়েছে, র‍্যাশনের চাল তুলছ কেন, বাসমতী চাল খাও!

শ্রীজাত: দেশ পত্রিকার সঙ্গে আমার লেখালেখির সূত্রে যোগাযোগ বাইশ বছর। আমার প্রথম লেখা ছাপা হয় ছিয়ানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে। নাম 'তোমাকে রেখেছি'।

বিনায়ক: এক সেকেন্ড...

পৌলোমী: ওকে বলতে দে।

বিনায়ক: জাস্ট আমার স্মৃতিশক্তির একটা পরীক্ষা। এই কবিতাটার শেষ লাইন ছিল, 'হারব না বলে জিভের তলায় তোমাকে রেখেছি'।

শ্রীজাত: ঠিক। আমাদের বাড়িতে খাবার জায়গায় একটা কাঠের পাটাতনের উপর ভারী ছাই রঙের টেলিফোন রাখা থাকত। আমি বরাবরই ঘুম থেকে দেরিতে ওঠার লোক। একদিন সকালে বাবা ডেকে দিয়ে বললেন, ওঠ, তোর ফোন এসেছে। কবিতা লেখার ঝোঁক বা উৎসাহ আমি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। বাবা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক ছিলেন এবং তাঁর একটা লেখার খাতা ছিল, তাতে বাবা কবিতা লিখতেন। যদিও সে লেখা কোথাও ছাপতে দেননি। আমাকে লেখার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দিতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ফোন করেছে? বাবা বললেন, জয় গোস্বামী ফোন করে তোকে চাইছেন। আমি তো ভাবছি, সবটাই স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে, কারণ জয় গোস্বামী তখন, তখন কেন এখনও, আমার স্বপ্নের রাজকুমার। সেই মানুষটা আমায় সোজা ফোন করেছেন, এটা আমার বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছি কেউ মজা করেছে। কিন্তু ফোনটা ধরে বুঝি, জয় গোস্বামীই ফোন করেছেন। আমায় বললেন, আপনি চারটে লেখা দিয়েছিলেন? আমার গলা দিয়ে তখন প্রায় স্বর বেরোচ্ছে না। উনি বললেন, একটি লেখা নির্বাচিত হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। আপনি আরও লেখা দেবেন, কেমন? জয়দা ফোন রাখার সময় এইভাবেই 'কেমন' বলেন। সেটাই প্রথম কবিতা। এর পরের বছরের প্রান্তিক চমকটা আমি আজও ভুলিনি। আমি এমনিই কবিতা জমা দিয়েছিলাম। সাতানব্বই সালের পঁচিশে বৈশাখ একটি বিশেষ কবিতা সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেখলাম কাগজে। সেই সংখ্যায় দেখলাম একই পাতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর আমার কবিতা ছাপা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপর সেই প্রথমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ফোন করে জয় গোস্বামীকে চাই। উনি জিজ্ঞেস করলেন সংখ্যাটা দেখেছি কি না। আমি বললাম, সে তো দেখেছি, কিন্তু আপনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে আমার

কবিতা ছেপেছেন? উনি বললেন, দেশ পত্রিকার তো এইটাই ঐতিহ্য। আমরা তো প্রতিষ্ঠিতদের সঙ্গেই নবীনদের রাখতে চাই। আপনার ভাল লেগেছে তো? এই ঘটনাটা কোনওদিন ভুলব না। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। কোনওদিন ভাবিওনি যে, দেশ পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হবে। ডাই-ডাই কবিতায় ডায়েরি ভর্তি করে বুকে আঁকড়ে শুয়ে থাকতাম আর ভাবতাম, কেউ নিশ্চয়ই এসব পড়বে না। কিন্তু দেশ-এর সঙ্গে আমার ছোটবেলা থেকে সখ্য এবং চিরকালই লোভ ছিল কবিতার পাতাটার প্রতি। নব্বইয়ের উত্থান তখন। জয়দা-সুবোধদা-রণজিৎদা, মল্লিকার্দি-জয়দেবদার পর পিনাকীদা, শিবাশিসদা, রূপকদা, পৌলোমীদি, যশোধরাদি, চিরঞ্জীবদা, সেবস্তীদি, প্রসূনদা, সাম্যদা, সুদীপদা, রোশনারাদি, বিভাসদা লিখছেন, আমাদের সতীর্থ বন্ধু অংশুমান লিখছে এবং লিখছে আরও অনেকে। আমার খুব সন্দেহ হত আমার কবিতা কি কোনওদিন ছাপা হবে? সেই সন্দেহের জায়গা থেকে এতগুলো বছর সম্পর্কটা এখনও টিকে আছে, পাঠক হিসেবে, লেখক হিসেবে। সেটা আমার প্রাপ্তি। তবে নিজের লেখার প্রতি সন্দেহ আমার যায়নি।

বিনায়ক: 'দেশ' পত্রিকায় লেখা ছাপার সুবাদে এরকম হয়েছে যে, রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, একদম অচেনা একজন এসে বললেন, গত সংখ্যার দেশ-এ আপনার লেখাটা পড়লাম। একটা কার্ডুল হাত দিয়ে ছুড়ে দিলে, সেটা আর কতদূর যায়। কিন্তু সেটা রিভলভার থেকে ছুড়লে অনেক দূর যায়।

পৌলোমী: আচ্ছা, দু'জনের প্রথম কোথায় দেখা হয়েছিল?

শ্রীজাত: জয়দার বাড়িতে। পরস্পরকে চিনতাম না। জয়দাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বিনায়ক: জয়দার বাড়িতে আমি জীবনে দিন তিনেক গেছি। তার মধ্যে একদিন শ্রীজাতর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

পৌলোমী: তুই কি সুবোধদার বাড়িতে বেশি যেতিস?

বিনায়ক: আমি তো সুবোধদা মল্লিকাদির সঙ্গেই ছিলাম বরাবর। অনার্স পড়ার সময় সুবোধদার কাছে টিউশন-ও নিয়েছি কিছুদিন, অবশ্যই কোনও ফি না দিয়ে। আমার একটা বই বেরিয়েছিল, আমি জয়দাকে দিতে গেছিলাম।

পৌলোমী: আচ্ছা, ওই প্রশ্নের উত্তরটা এবার শ্রীজাতর কাছে শুনি। নিজের কোন লেখা জোরের জায়গা হয়ে উঠেছে।

শ্রীজাত: কবিতার যেটা মজা, অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কা— কবিতা কখন যে আসবে তা কেউ বলতে পারে না। আগামিকালই আসতে পারে, আবার কোনওদিন না-ও আসতে পারে। প্রতিরাতে এই অনিশ্চয়তা নিয়ে আমাদের ঘুমোতে যেতে হয়। একটা সময় ব্যক্তিগত অপমান বা প্রেম, এইসব থেকে লেখা বেশি আসত। কিন্তু একদিন ব্যক্তিগত অপমান আর কোনও উৎস হিসেবে কাজ করে না, কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমার অসম্মান একমাত্র একজনই করতে পারে, সেটা আমি নিজে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির আমাকে অসম্মান করার কোনও ক্ষমতাই নেই। অনেক সম্মান, সম্মাননা পেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়, আবার অনেক অসম্মান পেয়ে একদিন বাড়িতে ফিরে এসে দুটো লাইন লিখতে পেরে মনে হয় যে, এই লাইনদুটোই লিখতে চেয়েছিলাম অনেকদিন। তখন নিজেকে সম্মানিত মনে হয়। কিন্তু আমার চারপাশের যা অবস্থা, সেইটা আমাকে সবসময় পীড়িত করে। এখন চারপাশের খবর অনেক দ্রুত আমাদের কাছে চলে আসে। বহুদূরে একটা দেশে বোমা পড়লেও জানতে তিন সেকেন্ড লাগে, পাশের পাড়ায় একটা লাশ পড়লেও তিন সেকেন্ডে খবর পাই। অনেকসময় আমি হতাশায় চলে গিয়েছি। আজকে প্রথমবার এখানে বলছি, চারপাশের হিংসার কারণে আমার একসময় এমন ডিপ্রেশন হয় যে, আমাকে ডাক্তারের সাহায্য পর্যন্ত নিতে হয়। ডাক্তারও বলেন, কোনও ওষুধ আপনাকে আমার দেওয়ার নেই, একমাত্র ওষুধ আপনি যদি লিখতে পারেন। ওইখানেই আপনাকে উগরে দিতে হবে সব খারাপ লাগা। সেডেটিভ দিয়ে আপনাকে ঘুম দিতে পারি, তার বেশি কিছু দিতে পারব না। আমি দুটো কি তিনটে লেখার কথা বলতে পারি, যেগুলো লেখা হিসেবে কতটা উতরেছে আমি জানি না, কিন্তু লিখতে পেরে আমি খুব জোর পেয়েছিলাম। একটা হচ্ছে 'অন্ধকার লেখাগুচ্ছ', যখন একের পর এক ব্লগারদের খুন করা হচ্ছিল, সে সময় আমার প্রতিদিনই লেখা আসছিল। সেই লেখাগুলোও হয়তো ব্যর্থতা থেকেই লেখা, কারণ লেখা তো কিছু সারাতে পারে না, কিন্তু লিখতে পেরে আমি কোথাও একটা আঁকড়ে ধরার জায়গা পেয়েছিলাম। আর-একবার শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে— যদিও অসুস্থতার কথা চাউর করা মোটেই ভাল না, সুনীলদা বারবার বলে গেছেন— দশ-বারোদিন আমাকে ঘরবন্দি থাকতে হয়েছিল। সেইসময় আমার কাছে এমন কিছু লেখা আসছিল, কবিতা কি না জানি না, যেমন লেখা আমার কাছে আগে কখনও আসেনি। আমি আনএডিটেড লেখায় খুব বিশ্বাস করি। ঠিক যেমনটা আসছে, সেটাই লিখে যাওয়া। এবং অনেকসময় সেটাকেই ছাপতেও দেওয়া। সেইসব লেখা নিয়ে একটা বই হয়েছিল 'মুশতাক হুসেনের দরবার' বলে। সেই বইটি আমাকে খুব জোর দিয়েছিল। একটা রাগ আমি কোথাও বের করে দিতে পেরেছিলাম। খুব রাগের লেখা। অবশ্য দরবারি-ও একটা রাগ। আর শেষ যে-লেখাটা খুব যন্ত্রণা থেকে এসেছে, যে-লেখাটা এখনও আমার মধ্যে আছে, ছেড়ে যায়নি, সেটা হচ্ছে 'তারাভরা আকাশের নীচে' নামের গদ্য। ওই লেখাটা না লিখতে পারলে আমি খুব কষ্ট পেতাম। লিখে বোধ হয় আরও কষ্ট পেয়েছি।

বিনায়ক: এখানে আমিও 'সোহাগিনীর সঙ্গে এক বছর' উপন্যাসটার কথা বলব। ওটা আমার কাছে ক্যাথারসিস-এর মতো হয়েছিল।

পৌলোমী: একটা প্রশ্ন সম্পাদক হিসেবে মাথায় আসছে, এই সম্পাদকের চাপ জিনিসটা লেখার পক্ষে ভাল না খারাপ? এই যেমন হর্ষদা বলেছিলেন, আর সাতদিন দ্যাখো...

বিনায়ক: ভাল, ভাল। নইলে তখন তো লেখালেখির মধ্যে ছিলামই না।

পৌলোমী: কিন্তু এটা কি কখনও লেখার ক্ষতি করে?

বিনায়ক: এখন যদি বলি, সূর্যের আলো কি কখনও ত্বকের ক্ষতি করে? হ্যাঁ কখনও-সখনও করে। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, তেল-টেল মেখে সূর্যের আলোয় পড়ে থাকলে বাচ্চারা বেশ পোক্তাই হয়!

পৌলোমী: শ্রীজাতর কী মনে হয়?

শ্রীজাত: কবীর সুমনের গানে শুনেছিলাম, সাহিত্য মরে পুজোসংখ্যার চাপে। পুজোসংখ্যা তো বাংলা সাহিত্যের অনন্য উদাহরণ। এই জিনিস তো অন্য ভাষার সাহিত্যে নেই। তার একটা চাপ যেমন আছে, এত শব্দের মধ্যে এত তারিখের মধ্যে লিখতে হবে। আবার এ-ও ঠিক, বাংলায় পুজোসংখ্যা থেকে কী-কী সাহিত্য উঠে এসেছে, সেটা দেখলেও হাঁ হয়ে যেতে হবে। পুজোসংখ্যা না থাকলে কি এমনি-এমনি সেসব লেখা হত? বা দেশ পত্রিকা না থাকলে কি 'প্রথম আলো' বা 'পার্থিব' লেখা হত? ওঁরা সম্পাদকের চাপ না পেলে লিখতেন কি না জানি না। একটা চাপ ভাল, আবার ঘাড়ের উপর ডেডলাইন এসে পড়লে আশঙ্কা হতে থাকে, পরীক্ষার মতো কাল সকালে পাতা জমা দিতে হবে। সব উত্তর লিখতে পারলাম তো? এইরকম একটা ভয় কাজ করে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, অন্তত গদ্য লেখার ক্ষেত্রে আমার মতো অলস ব্যক্তির

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে আমিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি গদ্য লিখেছি। কুড়িটার মতো উপন্যাস, গল্পও প্রায় সত্তর-আশিটা। কখনও অনুরোধে, কখনও নিজের তাগিদেও।

◆◆◆◆◆◆◆

জন্য পেছনে ছড়ি হাতে একজন লোক দরকার। নিজেকে মোটিভেট করিয়ে চল্লিশ হাজার শব্দের একটা উপন্যাস লিখে ফেলা বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

পৌলোমী: দু'জনেই উপন্যাস লিখেছিস। গদ্য সম্পর্কে তোদের ব্যক্তিগত মতামত কী?

শ্রীজাত: আমি বলতে পারি, গদ্য লেখা সবে শুরু করেছি। বছর দুয়েক হল পুজোসংখ্যার জন্য দুটো উপন্যাস লিখেছি মাত্র। তবে 'তারাভরা আকাশের নীচে' ভিতর থেকে তাড়িত হয়ে লিখেছিলাম। এবং অনেক মানুষ উপন্যাসটাকে ছুঁতে পারার কথা জানিয়েছেন। এইটা আমাকে খুব জোর দিয়েছে, কোথাও একটা ভরসা পেয়েছি। আর গদ্য লিখতে গিয়ে একটা অন্যরকম নেশার সন্ধান পেয়েছি, যেটা কবিতার নেশার চেয়ে আলাদা। গান গাওয়া, সেতার বাজানো...সব কিছুর তো আলাদা-আলাদা নেশা হয়। আমার মতো অলস লোকও যে পরিশ্রমটা করেছে, তার নেপথ্যে আছে গদ্যে অনাবিষ্কৃত দিগন্ত দেখার নেশা। কিন্তু এটাও বলব, আই অ্যাম স্টিল এক্সপ্লোরিং। আম্পায়ারের সামনে স্টাম্প ঠিক করছি, ইনিংস এখনও শুরুই হয়নি।

বিনায়ক: সমসাময়িক কবিদের মধ্যে আমিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি গদ্য লিখেছি। কুড়িটার মতো উপন্যাস, গল্পও প্রায় সত্তর-আশিটা। কখনও অনুরোধে, কখনও নিজের তাগিদেও। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর বা প্রকৃতির যোগাযোগের ক্ষেত্রে কবিতা যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ গদ্য ছাড়া চলে না। আমি যখন কুয়োর জলে বালতিটা নামিয়ে দিই, সেটা আমার কবিতা আর বালতি ভর্তি জল যখন তুলে আনি স্নান করার জন্য, সেটাই আমার গল্প-উপন্যাস।

পৌলোমী: শ্রীজাত তো গানও লেখে। লোকে বলে, ভাল কবিরা সাধারণত গান লেখেন না, অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে এর বাইরেই রাখছি। কিন্তু শ্রীজাত কেন গান লেখে?

শ্রীজাত: উত্তরটা তো তুমিই দিয়ে দিলে। ভাল কবিরা না-হয় গান লেখে না, আমার তো লিখতে দোষ নেই। গান তো আমি লিখতে এসেছি পেটের দায়ে। আমার জীবনের তিনটে স্বপ্ন ছিল। একটা হচ্ছে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া, দু'নম্বর, চাকরি না করা, তৃতীয়টা ইউরোপ বেড়ানো। গান আমি লিখতে এসেছি উপার্জনের কারণে। আমাদের বাড়িতে গানবাজনার চল ছিল। দাদু যেমন একদিকে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত গাইতেন, আবার নিজে লিখে কম্পোজ় করে রাগাশ্রয়ী বাংলা গান আসরে গাইতেন। মামা গান গাইতেন, মা গান গাইতেন। ফলে গান লেখার এবং তাতে সুর দেওয়ার প্রবণতা

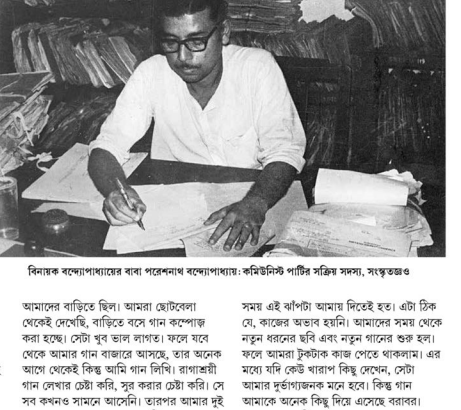

ছবি: বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য, সংস্কৃতজ্ঞও

আমাদের বাড়িতে ছিল। আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, বাড়িতে বসে গান কম্পোজ় করা হচ্ছে। সেটা খুব ভাল লাগত। ফলে যবে থেকে আমার গান বাজারে আসছে, তার অনেক আগে থেকেই কিন্তু আমি গান লিখি। রাগাশ্রয়ী গান লেখার চেষ্টা করি, সুর করার চেষ্টা করি। সে সব কখনও সামনে আসেনি। তারপর আমার দুই বন্ধু আমাকে অ্যাপ্রোচ করল ছবির গান লেখার জন্য। তাদের দু'জনেরও প্রথম সিনেমা।

পৌলোমী: কারা সেই দুই বন্ধু?

শ্রীজাত: বিরসা 'জিরো থ্রি থ্রি'-র জন্য আর সৃজিত 'অটোগ্রাফ'-এর জন্য। যেহেতু গানের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আমার কাজটা করতে খুব ভাল লাগল। ছবির গান লেখায় অনেক শর্ত আছে। স্ক্রিপ্টের মাথায় রাখতে হয়, অনেকসময় সুর আগে হয়ে যায়, ফলে সেই সুরের সঙ্গে ন্যায়িং মিলিয়ে শব্দ লিখতে হয়। এই প্রসেসটা অনেকটা খড়ের উপর মাটি চাপানোর মতো। আর ওই যে দ্বিতীয় স্বপ্নটা, চাকরি না করে বেঁচে থাকব, সেটা খুব কঠিন। কারণ, আমরা সবাই জানি, বাংলায় সাহিত্য করে পেট চালানো অসম্ভব। বাংলায় সাহিত্যের কদর থাকলেও, অর্থের দিকটা এমন নয় যা আমাদের সারা মাসের বা বছরের পুষ্টি জোগাতে পারে। একটা উপন্যাস লিখে আমি সারা বছরের উপার্জন তো করতে পারি না বাংলায়। তখন আমি দেখলাম গান লেখা একটা উপার্জনের মাধ্যম হয়ে উঠছে। আর দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি চাকরিও করেছি, সেখানে যথেষ্ট অসুবিধে অসম্মান সহ্য করে, নিজের লেখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, রাতে বাড়ি ফিরে বালিশে মাথা কুটে ভেবেছি, সারাদিন ধরে আমি কী করলাম! একটা সময় এই ঝাঁপটা আমায় দিতেই হত। এটা ঠিক যে, কাজের অভাব হয়নি। আমাদের সময় থেকে নতুন ধরনের ছবি এবং নতুন গানের শুরু হল। ফলে আমরা টুকটাক কাজ পেতে থাকলাম। এর মধ্যে যদি কেউ খারাপ কিছু দেখেন, সেটা আমার দুর্ভাগ্যজনক মনে হবে। কিন্তু গান আমাকে অনেক কিছু দিয়ে এসেছে বরাবর। আমার আত্ম জুগিয়েছে, এবং আমার ভাবনাও জুগিয়েছে। সুতরাং গানের কাছে আমি যুগপৎ ঋণী।

পৌলোমী: একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে, আমরা যে-সার্কলে ঘোরাফেরা করি, সেখানে বিরসা দাশগুপ্ত বা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগর সম্ভাবনা কম। সেটা তোর ক্ষেত্রে কীভাবে হল?

শ্রীজাত: না, তখন বিরসাও কোনও সার্কলে নেই, সৃজিতও কোনও সার্কলে নেই। সেই সময়টা সার্কলগুলো তৈরি হচ্ছে সবে। আজকে রুপোলি জগতের যে-বন্ধুদল, যার মধ্যে যিশু, রুদ্র, ইন্দ্রদীপ, জয়, টোনিদা, কৌশিকদা আছে আবার শ্রেয়া বা অরিজিৎ-ও আছে, তারা তো সবাই তখন ষ্ট্রাগলার। বিরসা, সৃজিতের ছবি তো কেউ দেখেনি তখন। সৃজিতকে আমি চিনতাম, কারণ আমরা দু'জনেই কবীর সুমনের সব অনুষ্ঠানে যেতাম। হঠাৎ একদিন বলল, আমি একটা ছবি বানাচ্ছি, তুমি একটা গান লিখে দেবে? বিরসাকে আমি অনেকদিনই চিনতাম। ওরাও তখন অন্যরকম কিছু চাইছিল, যেখানে সব কিছুই নতুন হবে। যে-কারণে সৃজিত সুরকার হিসেবে নিল অনুপমকে, যার তখনও ফিল্মে কোনও এক্সপোজ়ার নেই। বিরসা সুরকার হিসেবে নিল 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রুপটাকে। এখন যাদের

ইভাস্টি হিসেবে দেখা হয়, আমরা তখন সেরকমভাবে মেলামেশাই করতাম না। স্টাগলার বন্ধু হিসেবেই সকলে মিশতাম।

বিনায়ক: তোদের তিন প্রজন্মের একটা সাংস্কৃতিক পরিবার। দাদু তারাপদ চক্রবর্তী, মামা মানস চক্রবর্তী, মা শ্রীলা বন্দ্যোপাধ্যায়— এরকম ক্ষেত্রে তোর এন্ট্রি নেওয়াটা আমাদের মতো র‍্যাঙ্ক আউটসাইডারদের চেয়ে সহজ হয়। আমি গান লিখতে কখনও যাইনি, কিন্তু এই জগৎটাতে থাকার একটা সুবিধেও আছে। তবে একটা কথা আমি বারবার বলি, শ্রীজাত গান লেখার ফলে বাংলা বাণিজ্যিক সিনেমার লিরিক একটা অন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

শ্রীজাত: আমি দুটো অসুবিধের কথা বলব। এই ধরনের শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিমণ্ডলের একটা গোঁড়ামিও থাকে। আমার মা যখন খুব সাফল্যের সঙ্গে শাস্ত্রীয় গানবাজনা করছেন, মুম্বই থেকে প্লেব্যাকের অফার এসেছিল, আমার দাদু স্পষ্ট না করে দিলেন। কেননা, শাস্ত্রীয় সংগীতের তুলনায় ফিল্ম বাজারি জিনিস এবং খাটো ব্যাপার। ফলে আমার যে পারিবারিক ঐতিহ্য, সেটা সিনেমা থেকে এত দূরে, দ্যাট ডিডন্ট অ্যাকচুয়ালি হেল্প মি।

পৌলোমী: আচ্ছা, এবার একটা সরাসরি প্রশ্ন করতে চাই— বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বিজেপি?

বিনায়ক: প্রথম মুখোপাধ্যায় কি আরএসএস? ভিন্নমতটা ভিন্ন দিক থেকে এলে শোনাই যাবে না, এটা কে ঠিক করে দিল? মুশকিল হল, সাহিত্যসমাজের একটা অংশ আমাকে অকারণেই একটা স্ট্যাম্প দিয়ে দিয়েছে। এবং আমাকে একঘরে করে রাখার একটা বিরাট পরিকল্পনা চালিয়ে গেছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে। নানা শহর থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ডাক পাই, তারপর দু'দিন আগে একটা ফোন আসে, তোমার প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে করা হয় এবং সবশেষে জানায়, আপনার আর আসার দরকার নেই। এই প্রশ্নের উত্তর আমি কোথাও দিইনি, কারণ, নিজেদের স্বার্থে উত্তরটা তারা বিশ্বাস করবে না। দেশ পত্রিকার পাঠকের কাছে চূড়ান্ত সততার সঙ্গে জবাব দেব।

পৌলোমী: উত্তরটা কী? হ্যাঁ, নাকি না?

বিনায়ক: এটার জন্য আমাকে একটু সময় দিতে হবে।

পৌলোমী: বেশ।

ছবি: শ্রীজাতর সৌজন্যে

'দুর্বা আসলে বইমেলায় বইতে সই নিতে এসেছিল'

বিনায়ক: আজকে কতগুলো নির্ভেজাল, নির্জলা সত্যি কথা বললে তাকে বিজেপি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন? আমি দেখলাম, বিরাট বড় বামপন্থী আইকন তথাকথিত গেরুয়াবাদী কাগজের উদ্বোধন করে একলাখ টাকা নিলেন, কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। এটা তাঁর অ্যাপিয়ারেন্স ফি। কিন্তু আবেগের বশে কোনও কবি একজন ভদ্রমহিলার চেয়ার থেকে জল মুছে দিলে তাঁকে আক্রমণের পর আক্রমণে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। অথচ সরকারের কাছ থেকে লালবাতি দেওয়া গাড়ি বা বাড়ি যারা পায়, তাদের বেলায় প্রশ্ন ওঠে না। যখন আমি আইওয়া-তে ছিলাম, জন কেরির কাছে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য যে-ড্রাফট বিশ্বের সব লেখক মিলে পাঠিয়েছিলেন, সেই ড্রাফট এই বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা। ওরা বলেছিল, নির্ঘাত বার খাওয়ানোর জন্য, আমাদের চেয়ে ইংরেজিটা তুমি ভাল লেখো। তো আমি লিখেছিলাম। কিন্তু রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের হাতে যখন একশোজনের বেশি হিন্দুর গণহত্যা হয়, যার রিপোর্ট সর্বত্র রয়েছে, এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মুখে কুলুপ দিয়ে বালিশের তলায় মুখ লুকোন, তখন আমি সেটারও প্রতিবাদ করেছি। ব্যস, আমি হয়ে গেলাম বিজেপি! দাদরি-তে আখলাক মারা গেছে, জুনাইদ-কে পিটিয়ে মারা হয়েছে, আমার বুক ভেঙে গেছে, আমি যেখানে যখন সুযোগ পেয়েছি লিখেছি। সুদীপ্ত গুপ্তর মৃত্যুর পর আনন্দবাজারে আমার বড় লেখা বেরিয়েছিল। একইভাবে যদি ত্রিলোচন মাহাতোকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আমি কিছু বলব না! আমার দেশের বাড়ি মন্নারপুর, তার কাছে ইন্দ্রজিৎ দত্তকে ধর্মীয় কারণে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, আমি প্রতিবাদ করেছি। যিনি জুনাইদের মৃত্যুর প্রতিবাদ করেন এবং ইন্দ্রজিতের বা রোহিত তাঁতির মৃত্যুর প্রতিবাদ করেন না, তিনি কোনও-না-কোনওভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন। আমি দুটোর প্রতিবাদ সমানতালে করেছি। অন্যায় করেছি?

আসলে সংখ্যালঘুদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার না দেওয়া চিনের মতানুসারীরা ভারতের অ্যাকাডেমিয়া এবং সাহিত্যক্ষেত্রে একটা প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সেট-আপ তৈরি করতেই দেননি। এমন একটা একপেশে সেট-আপ বানিয়ে রেখেছেন যে, সেটাই বুমেরাং হয়ে তিরিশটা রাজ্যের মধ্যে কুড়িটা রাজ্যে পাশা পালটে দিয়েছে। সনাতন ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে যদি কেউ সম্মান করেন, তাঁর পক্ষে কোনও পুরস্কার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক কেন কেন্দ্রীয়স্তরের সরকারি সাহিত্য পুরস্কার পাননি? নিন্দুকেরা বলে, ওঁদের রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দের অকৃণ্ঠ প্রশংসা করে যাওয়াটাই কারণ। 'কেয়াপাতার নৌকা' এবং 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'— এই দুটো ক্লাসিক-ও একইভাবে পুরস্কৃত হয়নি। এটা একটা সিস্টেম, যা ঘুরপথে বিভাজন সৃষ্টি করছে। আমার মনে হয়, কোথাও এই সিস্টেমটা সম্বন্ধে না-বলা আসলে নিজের সঙ্গে শত্রুতা। শ্রীজাত আমার বন্ধু, সে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে লেখে, মধ্যপ্রদেশ নিয়ে লেখে। শ্রীজাতর দাদু তারাপদ চক্রবর্তী তাঁর এক ছাত্রকে চিঠিতে লিখছেন, আমি সেই ছাত্রের মুখেই শুনেছি, বাংলাদেশের কোটালিপাড়ায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে থাকা সম্ভব নয়, কোনও সংখ্যালঘুর পক্ষেই আর সম্ভব নয়, তুমি একটি ঘর হলেও আমার জন্য ব্যবস্থা করো। সেই ছাত্রের বাড়িতে তিনি এসে আশ্রয় নিচ্ছেন। আমরা জেনে এসেছি, এই ইতিহাসটা

বলতে নেই। 'দি আদার সাইড অফ সাইলেন্স'-এ এই গল্পগুলোও আছে। এবার আমি চুপ করে থাকলেই তো আমার সুবিধে, কারণ বললে আমার লেখা ছাপা হবে না, কোনও প্রাইজ পাব না। আমি কি পাগল যে বলি? বলি দুটো জায়গা থেকে। আমার একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, ভাবি যতদিন বাঁচব ততদিনই সত্য চেপে রাখব! দ্বিতীয় কারণ, সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করি। মল্লারপুর থেকে দশ মিনিট দূরে আমার গ্রামে নিজের একটা তিনবিঘে পুকুর ছিল। আমার বাবা রেফিউজি ছিলেন, বিয়ের সময় দাদুর কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নেননি। দাদু আমাকে বেশ কিছুটা জমিজমা দিয়েছিলেন। সেই পুকুরে মানুষ ওজু করে মসজিদে নামাজ পড়েন। মসজিদের ইমাম ওই পুকুরটা আমার থেকে কিনতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু মানুষের ইবাদত করার কাজে যে-পুকুরটা ব্যবহৃত হয়, আমি তার দাম নেব? একটা টাকাও নিইনি, দানপত্র করে দিয়েছি। এই সমদর্শিতার কথা বললাম এবং জীবনে প্র্যাকটিস করলাম বলে, নানা প্রান্ত থেকে তিরবিদ্ধ হতে থাকলাম। তাঁরাই নাকি সহিষ্ণুতার পক্ষে। শান্তিনিকেতনে সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী নামে একজন ছিলেন, রামায়ণ ও মহাভারতের উপর অনন্যসাধারণ কাজ আছে তাঁর। শঙ্খবাবুর লেখায় পড়েছি, শান্তিনিকেতনে একবার অধ্যাপকদের জন্য রঙিন পাঞ্জাবির ব্যবস্থা হচ্ছিল। সুখময়বাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলেন, গুরুদেব আমায় বিদায় দিন। আমি তো সেলাই করা বস্ত্র পরি না। আমি চলে যাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তোমায় কোনও ইউনিফর্ম পরতে হবে না। এবার এখানে যাঁরা কথায়-কথায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দেন, তাঁরা অন্য ভাবনার কাউকে দেখলেই এত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন কেন? তসলিমা নাসরিনকে যখন কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ পত্রিকায় তার বিরুদ্ধে লিখেছিল। হয়তো অনেকেই রাজি হতেন না। এবং লেখার পর এতদিন ধরে এত হুমকি আর থ্রেট পেয়েছিল যে, প্রেটিক্রফ হয়ে গেছিল। আমি তো কালবুর্গি আর গৌরী লঙ্কেশ হত্যারও তীব্রতম প্রতিবাদ করেছি। যদি কেউ হিংসার বিরুদ্ধে থাকেন, তা হলে তাকে তো সবরকম হিংসার বিরুদ্ধে থাকতে হবে। নাকি একপেশে কথাই বলা হবে? বালিগঞ্জ আর সল্ট লেকে থাকা লোকেরা হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, গোরুর কেন আইডি নেই শুনে, তারা শিলিগুড়ি থেকে আধঘণ্টার দূরত্বের জায়গাগুলোকে চেনে না। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসংখ্য গ্রামীণ মানুষ বেডরুমে গোরু নিয়ে শুয়ে থাকে। কারণ, হামেশাই গোরুগুলো চুরি হয়ে যায়। তাদের কাছে কিন্তু গোরুর আইডি-টা অত হাস্যকর শোনায় না। আপনারা এলিটিজম থেকে একটু বেরিয়ে আসুন! বেরিয়ে এসে দেখতে শিখুন। আমি তো সিপিএম বা তৃণমূলের বহু সভাতেও গেছি আমন্ত্রিত হয়ে। প্রশ্ন বিজেপি-র ক্ষেত্রেই শুধু উঠবে কেন? কিন্তু আমি এটাও স্পষ্ট বলছি,

আজকাল একধরনের জনগণ হয়েছেন, বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ায়... যদি আমার বসন্তকাল নিয়ে লেখা লিখতে ইচ্ছে হয়, সেই অধিকার যেন আমার নেই, কারণ কেউ একজন কমেন্টবক্স-এ এসে লিখবেন, আপনি অমুক জায়গার ঘটনাটা নিয়ে কিছু লিখছেন না তো?

◆◆◆◆◆◆◆◆

ছবি: বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

'আমার ছোড়দি নন্দিনীর উৎসাহেই দেশ পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা পাঠানো'

আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নই। কোনও রাজনৈতিক দলের অন্ধ সমর্থক নই। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এখন ওয়ান ম্যান শো। মাথার উপর একজন ভগবানকে মানতে পারিনি, একজন মানুষকে মানব কী করে?

শ্রীজাত: আমি একটু যোগ করতে চাই। আজকে আর সেই অবস্থাটা নেই যে, উত্তরপ্রদেশের ঘটনার প্রতিবাদ করে আমি বাড়িতে মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে আরামে আছি। সেই ঘটনাটার পর ছ'মাস আমি মুড়ি খেতে গেলেও আমার পিছনে একজন দেহরক্ষী পিস্তল কোমরে গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমার স্ত্রী দিনের পর দিন ধর্ষণের হুমকি পেয়েছেন, অশ্লীল ছবি, ইঙ্গিত, কুরুচিকর প্রস্তাব পেয়েছেন। আর ওইভাবে খতিয়ান দেওয়াটাও কোনও কবির কাজ নয়। তবে অমরনাথ যাত্রীদের যখন ইসলামিক মিলিট্যান্টরা হত্যা করে, আমি তার বিরুদ্ধেও লিখেছি। হয়তো কারও মনে থাকার কথা নয়, ঢাকার রাজপথে ব্লগার অভিজিৎ খুন হওয়ার পর একগুচ্ছ লেখা দীর্ঘ সময় ধরে লিখে গিয়েছি। যখন কেউ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন, তখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তোলেন। নইলে আমার সামান্য লেখালেখির একটু খবর রাখলে অন্তত এই অভিযোগ তোলা সম্ভব হত না। কেননা, আমি বিশ্বাস করি সম্প্রসের একটাই ধর্ম— হিংসা।

বিনায়ক: আমিও তো লিখেছি। কিন্তু আমি যদি তার মতো বিপন্ন হই, আমি কোনও পিস্তলধারী রক্ষী পাব না, কোনও নিরাপত্তা পাব না। এর কারণ মনে হয় সেই একই বায়াস্‌ড্ সিস্টেম।

শ্রীজাত: আজকাল একধরনের জনগণ হয়েছেন, বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ায়... যদি আমার বসন্তকাল নিয়ে লেখা লিখতে ইচ্ছে হয়, সেই অধিকার যেন আমার নেই, কারণ কেউ একজন কমেন্টবক্স-এ এসে লিখবেন, আপনি অমুক জায়গার ঘটনাটা নিয়ে কিছু লিখছেন না তো? বসন্তকাল নিয়ে কেন লিখছেন? আবার কখনও সেই ঘটনা নিয়ে লিখলে আর-একজন বলবেন, আপনি কিন্তু অমুক ঘটনাটা নিয়ে চুপ। এটা তো আমার কাজ হতে পারে না যে, আমাকে সকালে উঠে দেখতে হবে আজ এই তেরোটা ঘটনা ঘটেছে, এবার এর প্রত্যেকটা নিয়ে একটা কবিতা লিখতে হবে। একটাও মিস

উৎস: দে সরকার

'আমাদের স্তম্ভ না বলে 'combo' বলাই ভাল'

করলে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কবি তো কফিশপ বা ম্যাকবার নয়। আমি তো কবিতার দোকান খুলে বসিনি। একদিন বসন্তকাল বা ছোটবেলার স্মৃতি আমাকে টানতেই পারে, আবার ওই একই দিনে একটা রাজনৈতিক খুনও হতে পারে। আমার কি সেই অধিকার নেই যে, আমি স্মৃতিটাকে এগিয়ে রাখব? মানুষ তো যন্ত্র নয়। আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁরা গত কুড়ি বছরে কোনও ঘটনায় কোনও প্রতিবাদ করেননি, কিছুতেই তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়াই পাওয়া যায় না। তাঁরাও কবিতা, উপন্যাস লেখেন। তাঁদের তো কেউ তলব করছে না। তলব আমাদেরই করা হয়, কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। কিন্তু আমরাও তো মানুষ। অনেকসময় আমরা ভেতরে কাঁদি, যা লেখায় প্রকাশ পায় না।

পৌলোমী: আচ্ছা, এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। কবিদের গোষ্ঠী কি থাকা উচিত?

শ্রীজাত: এই নিয়ে চরম সত্যটি বলেছেন শঙ্খ ঘোষ, এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়। সঙ্ঘ থাকে না। আমার খুব অবাক লেগেছিল লেখালিখির শুরুতে যে সামান্য তো দু'-চার লাইন লিখি আমরা, দু'-চার জায়গায় ছাপা হয় আর দু'-একজন চেনেন। তা সত্ত্বেও এত ঈর্ষা, এত পরশ্রীকাতরতা, এত পিঠে-ছুরি-মারা কেন! সেই তো বাড়িতে গিয়ে একটা খাতা খুলে লিখতে বসতে হবে। আর তো কিছু প্রমাণ করার নেই কারও কাছে। তখন আমি বুঝেছিলাম, ওই যা-যা আছে সবই উপর-উপর। এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, গোষ্ঠী হয়তো পত্রিকা চালাতে গেলে লাগে, একধরনের লেখা প্রোমোট করতে গেলে লাগে, কিন্তু কবিতাকে গোষ্ঠী কোনওভাবে সাহায্য করতে পারে বলে আমি বিশ্বাসই করি না। কবিতা একার শিল্প।

পৌলোমী: আজ নতুন যারা কবিতা লিখতে আসছে, তাদের প্রতি কী পরামর্শ হতে পারে? আজকাল যাকে বলে 'টিপস'।

বিনায়ক: পামুকের 'মাই নেম ইজ় রেড'-এর শুরুতেই কুয়োর ভিতর থেকে একজন মৃত মানুষ

> আমি তো পরামর্শ দেওয়ার জায়গায় নেই। তবু অভিজ্ঞতা থেকে বলব, মাঝে-মাঝে এমন অনেককে দেখি, যাদের দেখে মনে হয়, তিনি তাঁর শিল্পমাধ্যমের চেয়েও বেশি জরুরি। ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর।
>
> ◆◆◆◆◆◆◆◆

তার জীবনের কথা বলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, জীবনে মৃত্যুর আগুন জ্বলে ওঠা। মনে হয় লেখার কোনও কোনও মুহূর্তে এই ব্যাপারটা ছুঁয়ে গেলে ভাল।

শ্রীজাত: আমি তো পরামর্শ দেওয়ার জায়গায় নেই। তবু অভিজ্ঞতা থেকে বলব, মাঝে-মাঝে এমন অনেককে দেখি, যাদের দেখে মনে হয়, তিনি তাঁর শিল্পমাধ্যমের চেয়েও বেশি জরুরি। ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর। শুধু একটা জিনিসই মাথায় রাখতে বলব, শিল্পের কাছে আমরা পিঁপড়ের মতো ছোট। আমার রচনাই আমাকে পায়ে পিষে মেরে ফেলতে পারে, এতটা শক্তি তার আছে। আমরা যেন লেখার চেয়ে নিজেকে বড় না ভেবে ফেলি। লেখার সম্ভাবনা বহু সমুদ্রের সমান, তার একটা ঢেউয়ে আমি তলিয়ে যেতে পারি। আমি যেন না ভাবি, আমিই ওই সমুদ্র গড়ে তুলেছি।

বিনায়ক: আবার এটাও মনে রাখতে হবে, আমরা শিল্পকে ধারণ করি। 'আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,/ তোমার প্রেম হত যে মিছে'— আমিও যেন সেই জায়গাটায় যেতে পারি।

পৌলোমী: এইখান থেকেই তা হলে জিজ্ঞেস করতে পারি, মানুষের জীবনে বা কবির জীবনে প্রেমের স্থান কতখানি? শ্রীজাত কী বলবে?

শ্রীজাত: সবাই স্বীকার করবে, প্রেম মানুষের জীবনে পালটাতে-পালটাতে যায়। স্কুলজীবনে প্রেমকে ঘিরে যে-উদ্দীপনা, উত্তেজনা, উৎসাহ

এবং বিরহ ছিল, সেটা এখন স্বাভাবিকভাবেই নেই।

পৌলোমী: দুর্বা কি শ্রীজাতর কবিতার প্রেমে প্রথমে পড়েছিল, নাকি শ্রীজাতর প্রেমে?

শ্রীজাত: আমার কবিতাবই প্রেমে, কারণ আমার বহু আগে ও আমার কবিতাকে দেখেছিল। দুর্বা আসলে বইমেলায় বইতে সই নিতে এসেছিল। 'উড়ন্ত সব জোকার' সেই বছরই সবে-সবে কৃত্তিবাস পুরস্কার পেয়েছে। বইমেলার শেষদিনে এসবিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠান যখন ভাঙছে, একটি ঝলমলে মেধাবী চেহারার মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, একটা সই করে দেবেন? তারপর ফিরে এসে বলল, ফোন নম্বরটা যদি দেন, ফিডব্যাক দিতে পারি। তখন সদ্য একটা সেলফোন কিনেছি, তার উপর একটি মেয়ে নম্বর চাইছে, এ সুযোগ তো ছাড়া যায় না। তারপর দুর্বা আমাকে ফিডব্যাক দেয় এবং সেই ফিডব্যাকের ধারা এখনও চলছে। কবিতার মাধ্যমেই আমার জীবনে চূড়ান্ত প্রেমটি এসেছে। কিন্তু পৌলোমীদি, আমি এবার বিনায়ককে একটা প্রশ্ন করতে চাই। তুমি কি চিরকুমার থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ?

বিনায়ক: বিয়ে কেউ করে না, হওয়ার থাকলে হয়। আর আমি তো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কিছু করিনি। তোর প্রশ্নের সূত্রে জেনিফার লোপেজ-এর একটা কাঁচা কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে গেল, আই অ্যাম লোনলি, আই অ্যাম লাভলি। পরে জানা গিয়েছিল লাভলি-টা প্রিন্টিং মিস্টেক। শেষপর্যন্ত একটা হৃদয়ই খুঁজি যা কার্ডিওটিক্সিক নয়।

শ্রীজাত: আমি আর-একটা কথা যোগ করতে চাই, প্রেম যে শুধু মানুষের সঙ্গেই হবে এর কোনও মানে নেই। হতেই পারে শহরের সঙ্গে প্রেম। যেসব শহরে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তাদের সঙ্গে আমার রীতিমতো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। দু'-একটি শহরের প্রেমে এমনও পড়েছি যে, নিজের শহরে ফিরে এসে আমি কেঁদেছি।

পৌলোমী: কোন শহর?

শ্রীজাত: যেমন ধরো নিউ ইয়র্ক। নিউ ইয়র্ক শহরে আমি প্রথমবার ভিনসেন্টের 'দ্য স্টারি নাইট' ক্যানভাসটা দেখি। সেই অভিজ্ঞতাটা আর কোনওকিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়। তা ছাড়া আরও নানান কারণে এই শহরটায় বারেবারে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। নিউ ইয়র্ক বা প্যারিসকে আমি একজন সঙ্গিনীর মতোই মনে করি। তবে সম্প্রতি লন্ডন শহরের প্রেমেও যে আস্তে-আস্তে পড়ছি, টের পাচ্ছি।

পৌলোমী: বিনায়কের ক্ষেত্রে প্রেম কীভাবে আসে?

বিনায়ক: প্রেম কিন্তু একটা কুকুরের সঙ্গেও মানুষের হতে পারে। আর আমারও একটা প্রিয় শহর আছে, সেটা সান ফ্রানসিস্কো। আর ছেলেবেলার উদ্দীপনার বয়সটা তো একসময় চলে যাবেই। কিন্তু এখন মনে হয়, জানলা দিয়ে দেখা বাইরের পৃথিবীটা যেন মৃদু আর খিদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। এই দুইয়ের সহাবস্থানটাই যেন পৃথিবী। অর্থের খিদে, ক্ষমতার খিদে, প্রতিষ্ঠার খিদে, প্রেমের জন্যও যুদ্ধ, অর্থের জন্য যুদ্ধ। এই লড়াইটার ভিতরে প্রেমের জায়গাটা কোথায়? প্রেম মনে হয় সেই পাগল কোকিলটা, যে ডেকেই যায় ডেকেই যায়, কিন্তু চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায় না। হয়তো দেখতে না পাওয়াটাই মঙ্গল।

পৌলোমী: এবার একটি প্রশ্ন, যার উত্তর সব পাঠকই পড়তে চায়। প্রিয় লেখক?

বিনায়ক: রবীন্দ্রনাথ, শিমবোর্স্কা, বিভূতিভূষণ, অরহান পামুক, হেমিংওয়ে। আর ইহুদি ইমিগ্র্যান্ট লেখকরা আমাকে ভীষণ প্রভাবিত করেন— ফিলিপ রথ, বার্নার্ড মালামুড, আই বি সিঙ্গার, সিম্বিয়া ওজিক... তাঁরা যা বলতে চেয়েছেন, পাঠকের পরোয়া না করে বলেছেন। এইটা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং আমি ব্যাপারটা ইমবাইব করতে চেষ্টা করেছি।

পৌলোমী: শ্রীজাতর প্রিয় লেখক?

শ্রীজাত: এই মুহূর্তে যদি বলতে বলো, মির্জা গালিব, উইলিয়ম শেক্সপিয়র, জীবনানন্দ দাশ, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, সিলভিয়া প্লাথ। আবার, প্রভাবের কথা যদি ওঠে, তা হলে আমি বলব, আমাকে অনেক লেখকের চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন আন্দ্রেই তারকভস্কি। আমার লেখালেখি বা বেঁচে থাকাতেও তাঁর ছবির একটা বড় প্রভাব থেকে গিয়েছে। এরকম অনেক কম্পোজার বা পেন্টারও আছেন। মির্জা গালিবের কাছে আমি যেমন ঋণী, তেমনই তারকভস্কির কাছেও ঋণী।

পৌলোমী: এমন কোনও লেখা আছে, যেটা পড়ে আর-একজনের মন হয়েছে, আহা আমি কেন এটা লিখলাম না! এরকম একটা উদাহরণ?

শ্রীজাত: বিনায়কের দীর্ঘকবিতাগুলো পড়ে তো আমার সব সময়ই এটা মনে হয়। দীর্ঘকবিতা ওর কাছে এত সফলভাবে এসেছে, আমার কাছে সেভাবে আসেনি। ওর দীর্ঘকবিতাকে আমি ঈর্ষা করি। আবার, 'তোমাকে ভালবেসেছি বলে বিকিয়ে দিয়ে এসেছি নাকি, নিজেকে ভালবাসার অধিকার?'— এইরকম একটা লাইন আমি কখনও লিখতে পারিনি। মনে হয়েছে, ইস, মিস হয়ে গেল। বাস চলে যাওয়ার মতো। একজন কবি এরকম অনেক বাস ছেড়ে দিয়ে একটা বাসের পাদানিতে হয়তো একটু ঝোলা যায়। সেই পাদানিতে উঠেও যদি আমরা একে-অপরের পা মাড়ানোর চেষ্টা করি, সেটা খুব হাস্যকর।

পৌলোমী: শ্রীজাতর এমন কোনও লাইন যেটা বিনায়কের মনে আছে?

বিনায়ক: ধরো, বালব্ খেতে পারে একটা লোক, কিন্তু আলো খেতে পারে না সে— এই লাইনটা যে কত-কতদিন আমার মাথায় ঘুরেছে! কিংবা, অসীমকালের যে হিল্লোলে তোমার বাবা দরজা খোলে, দেখেই আমার প্রাণ উড়ে যায় রঞ্জিনী... এগুলোও তো মনে গেঁথে গেছে। আমাকে একজন বড় কবি বলেছিলেন, ছন্দে দুটোই নাম্বার হয়— শূন্য আর একশো। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমিই কত পাই? উনি বলেছিলেন, শূন্য, র‍্যাংকেট ৯৮। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলাম, শ্রীজাত কত পায়? তিনি বলেছিলেন, শূন্য, র‍্যাংকেট ৯৯। এই একের ডিফারেন্সটা থাকবেই।

পৌলোমী: একশোটা তা হলে কে পাবে?

বিনায়ক: একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। কারণ, আর কেউই কি সাড়ে নিরানব্বইয়ের বেশি পাবেন?

পৌলোমী: শ্রীজাতর জোর ওর ছন্দে। কিন্তু শ্রীজাতকে ছন্দ এতটা পেরে বসল কেন?

শ্রীজাত: ওটা একটা নেশার মতো ছিল একসময়। অনেকে মনে করেন, অন্ত্যমিল বানানো হয়। কবিতা আসলে মাথা খাটিয়ে হয় না। কবিতা যেভাবে আসে, তাকে সেভাবেই ধারণ করতে হয়। আমাদের কবিতার সামনে দুর্বল হয়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কিছু করার নেই। অন্ত্যমিলের মজা এখানেই যে, সে ওভাবেই ধরা দেয়। আসলে আমি ছোটবেলা থেকে কবিতার চেয়ে অনেক বেশি থেকেছি গানবাজনার সঙ্গে। বাড়ির পরিবেশের জন্যই সেটা হয়েছে। তাই ছন্দটাকে খুব স্বাভাবিক, এমবেডেড মনে হয়েছে, কখনওই বহিরাগত মনে হয়নি। ফেলুদাকে যেমন তোপসে ছাড়া দেখা যায় না, আমার কবিতাতেও অনেকসময় তোপসের কাজ করেছে ছন্দ, অন্ত্যমিল।

বিনায়ক: সেটা আবার চোরাবালিও হতে পারে। শুধুই মিলটা...

শ্রীজাত: এখানে আমি একটা অভিমানের কথা তা হলে বলি। আমার এই ধরনের লেখা প্রকাশ্যে লেখি এসেছে বলে, অনেক ব্যয়োজ্যেষ্ঠ কবি বা পাঠক মনে করেন, এ ছাড়া আমি অন্য ধরনের কবিতা কিছু লিখিনি। তা তো নয়, আমি অন্য ধরনের লেখাও সমান গুরুত্ব দিয়ে লিখেছি। 'মুশতাক হুসেনের দরবারি', 'আমি আর উইলিয়ম' বা 'কর্কটক্রান্তির দেশ'-এর কবিতাগুলোর কথা কেউ হয়তো মনে রাখেননি।

পৌলোমী: শেষ প্রশ্ন, এই সময়ে দাঁড়িয়ে জীবনের কাছ থেকে তোদের কার কী চাহিদা?

বিনায়ক: দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ, কবিতা আমাকে ত্যাগ করেনি, আমিও যেন কবিতাকে ত্যাগ না করি।

শ্রীজাত: আমার হয়ে উত্তরটা সুনীলদাই লিখে দিয়েছেন তাঁর কবিতায়, জীবনের কাছে সেটাই আমার একমাত্র চাহিদা— 'সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি'। ■

বাঁ দিক থেকে কৃষ্ণা বসু, দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপম ইসলাম ও সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা এখন হিন্দির: আগ্রাসন আছে, প্রতিরোধও

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

'বাঙালি এখন হিন্দির দাসত্ব করতেই স্বচ্ছন্দ' বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে বললেন বিতর্কসভার অংশগ্রহণকারীরা।

নিখাদ বাঙালি ভদ্রলোক ভারতভ্রমণে বেরোলে একদা হিন্দি সেফ-টট গোছের বই নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, ট্রেনে বসে নির্বিধায় চালিয়ে যেতেন কলকাত্তাইয়া হিন্দি, সাহেবি কেতার বিশেষ তোয়াক্কা না করেই জানিয়ে দিতে পারতেন পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্তরাঁয় মাঝবয়স পর্যন্ত খেতে আসেননি তিনি, কারণ, 'থাকি সেই গড়পারে। পাবলিশার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়, এ তল্লাটে খেতে আসার মওকাই বা কোথায় আর দরকারই বা কী?' দরকার শব্দটি এখানে বড় জরুরি। এখান থেকেই তো শুরু হয়ে যেতে পারে বাক্‌বিতণ্ডা, বিতর্ক। অন্য এক সংস্কৃতি, অন্য ভাষা কিংবা অন্য রীতিনীতি, সেটা কতক্ষণ 'আদার' হয়ে থাকে, আর কখনই-বা অনুসরণ, অনুকরণ, অনুরণনের সীমারেখা পেরিয়ে একেবারে 'দাসত্ব' হয়ে ওঠে, এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর পাওয়া বড় কঠিন। অতএব, বিতর্ক।

'দেশ' পত্রিকা আয়োজিত ২০১৮-র বিতর্ক সভার বিষয়টাও ছিল এমনই শব্দের, কণ্ঠস্বরের চাপানউতোর উসকে দেওয়া— 'বাঙালি এখন হিন্দির দাসত্ব করতেই স্বচ্ছন্দ'। বক্তারা সকলেই স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত— চিত্রকর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতজ্ঞ দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কৃষ্ণা বসু, সংগীতশিল্পী রূপম ইসলাম, সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্চালকের ভূমিকায় সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তী। জি ডি বিড়লা সভাগারের মঞ্চও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল দুই পক্ষে— একদিকে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রূপম ইসলাম, অন্য মতাবলম্বী কৃষ্ণা বসু, দেবজিত্

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। রামানন্দবাবুদের বিশ্বাস, বাঙালি কখনও হিন্দি দাসত্ব করেন না। কেবল বিনোদনের জন্য মাঝে-মধ্যে হিন্দি গান-সিনেমা-সিরিয়ালের কাছে যান। বাংলাদেশের রাস্তায় তাই তিনি দেখতে পান লেখা— 'সাবধান, সামনে পথদ্রাধক' কিংবা 'পথচারী পারাপার।' বাংলারই তো জয়জয়কার, সেখানে হিন্দির দাসত্ব কোথায়?

রূপম ইসলাম বললেন ওঁকে, আজকাল আমরা ঠেঁড়স বলি না, বলি ভিন্ডি এবং এটাও হিন্দির প্রভাবেই, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই জানিয়ে দিলেন, কেউ যখন কোনও একটা কাজ করতে পারে না, আমরা তাকে বলি, 'তুই একটা ঠেঁড়স, আমরা সেখানে কখনও ভিন্ডি শব্দটা ব্যবহার করব না'! বাংলামাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গেও তিনি জানালেন, 'রোজগারের ভিত্তিতে একটা জিনিস উঠে যাওয়া, আর জীবন থেকেই উঠে যাওয়ার মধ্যে তফাত আছে'। বিপক্ষ বক্তাদের কাছে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন— রামানন্দবাবুর ছবি কি হিন্দি বলয়ে প্রসার লাভ করেছে? সঙ্গীতা কি তাঁর সাহিত্যে হিন্দি শব্দ বা প্রতিশব্দ আদৌ ব্যবহার করেন? রূপম কি হিন্দি সংগীতের কাছে ঘুর ঋণী? প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়েই তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট, এখনও বাঙালি হিন্দির 'দাসত্ব' অন্তত করছে না। বাঙালি কালিডাল দিয়ে ভাত আটাশ কোটিরও বেশি বাঙালি যথেষ্ট আত্মসচেতন, তাঁরা কখনওই হিন্দির দাসত্ব করেন না। কেবল বিনোদনের জন্য মাঝে-মধ্যে হিন্দি গান-সিনেমা-সিরিয়ালের কাছে যান। বাংলাদেশের রাস্তায় তাই তিনি দেখতে পান লেখা— 'সাবধান, সামনে পথদ্রাধক' কিংবা 'পথচারী পারাপার।' বাংলারই তো জয়জয়কার, সেখানে হিন্দির দাসত্ব কোথায়?

রূপম ইসলাম বললেন ওঁকে, আজকাল আমরা ঠেঁড়স বলি না, বলি ভিন্ডি এবং এটাও হিন্দির প্রভাবেই, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই জানিয়ে দিলেন, কেউ যখন কোনও একটা কাজ করতে পারে না, আমরা তাকে বলি, 'তুই একটা ঠেঁড়স, আমরা সেখানে কখনও ভিন্ডি শব্দটা ব্যবহার করব না'! বাংলামাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গেও তিনি জানালেন, 'রোজগারের ভিত্তিতে একটা জিনিস উঠে যাওয়া, আর জীবন থেকেই উঠে যাওয়ার মধ্যে তফাত আছে'। বিপক্ষ বক্তাদের কাছে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন— রামানন্দবাবুর ছবি কি হিন্দি বলয়ে প্রসার লাভ করেছে? সঙ্গীতা কি তাঁর সাহিত্যে হিন্দি শব্দ বা প্রতিশব্দ আদৌ ব্যবহার করেন? রূপম কি হিন্দি সংগীতের কাছে ঘুর ঋণী? প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়েই তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট, এখনও বাঙালি হিন্দির 'দাসত্ব' অন্তত করছে না। বাঙালি কালিডাল দিয়ে ভাত খায় না, বেগুনভাজা দিয়ে পুরি নয়, লুচিই খায়। হিন্দিই বরং বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির উপর 'অনেকটা নির্ভরশীল, দেবজিৎবাবুর এই ভাবনার সূত্রটাই ডালপালা মেলল বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে। সউনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোড়াইচরিত মানস'-এর হিন্দি অনুবাদ হওয়া জরুরি মনে করেছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ কি হিন্দির দাসত্ব? হিন্দি চলচ্চিত্র কোথায় থাকত বিমল রায়, শচীনকর্তা না থাকলে? বিনায়ক মনে করেন, বাঙালি হিন্দি সংস্কৃতির দাসত্ব নয়, বরং নিয়ন্ত্রণই করছে। তাঁর মত, হিন্দিই বাংলা থেকে কোনও দিনির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিতর্কের মূল বক্তব্যের শেষে 'সামিং আপ'-এর জন্য ভার হয়েছিল দু'জনের। একজন বক্তা, কিন্তু বাস্তবে অংশ নিলেন বিনায়ক, সঙ্গীতা, রূপম এবং কৃষ্ণা বসু। 'ফেফারি' সুধীর চক্রবর্তী কোনও পক্ষ নিতে পারবেন না জানালেও, বোঝা গেল তাঁর মতটি কী। তিনি বললেন, বাঙালিদের 'পোশাক ভুলে গেল, ভাষা চলে গেল, আহার্য চলে গেল, কী রইল তা হলে?' দক্ষিণ ভারতীয়রা কিন্তু কিছুই ত্যাগ করেননি। সবশেষে সঞ্চালকের আহ্বানে দর্শকরা হাত তুলে যেদিকে ভোট দিলেন, তাতে বিতর্কসভার মতটিকেই তাঁরা মেনে নিলেন মনে হল।

লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষ আজ বিরলই বটে।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

বহু ভাষা, বহু স্বর

OXFORD UNIVERSITY PRESS

পাঠককে পাশে নিয়ে আমাদের পথ চলা। বিদ্যাচর্চা, গবেষণা ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে আমাদের আবহমান দায় সময়ের কাছে...

চলতি বছরে সংগ্রহযোগ্য আসন্নপ্রকাশ :

- দীপঙ্কর রায়

সদা থাকো আনন্দে... শান্তিনিকেতনে

বাঙালির চিন্তা-ভাবনায় শান্তিনিকেতনের উপস্থিতি একটি বাস্তব ঘটনা, কিন্তু এই শান্তিনিকেতন আর সেই 'আইডিয়াল্ শান্তিনিকেতন'-এ করটা 'বাস্তব' আর করটা 'মিথ' সেই প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে চেয়েছে এই বই।

- আশিস নন্দী

জাতীয়তাবাদের অবৈধতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি

ব্রিটিশ-শাসনাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে জেগে ওঠা আধুনিক দেশ-সেটি সম্পর্কিত ধারনার এক মনস্তাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে।

- কে এ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস : প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিজয়নগরের পতন

কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী-রচিত প্রদলী এই গ্রন্থে উঠে এসেছে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত উপদ্বীপীয় দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের এক সর্বাঙ্গীন সুশৃঙ্খল বর্ণনা; যে-দিকটি বরাবর উপেক্ষিতই থেকে গেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায়।

- মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী, ললিতা জাকারিয়া

আমার জীবনের আদিকাণ্ড : এক চিত্রিত কাহিনি

মূলত বিশোরাগড় হিসেবেই মিরিঙ 'মাই আর্লি লাইফ'-এর এই চিত্রালংকৃত সটীক সংস্করণটি গ্রন্থরাবশেষের ইতিহাসে আজ এক বিংশতি বর্ষের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা এখনও অটুট।

- মাধব গডগিল, রামচন্দ্র গুহ

এই বিদীর্ণ ভূমি : ভারতের বাস্তুসংস্থানিক ইতিহাস

গ্রন্থটি আমাদের সামনে তুলে ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাকৃতিক ও বাস্তুসংস্থানিক ইতিহাসের এক ব্যাপ্ত ও বিজ্ঞানী ভাষ্য; সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বিষয়কারা এবং অগ্রগতির নানা দিক নিয়ে দুই লেখক নতুন যে-তত্ত্বদিশা পেশ করেছেন তা পরীক্ষিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগের সাপেক্ষে তুলনামূলক পর্যালোচনায়।

- সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের স্মৃতি : ঔপনিবেশিক নাগরিকতা থেকে বিশ্বায়িত আধুনিকতার পথে কলকাতা

সপ্তদশ শতকের ভারতবর্ষে তিনটি ক্ষুদ্র পল্লির জাতপাতিবিহিত আনুন বদলে গেল যখন ইংরে ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা তাঁদের বাসোপযোগী করে তুলতে ওই তিনটি পল্লিকে নিয়ে নগর কলকাতা পত্তন উদ্যোগী হলেন; এই গ্রন্থে কালের সারি ধরে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযাত্রা ব্রিটিশশাসিত ভারতের প্রথম রাজধানীর রমনীসুপ্ত তিনটি রাজপথের কাহিনি শোনাতে-শোনাতে।

বিশদে জানার জন্যে লিখুন:
indianlanguages@oup.com

আমাদের বই পেলেন সব বড় বইয়ের দোকানে এবং ই-কমার্স সাইট যেমন আমাজন এবং ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাবে।
অফলাইনে ইন্ডিয়ানদিনি এবং অফলাইনে ইন্ডিয়ানদিনি একটি বিশেষ ডিসকাউন্ট অফার করার লক্ষ্যে বিশেষাংশী প্রকাশনার কাজ করে চলেছে।

আমাদের বই পাওয়া যায়:
কথা ও কাহিনী, কলেজ স্ট্রিট • শাল বুক হাউস, কলেজ স্ট্রিট • লাশকাত্ত এন্ড কোং, কলেজ স্ট্রিট • চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং, কলেজ স্ট্রিট • পীরালার্স, সাউথ সিটি, গোলপার্ক মল, মনি প্লোয়ার মল • অক্সফোর্ড বুক স্টোর, পার্ক স্ট্রিট • মডার্ন বুক ডিপো, নিউ মার্কেট • অক্ষর, আগরতলা • জান বিচিত্রা, আগরতলা • বুক এম্পোরিয়াম, আগরতলা • বুক এম্পোরিয়াম, গুয়াহাটি

অ্যাকাডেমিক পাবলিশিং

১২থ ফ্লোর, ওয়ার্ল্ড টেড টাওয়ার, সি-১, সেক্টর ১৬, নোইদা ডি এন ডি ফ্লাইওভার, রজনীগন্ধা চক, নয়ডা ২০১৩০১

ইমেল: GAIMarketing.in@oup.com

বিশেষ সংখ্যা

কাশ্মীর উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা আন্দামান সহ পনেরোটি রাজ্যের দর্শনীয় স্থান খাওয়াদাওয়া বিশেষ আকর্ষণ ও কেনাকাটার হদিশ। থাকছে ইউরোপ আমেরিকা ও সাউথ আফ্রিকার ভ্রমণলিপি।

নিয়মিত বিভাগ ফ্যাশন সৌন্দর্য রান্নাঘর ধারাবাহিক

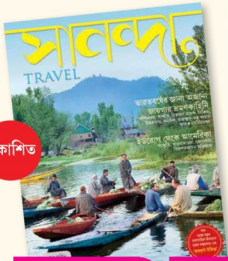

প্রকাশিত

আনন্দ TRAVEL

আনন্দ পুস্তক বিপণি ও এবিপি ওয়েডিংস এক্সক্লুসিভ সেন্টারে পাওয়া যায়।

ফেসবুকে আমাদের ফলো করতে ক্লিক করুন

সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত নেতৃত্ব

সুমিত মিত্র

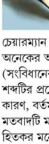

'সমাজতন্ত্র' শব্দটির সংজ্ঞা যেমন নমনীয়, তেমনই বিচিত্র ভারতে তার স্বীকৃতির ইতিহাস। আমাদের সংবিধান মুসাবিদা করার পর সেই খসড়া প্রণেতা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অম্বেডকর বলেছিলেন, "আমি অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও এখানে (সংবিধানের খসড়ায়) socialism শব্দটির প্রয়োগ থেকে বিরত রইলাম। কারণ, বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে মতবাদটি মনুষ্যসমাজের পক্ষে যতই হিতকর মনে হোক, একদিন হয়তো আরও কাঙ্ক্ষিত কোনও মতবাদের আবির্ভাব হবে। কোনও বিশেষ আদর্শের নিগড়ে সংবিধানকে আবদ্ধ রাখাটা অভিপ্রেত নয়।"

অম্বেডকরের প্রয়াণের একযুগ পর ইন্দিরা গাঁধী জরুরি অবস্থা জারি করে দেশে ও বিদেশে বামপন্থীদের খুশি রাখতে সংবিধানের ভূমিকায় ওই সমাজতন্ত্র কথাটি যোগ করেছিলেন। পরে কেউই আপত্তি করেননি, এমনকী বিজেপিও নয়। অম্বেডকর আশঙ্কা করেছিলেন, দেশটিকে 'সমাজতান্ত্রিক' তকমা লাগিয়ে দিলে সোশ্যালিস্টরা চাইতে পারে সর্বকিছুর কর্তৃত্ব যাক রাষ্ট্রের কবজায়, তাতে প্রতিহত হবে নাগরিকদের সৃজনশীলতা। কিন্তু ঠিক তার পরবর্তীকালে রামমনোহর লোহিয়া ও তাঁর অনুগামীরা দেশে সমাজতন্ত্রের পক্ষে এক প্রবল বাতাবরণ তৈরি করেন। নয়ের দশকে হিন্দুত্ববাদী বিজেপির উত্থান পর্যন্ত বিরোধী রাজনীতির পতাকাটি ছিল সমাজতন্ত্রেরই। সরকারপক্ষ থেকেও উঠত সমাজতন্ত্রের জয়ধ্বনি। এবং সেই রীতি এখনও বজায় রয়েছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা খুবই সন্দেহজনক। তার কারণ, কোনও কাজেই রাষ্ট্র তার কর্মদক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সরকারি ব্যাঙ্ক, বিমা সংস্থা, রেলপথ, হাসপাতাল— সবই অকর্মা, তদুপরি ঘুঘুর বাসা। রাষ্ট্রায়ত্ত এয়ার ইন্ডিয়া বেসরকারিকরণ করতে গিয়ে সরকার জেরবার, নিলামে হাজির নেই একজনও ডাকিয়ে।

কিন্তু তিন বছর মাত্র দিল্লির সীমিত পরিচালনভার গ্রহণ করেই (পুলিশ চালায় কেন্দ্র) অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির সরকার বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রে এনে দিয়েছে নতুন প্রাসঙ্গিকতা। সেই ক্ষেত্রটি হল, স্কুলশিক্ষা। দিল্লির সম্পন্ন পরিবারের সন্তানরা ভর্তি হয় নামজাদা সব স্কুলে, যেখানে দেড়-দু'দশক যাবৎ মাইনে ও আনুষঙ্গিক খরচ হিমালয়প্রমাণ। ক্লাস টেনের একজন ছাত্রের জন্য

ছবিঃ কৃষ্ণেন্দু দে সরকার

মাসে দশ-পনেরো হাজার টাকার সংস্থান তো চাই-ই। খুব অভিজাত স্কুলের পক্ষে তাও যথেষ্ট নয়। দিল্লিতে অনেক সরকারি স্কুল আছে— প্রায় হাজারখানেকের মতো— যা দেখে আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল, তখন আমরা পাতি মধ্যবিত্তরাও নাক সিটকোতাম। যেন সেগুলো তৈরিই হয়েছে জাইভার বা কাজের মাসির কচিকাঁচাদের জন্য।

তা আর নেই। ক্ষমতায় এসেই আপ সরকার শোনদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে শুধু একটি বিষয়ে, স্কুলশিক্ষা। বরাদ্দ হয়েছে বাজেটের চব্বিশ শতাংশ অর্থ শুধু শিক্ষাখাতে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক যোগ্য সহকর্মীর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে সংগ্রহ করেছেন একদল দক্ষ ও উদ্যোগী শিক্ষক। প্রিন্সিপালকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে এস্টেট ম্যানেজার। আগে অনিয়মিত শিক্ষকদের মাসে মাত্র পনেরো হাজার টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে কাজ সারা হত। এখন তা হয়ে গেছে ডবল। অনেককে নিয়মিত-শিক্ষক করে দেওয়া হচ্ছে দ্রুত। তারা প্রায়ই যাচ্ছেন আমদাবাদ আইআইএম-এ এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাস পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতে। নতুন রং, আকর্ষক ফার্নিচার, কম্পিউটার, ক্লাসে ভিডিয়োর চালাও ব্যবহার, প্রচুর খেলাধুলোর সরঞ্জাম। আমাদের পুরনো পাড়ার সরকারি স্কুলটিকে নবকলেবরে দেখে সত্যিই চিনতে পারিনি।

ফল আসছে হাতে-হাতে। এ বছরের বারো ক্লাস CBSE ফাইনালে দিল্লির সরকারি স্কুলের ৮৮.৩৬ শতাংশ পাশের হার পুরো ন'শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে দেশের সব প্রাইভেট স্কুলকে। দিল্লির ঝাঁ-চকচকে প্রাইভেট স্কুলেরও চার শতাংশ উপরে তারা। তবে ফাইনালের নম্বরই শেষকথা যে নয়, তা বুঝেছে এই নিতান্ত আটপৌরে ঘরের ছেলেমেয়েরা। এবার আইআইটি-তে ভর্তির প্রাথমিক পরীক্ষা JEE Mains-এ দিল্লির সরকারি স্কুলের ছাত্রদের ৩৭২ জন সফল হয়েছে। এটি এক বছরে সাতশো শতাংশ লাফ দেওয়ার শামিল। অর্থাৎ শুধু পাশ করাই নয়। এবার তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কৃতিত্বের বিচারেও টেক্কা দিতে চলেছে পয়সাওয়ালাদের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য, সে রাজ্যের রাজনীতিবিদরা নিছক ভোটের জন্য গরিব ভজনা করেন, কিন্তু স্কুলশিক্ষার মতো এক অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার তাঁদের না আছে সাধ্য, না ইচ্ছে। না হলে কি আর স্কুলের হেডমাস্টারমশাই স্বয়ং ব্রতী হন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিতে? এবং সেই কুকীর্তি যিনি জনসমক্ষে এনেছেন, তাঁকে দু'বেলা ভয় দেখানো হয়, এমনকী গুলিও ছোড়া হয়? সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত নেতৃত্ব। না হলে টুকে-পাশ করা বুকনিবাজদের পাল্লায় পড়ে তা হয়ে দাঁড়ায় শুধু ভোটের ভদকা।

মতামত লেখকের

ন্যুড স্টাডি

পি না কী ঠা কু র

জলছবি

বাবার বদলির চাকরি, আমরাও
বদলি হয়ে আসি— নতুন স্কুলবাড়ি,
নতুন শহরের খেলার মাঠটায়
নতুন রং ঢেলে বিকেল নেমে আসে

ছোট্ট স্টেশনের কৃষ্ণচূড়া গাছ
ঘন্টা বেজে গেছে, কু-ঝিক রেলগাড়ি...
ব্যস্ত পানিরপাড়ে, ভাঁড়ের চায়ে গ্রম
ধোঁয়ার মেঘ ছিঁড়ে ছুটেছে ইঞ্জিন

নেতাজি পাঠাগার— নীহাররঞ্জন,
ঘনাদা, শিবরাম, টেনিদা, মৌচাক...
শালের জঙ্গলে ভয়ের হানাবাড়ি,
ছোট্ট নদীটার কাঠের রোগা ব্রিজ

ব্রিজটা পেরোলেই ভগ্ন বাড়িঘর
পুরনো টেরাকোটা, শিবের মন্দির,
কামারশালা, তার হাপর গনগন,
ছোট্ট চা দোকানে আড্ডা খুশিয়াল...

আবার বদলির খবর চলে আসে
অজানা স্টেশনের নতুন ঠিকানায়
বাক্স গোছানোর কখন এক ফাঁকে
নতুন জল এসে দু' চোখ ভরে ওঠে

ছোট্ট কালো-সাদা কুকুর বাচ্চাটা
কী খাবে, কার পিঠে চাপবে এইবার?

শিশুবিপ্লবী

বাতাসে চেনাশুনো গন্ধ বারুদের
তখনও পাড়া ঘিরে চিকনিতল্লাশ,
গ্রামের শেল্টার নষ্ট, তছনছ
শহরে কে যে কাকে গোপন আশ্রয়...

আমরা কেউ ফোর, ফাইভে পড়ি কেউ
অঙ্ক পিরিয়ডে পড়ার একফাঁকে
গল্প বলতেন হিরণ্ময় স্যার,
অনেকে বলে, তিনি বোমাও বানাতেন।

স্কুলেই একদিন পুলিশ, কালোগাড়ি।
স্যারকে তারপর দেখিনি কোনওদিন।
এ ওকে কেঁদে কেঁদে বলেছি, ''দেখে নিস

আমরা বড় হয়ে ভাঙব জেলখানা।''

সুদূরপাল্লা

মধ্যরাত্রির রিকশা পার হয়
দীর্ঘ হাইওয়ে, শীতের ঝরাপাতা,
করোনেশন মোড়... লেডিজ় হস্টেল...
''বাঁ দিকে গলি, ভাই, এবার ডানদিকে''

ঘুমিয়ে আছে পুরো শহর, এতরাতে
দূরের মাঠে কারা আগুন জ্বালিয়েছে?
কেবল জেগে থাকে সুদূরপাল্লার
হলুদ বাসস্ট্যান্ড, পাহাড়ি কম্বল

রিকশা থামলেই সে দুটো রাতজাগা
চোখের হাসি আর নীরব আহ্বান...
আজকে গল্পের মতন মনে হয়

আজকে কবিতায় রাতের কড়া নাড়ে।

সুন্দরবন

ফেরিঘাটে ভিড়, ওপারে গোসাবা
যাত্রী, বাক্স, ছাগল, মুরগি,
মুদি-মণিহারি-শাড়ি-জামা-জুতো
সাইকেল ভ্যান, স্কুটার, বাইক...

সস্তায় ডাব, একটু নোনতা,
গদখালি ঘাট এখন রঙিন
নর্থ ক্যালকাটা মেডিকাল টিম,
ক্যামেরা সামলে চ্যানেল বালিকা...

'ছুটি লজ' থেকে সাহেব বিবিরা
ট্যুরিস্ট লঞ্চে, হেভি ব্রেকফাস্ট,
শখের গিটারে ডিং ডং সুর,
ইঞ্জিনে পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া...

সজনেখালির বাঘ প্রকল্প,
নেতিধোপানির প্রাচীন কাহিনি,
মাতলার জলে উথাল পাতাল,
বাঘ না হলেও হরিণ-কুমির

বন কেটে কেটে গ্রামনগরের
পত্তন সেই হাজার বছর...
আজও দল বেঁধে পিকনিক করি
নিজেদেরই হৃৎপিণ্ড পুড়িয়ে

আজও পূর্ণিমা এমনিই এসে ভেসে যায়...

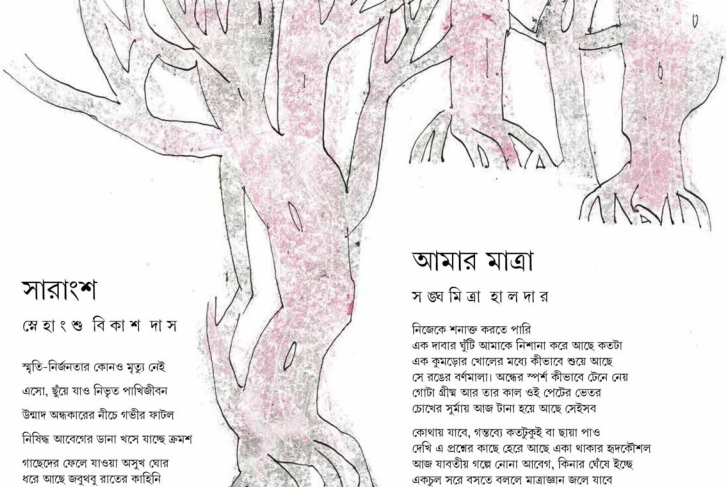

সারাংশ

স্নেহাংশু বিকাশ দাস

স্মৃতি-নির্জনতার কোনও মৃত্যু নেই

এসো, ছুঁয়ে যাও নিভৃত পাখিজীবন

উন্মাদ অন্ধকারের নীচে গভীর ফাটল

নিষিদ্ধ আবেগের ডানা খসে যাচ্ছে ক্রমশ

গাছেদের ফেলে যাওয়া অসুখ ঘোর
ধরে আছে জবুথবু রাতের কাহিনি

শীর্ণ ছবির ভেতর অন্ধ, কাটাকুটি, বিভ্রম,
আড়াআড়ি ছায়া ফেলে নিবিড় পাতায়

আমার মাত্রা

সঙ্ঘমিত্রা হালদার

নিজেকে শনাক্ত করতে পারি
এক দাবার ঘুঁটি আমাকে নিশানা করে আছে কতটা
এক কুমড়োর খোলের মধ্যে কীভাবে শুয়ে আছে
সে রঙের বর্ণমালা। অঙ্কের স্পর্শ কীভাবে টেনে নেয়
গোটা গ্রীষ্ম আর তার কাল ওই পেটের ভেতর
চোখের সূর্যায় আজ টানা হয়ে আছে সেইসব

কোথায় যাবে, গন্তব্যে কতটুকুই বা ছায়া পাও
দেখি এ প্রশ্নের কাছে হেরে আছে একা থাকার হৃদকৌশল
আজ যাবতীয় গল্পে নোনা আবেগ, কিনার ঘেঁষে ইচ্ছে
একচুল সরে বসতে বললে মাত্রাজ্ঞান জলে যাবে

তবু এ পর্যন্ত যা লিখি সবই আমার মাত্রা, তার কমবেশি নেই

সেরকম যদি আশ্চর্য কিছু ঘটে

সুনীলকুমার মোদক

আমি তারই সঙ্গে যেতে পারি মহুলবন
ভর দুপুর সেজে ওঠে পলাশের বন সেখানেও
তার হাতে কিছু থাক বা না থাক
একগুচ্ছ শালের তীব্র গন্ধভরা মুকুল
আমি তো যাব যতটা সম্ভব
খরার খরতাপে— জ্বলে উঠুক পায়ের পাতা
তীব্র থেকে তীব্রতর
তবুও যাব।
যাব ঠিক ঘন জঙ্গলে যাব।

বিষয় রাখতে পারি মন খারাপের নয়
সে যদি ডাকে একটা নিয়মের বাইরে
অন্য একটা নিয়মে
সে যদি ডাকে ভরা জোছনায়
মাদল পাহাড়ে— আমি যেতে পারি ভুল পথে
সে পথ মহুলবন যদি হয়—

আমি যেতে পারি অরণ্যের দিকে
এ মতিভ্রম নয়— মতের মিলন হলে,
একটু একটু করে ধরে রাখব আশ্চর্য প্রহর।

ফের মাদমোয়াজেল

অর্ণব সাহা

নিঃস্ব হব তোমার জন্য, ভাঙব সব ছন্দ
ট্র্যাফিক জ্যামে থমকে আছ, 'ওলা'-ক্যাবের ভেতর
সামান্য টেনশনের ছবি ড্রাইভারের গ্লাসে
ঠিকরে ওঠে, ''পৌঁছে দেব, চাপ নেবেন না ম্যাডাম''

'ক্যাফে কফি ডে'-র মধ্যে হালকা নিভু আলো
কয়েকটা মেয়ে, কমবয়সি, স্মোকিং-জোনে বসা
''আজকে আমি টিপ দেব, প্লিজ়, চুপটি করে বসুন''
উৎকণ্ঠাও হয়তো লেখার বিষয় হতে পারে...

সারামাগো-র 'ব্লাইন্ডনেস' পড়ে দেখতে পারো:
অন্ধ হয়ে যাবার আগে আমি তোমার চিবুক,
কানের লতি, গোলাপি ঠোঁট, চোখের মাসকারায়
বুলিয়ে দেব মায়াবী জিভ, বাইরে ঘষা-কাচের

কিনার ঘেঁষে ডিসেম্বরের চুঁইয়ে-নামা শীতের
কয়েক ফোঁটা বরফ-গুঁড়ো হাওয়ায় মিশে আছে:
আরেকটা দিন ফুরিয়ে এল, নশ্বরতার কাছে
আমি, তুমি, আমরা সবাই কোমল, নতজানু...

স্বপ্নে আমি নিঃস্ব হতে পারি তোমার জন্য
সব-হারানো মানুষ হতে ভিসাও লাগবে না!

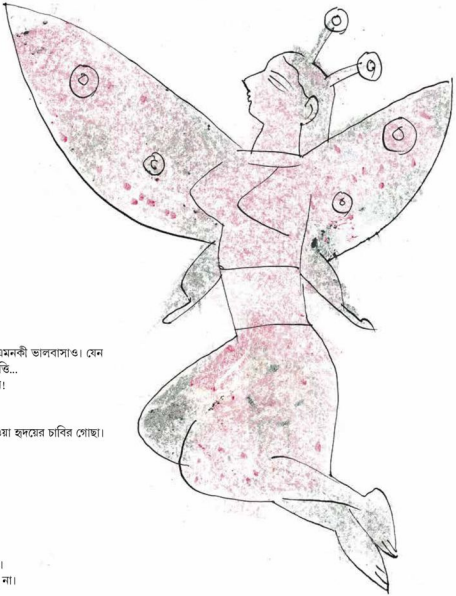

চাবি

বি ত স্তা ঘো ষা ল

আজকাল সব এক লাগে। মানুষের মুখ, চোখ, কণ্ঠস্বর এমনকী ভালবাসাও। যেন একটাই স্ক্রিপ্ট লেখা বহুযুগ আগে। এখন তারই পুনরাবৃত্তি...
দেখতে দেখতে নিজের মুখ হারিয়ে গেছে কে জানে কবে!

ক্লান্ত আমি এখন নিজেকে খুঁজছি।

কেউ সন্ধান দিলে দিতে পারি পৃথিবীর প্রথম খোয়া যাওয়া হৃদয়ের চাবির গোছা।

খোঁজ

শ্রা ব ণী খাঁ

আজকাল ফোনে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।
আসলে আমি চুপচাপ বসে থাকি ফোন ধরে। কথা বলি না।
ওরা বলে যায়—
আনন্দ পায়, ফিসফিস্ করে, কখনও ভালবাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা গান গায়
তারপর উত্তর না পেয়ে ফোন কেটে দেয়।

আমি এলোপাথাড়ি কথা খুঁজে যাই
ছোটবেলার এক চোখ উপড়ে যাওয়া পুতুলের কথা মনে পড়ে, স্কুলের ধারের কদম গাছের কথা মনে পড়ে,
প্রেমের কথা, ঘৃণার কথা, বাবার জন্যে মনখারাপের কথা মনে পড়ে, অথচ বলতে ইচ্ছে করে না।

আবার ফোন আসে।
গলা শুকিয়ে যায়।

পাঁজর খুঁড়ে কথা খুঁজতে খুঁজতে দেখি
সেখানে অন্ধকার সবেমাত্র ধরেছে বিস্তার।
নিশ্চুপ থাকি।
ওরা রেগে যায়, আবারও বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দেয়।

বিছানার কোণে পড়ে থাকে মৃত টেলিফোন।
টেলিফোনের পাশে থম মেরে বসে থাকে একটা নীরব মানুষের খোঁজ
যে আমাকে কথা বলতে বলবে না
শুধু বলবে— এসো, আঙুলে আঙুল রেখে চুপকথা হও। পারলে কাঁদো।

আর ঠিক তখনই পাঁজরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা বিষণ্ণ প্রজাপতি হুহু করে গুটি কেটে বেরিয়ে আসবে
সোজা উড়ে যাবে পৃথিবীর দূরতম উপগ্রহের দিকে।

তোমার পুতুল হই, ঘর-বাড়ি, ফেলে রাখা নদী

তাপস রায়

যা যা পারছি না, তার কথা বলো
তোমার আঁচল থেকে এই যত হাওয়া এসে গ্রীষ্ম নেভাল
তা কি খুব ধরে নিতে পারি
এসব সহজে পারা, আচমকা আমি-ই আনাড়ি
ধানের গন্ধটুকু টের পাই, মাঠ দূরে সরে যায়

শেকলে লোহার কাঠিন্য ওই, থিম
যেখানে যাবার যায়, ফেরিওলা যদি আকাশ-মহিম
থেকে পেড়ে হাঁসের পালক ফেরা জল নিয়ে আসে
দেখো ট্রাফিক সতর্কতায় ভালবেসে
চিনে নিতে থাকো অন্যকিছু, সুরের ক্ষমায়

একটি সজ্ঞের পাশে অন্য সজ্ঞ হাতছানি দেয়
যা জেনেছি তা যে কত কম, খুঁজে পাই চোখের তারায়

বুধনি মাঝি তোমাকে এক অবাঞ্ছিত কবিতা

সুমনা ভট্টাচার্য

এও এক আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব-সমাস।
পরিণামে বহুব্রীহি অনার্য রমণী
তুমি না পেলে ঘর, না উঠলে ঘাটে।
মল্লভূমের রাঙামাটি-সিজানো কৃষ্ণা ধরিত্রীপুত্রী
চুলে গোঁজা কাঁটায় তীক্ষ্ণ যৌবন।
তিন ভাগ জলের পৃথিবী ঢেউ হয় বুকে।
সরীসৃপ জীবন, জল কেটে এগোয়— যেন বিদ্যুৎ।
সে বিদ্যুতের আঁচ পোহায় দামোদরের শরীর।
বিদ্যুতের অমৃত-মন্থনে মন্দর পর্বত তুমি রমণী—
সর্প-ঘর্ষণে তোমার শরীরের ছাল-বাকল উঠে চলে।
আর্যপুরুষ দেশনেতা, আর্যপুরুষ ভাগ্য-বিধাতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
তাঁদের ঠোঁট ফাঁক হলে
আশ্বাসের বাষ্পরা হয় মন্দাকিনী—
স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়ে নেমে আসে মর্তে।
লালমাটির বুকে লেখে আকাঙ্ক্ষার পুরাণ।
শঙ্খনাদ-উলুধ্বনিতে জেগে ওঠে আর্যায়িত লোকাচার, মনস্বী মস্তিষ্ক।
অনার্য-বিলাসের সুগন্ধী গায়ে মেখে
আর্যপুরুষেরা তখন 'তোমাদেরই লোক'
মাল্যদান, পুষ্পস্তবকে রমণীয়া তখন অনার্যা হাত।
রাতে আগুন ঘিরে ধামসা-মাদলের শব্দে
ছন্দোবদ্ধ কৃষ্ণকলি পায়ের হাঁটুর গোছ
ঘিরে থাকে রক্তবর্ণ শাড়ির পাড়।
যেমন দামোদরের বুকের ঢেউ চেপে ধরে পাঞ্চেতের রক্তবর্ণ পাঁজর।
আদিম সভ্যতার অন্ধকার তখন কেতাবি আলোয় পারদ-বাষ্প।
জঙ্গলের আনাচে-কানাচে নাগরিক সভ্যতার ঝলমলে শরীরের উঁকি।
তারপর... শামাদানে তেল ফুরিয়ে আসে।
প্রদীপ নিভলে আলোর মুখে চিরন্তন অন্ধকারের ঘোমটা।
আর তুমি অনার্যা রমণী, বেজাতের গলায়
পোশাকি মাল্যদান রীতি সাঙ্গ করে
হয়ে যাও জাত-ধর্ম খোয়ানো প্রাস্তিক মানবী।
কোনও মারাংবুরু নেই তোমার তখন।
বিদগ্ধ আর্যপুরুষের বিগলিত করুণায়
তোমার মাথায় ছাদ ওঠে— ভঙ্গুর।
তোমার শয্যায় অংশীদারি— মিথ্যে সিঁদুরে সীমন্তিনী।
তোমার গর্ভের শিকড় থাকে না কোনও জমিতে।
আর্য-আঙুলের সুতোর টানে লাট খায়
তোমার পুতুল নাচের ইতিকথা।
আর্যপুরুষের সঙ্গে তোমার ফ্লেমবন্দি হাসিমুখ
এক উপহসিত নিষ্ঠুর বাস্তব— উপশমহীন যন্ত্রণা।
হতে পার কবি-লেখকের কল্পনা
অথবা চলচ্চিত্রকারের বিমূর্ত শিল্প—
তবুও পেট খালি তোমার।
কর্মসংস্থানের হাজিরা খাতায় নাম লেখাতে
দামোদরের জল, মাথা থেকে ঝরে পড়া ঘামে-ঘামে নোনতা।
তোমার কৃষ্ণা-সত্যবতীর যোজনগন্ধা শরীরে
সময়ের বিষণ্ণ কলম উৎকীর্ণ করে চলে
আর্যাবর্তের চিরন্তন মহাভারত—
যার চরিত্রচিত্রণে তুমি এক নির্জন বিস্মরণ।

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী

পরিযায়ী

স্বপ্না মিত্র

অনেকক্ষণ হল বিকেলের চায়ের পাট মিটে গেছে। এখন দূর সমুদ্রের বুকে বিদায়ী সূর্যের বর্ণচ্ছটা। আটাশ তলা কন্ডোমোনিয়ামের সাততলার ফ্ল্যাটে শোওয়ার ঘরের দেওয়াল জোড়া কাচের জানালায় শেষ বিকেলের মরা আলো। জানালার বাইরে মানুষের তৈরি সবুজ বনানীতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে।

প্রায় সাড়ে তিনশো স্কোয়ার ফিটের বড়সড় শোওয়ার ঘরটি পশ্চিমমুখী। তাই বিকেলের চা শোওয়ার ঘরে গড়িমসি করে খেতেই স্বাতী পছন্দ করে। আজ আবার রবিবার, সৌম্যকান্তি বাড়ি আছে। রবিবারের দিবানিদ্রার পর বিকেলের চা খেয়ে সৌম্যকান্তি এখনও বিছানায় গড়াচ্ছে, তার হাতে খোলা আইপ্যাড, সে আইপ্যাডের স্ক্রিনে দেশবিদেশের খবরে মগ্ন।

বহুবছর হল বিদেশই সৌম্যকান্তির নিজের দেশ, মানে পাসপোর্ট অনুযায়ী। তবু পাসপোর্ট

আর হৃদয়ের মাঝে যে এক যোজন ফারাক, সেই ফারাকের কিনারায় দাঁড়িয়ে আজও মাতৃভূমির খবর নিয়মিত পড়ার অভ্যাস সৌম্যকান্তির গেল না।

সৌম্যকান্তি বিছানায় গড়ালেও খাটের অদূরে রাখা বেতের ডিভানে স্বাতী পা গুটিয়ে বসে, তার দৃষ্টি জানালার বাইরে, চোখে রাজ্যের অন্যমনস্কতা। আইপ্যাডে খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে সৌম্যকান্তির চোখ চলে যায় স্ত্রী স্বাতীর প্রতি। স্বাতীকে অন্যমনস্ক দেখলেই সৌম্যকান্তির অস্বস্তি হয়। সে বিছানা থেকেই স্বাতীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী ভাবছ এত?"

সৌম্যকান্তির এক ডাকে স্বাতী সাড়া দেয় না।

দু'-মিনিট অপেক্ষা করে সৌম্যকান্তি উঁচু গলায় আবার জিজ্ঞেস করে, "কী ভাবছ এত এতোল-বেতোল হয়ে? সিনেমা দেখবে? একটা উত্তম-সুচিত্রা লাগাই?"

স্বাতী এইবার নড়ে বসে, তার ঠোঁটের ভাঁজে তিক্ততা, "নাঃ, আমার কিছু দেখতে ইচ্ছে করছে না, আর আমি কী ভাবছি তাও তোমাকে বলতে হবে? আমার ভাবনা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

সৌম্যকান্তির গলায় কৌতুক, "দরকার নিজের স্বার্থে, তুমি বেশি ভাবলেই জানি রেড সিগন্যাল, এখনই পুরনো ক্যাচাল শুরু করবে..."

স্বাতী বলে, "পুরনো ক্যাচাল ছাড়া আর কী আছে? আমরা নিজেরাই তো পুরনো, কোন মান্ধাতা আমলের মানুষ আমরা..."

সৌম্যকান্তি বলে, "নেই নেই করে এই

দেশেও দশ বছর হয়ে গেল।"

স্বাতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "দশ বছর পরেও এই দেশ মাঝে-মাঝে নতুন মনে হয়..."

আসলে স্বাতী ও সৌম্যকান্তি যখন এই দেশে এসেছিল, তারা ছিল এক মাঝবয়সি দম্পতি। যারা সাহস করে নতুন দেশে অভিবাসী হয়ে রয়ে গেল, পাসপোর্টের রং বদল করে। বিদেশের মাটিতে ঘর বাঁধার কথা অল্পবয়সে কোনওদিন স্বাতী ও সৌম্যকান্তি চিন্তা করেনি।

স্বাতীর ভাই হলে গেল অস্ট্রেলিয়া, সৌম্যকান্তির বোন লন্ডন, কিন্তু স্বাতী ও সৌম্যকান্তি জন্মভূমিতেই ছিল। ঘটনার প্রবাহে তাদেরও বেরোতে হয়েছে, শ্যাওলার মতো ভাসতে ভাসতে অবশেষে এদেশে এসে ঘাটি গেড়েছে।

ঘাটিই বটে, পাসপোর্টের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের স্থায়ী ছাদের সুব্যবস্থাও হয়ে গেছে। যা হয়নি তা হল শিকড় গাড়া। উপড়ে আনা গাছের প্রোথিত মূল চলনে বাধা পায়, ঠোক্কর লাগে। মাটির নীচে স্তরে স্তরে নরম জমিন কম, বেশিটাই কাঁকড়, পাথরে পরিপূর্ণ।

সৌম্যকান্তির ভুরুতে ঈষৎ কুঞ্চন, "কেন এখানে তুমি খুশি নও? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশে থাকার ইচ্ছে তো তোমার বরাবরের!"

স্বাতীর চোখে উদাস মেঘ, "অখুশির কথা নয়, তবে মাঝে-মাঝে বড় ফাঁকা লাগে, চারদিকে এত হট্টগোল, আকাশছোঁয়া বাড়ি, দু'-পা হাঁটলেই রকমফের রেস্তরাঁ, বিশাল বিশাল মল, তবু কী যেন নেই..."

আইপ্যাড বন্ধ করে এবার সৌম্যকান্তিও দৃষ্টি রাখে জানালার বাইরে মরা আলোর দিকে, তার গলায় হালকা বিষণ্ণতা, "এখানে কী নেই স্বাতী?"

স্বাতী বলে, "সম্পর্ক।"

"কেন মিসেস দাস তোমার বন্ধু নয়? ওই যে একটা কাঁচাপাকা চুলের মানুষ দেখছে, তাই কোমলতার অভাব।

"আর আমার তো এখন বুড়িদের মতো পায়ের সমস্যা, মাঝে-মাঝে হাঁটু কক হয়ে যায়, হাঁটু চলে না, হাঁটাচলা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় তখন।"

সৌম্যকান্তি হো হো শব্দে হেসে ওঠে, "আরে, তুমি তো বুড়িই, রগের ধারে চুলে সাদা ছোপ ধরেছে।"

স্বাতীও চোখ পাকায়, "আমি বুড়ি হলে তুমিও বুড়ো!"

স্বাতী ও সৌম্যকান্তির কথোপকথনের মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, দূর সমুদ্রে টুপটাপ আলো জ্বলে উঠছে জাহাজের বুকে।

স্বাতী ভিভান থেকে ওঠে, জানালার পরদা টেনে দেয়।

ততক্ষণে সৌম্যকান্তিও বিছানা থেকে উঠে পড়েছে, দু'বার আড়মোড়া ভেঙে বলল, "উফ কী গরম! তুমি তো এখন কিচেনে ঢুকবে, আমি বরং নীচে সুইমিং পুল থেকে ঘুরে আসি।"

স্বাতীর রান্নার মাঝপথেই রিনার ফোন এল। স্বাতীর রান্না চলছে গ্যাস-ওভেনে। সবজি, চিকেন, রাইস সব গলাগলি করে মাখামাখি হয়ে রাতের খাবার তৈরি হচ্ছে।

ওপেন কিচেনের সঙ্গেই ডাইনিং স্পেস আর ড্রয়িংরুম।

কিচেন এরিয়া থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে স্বাতী তরল গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, আজ রবিবার, অতনু বাড়ি নেই?"

রিনার স্বরে কুণ্ঠা, "বিরক্ত করলাম না তো? অতনু বাড়ি নেই গো, আজ বিকেলে আবার জাপান গেছে, একা একা এই অজানা অচেনা দেশে এত খারাপ লাগে!"

স্বাতীর গলায় প্রশ্ন, "আরে, না না, আমিও মিসেস দাস জানে অরুণার স্বামীর পুদিনায় অ্যালার্জি। ক্যানবেরা থেকে ততদীর মেয়ে এলে সবাই ফোন করে খবর নেয়— স্বাতী এদের সমবয়সি হয়েও পরিচয়ের গভীরতায় বারবার পিছিয়ে যায়, তার মনখারাপ লাগে।

অরুণা, শম্পা, ব্রততী, মিসেস দাস আর স্বাতীর মাঝখানে রিনা একজন নতুন, ওরা কানাডার অভিবাসী, রিনার স্বামী অতনু দু'-বছরের কনট্র্যাক্ট নিয়ে এখানে এসেছে, কানাডায় পড়ে আছে রিনার ছেলেমেয়ে, দু'জনেই ওখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।

স্বাতী বোঝে রিনার অসুবিধে, এক দেশ থেকে বাস উঠিয়ে অন্য দেশে বাসা বাঁধার কষ্ট, স্বজনহীন পরবাসে সঙ্গের উষ্ণতার প্রতি কাতরতা। স্বাতী তাই রিনাকে অঢেল সময় দেয়।

রিনা জিজ্ঞেস করে, "সৌম্যদার পায়ের ব্যথাটা সেরেছে?"

স্বাতী থমকে যায়, "পায়ের ব্যথা?"

রিনা বলে, "সেদিন বাজারে দেখলাম যে, সৌম্যদা পা টেনে হাঁটছে। কোথাও লেগেছে? নাকি রিউম্যাটিজ়মের সমস্যা?"

স্বাতীর গলায় শীতলতা, "না, কোথাও পড়ে যায়নি, রিউম্যাটিজ়মও নয়, সবই আমার কপালের দোষ।"

রিনা যেন নড়ে বসে, তার স্বরে চাপা কৌতূহল, "কেন, তোমার দোষ কেন?"

রিনার কৌতূহল স্বাতীকে অস্বস্তি দেয়, তবু সে জানে তাকে বলতেই হবে, একেবারে প্রথম থেকে, না হলে তো এরা বুঝবে না পায়ের ব্যথা এক নতুন উপসর্গ, এই সেদিনও সৌম্যকান্তি যুবক ছিল...

মিসেস দাস সব শুনে বলেছিলেন, "আহা তোমার দোষ নয়, বয়স হয়েছে, সময়ের সঙ্গে এমনিই শরীরের কলকব্জা বিকল হতে শুরু করে।"

১৯ স্বাতী দ্বিতীয়বার ভাবেনি, চলন্ত ট্রেন থেকে এক লাফ

নতুন এসেছে রিনা, সে তো তোমাকে প্রায়ই লাঞ্চে ডাকে।"

"আহা তা নয়, এখানে আমার হাতেগোনা ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে মিসেস দাস এক নম্বরে। তবে এই মাঝবয়সের সম্পর্কগুলো অন্যরকম..."

"যেমন?"

"এই মাঝবয়সে তৈরি সম্পর্কগুলো বড় কাঠকাঠ, কোমলতা নেই, কেমন হিমহিম, প্রতিনিয়ত এই শীতল স্পর্শে শীতকালের কথা মনে পড়ে, মনে হয় ফুরিয়ে যাচ্ছি, বুড়িয়ে গেলাম।

"আসলে এঁরা কেউই আমাদের বেড়ে ওঠা দেখেনি, যৌবনকাল জানে না, প্রথমদিন থেকে একা এখন, সৌম্য নীচে গেছে, সাঁতার কেটে ঘন্টাখানেকের আগে ফেরার চান্স নেই।"

স্বাতী একা আছে শুনে রিনা যেন স্বস্তি বোধ করে। না দেখেও স্বাতী টের পায়, পিঠের নীচে দুটো কুশন গুঁজে রিনা সোফায় পা ছড়িয়ে বসল, অনেকক্ষণ গল্প করার ইচ্ছে নিয়ে।

রিনার এই একলা বোধ, অনেকক্ষণ আবোলতাবোল কথা বলে ওধুই সময় কাটানো, এ সবই স্বাতীকে একধরনের সান্ত্বনা দেয়। এই দেশে এতদিন অবধি স্বাতীর পরিচিত বৃত্তে স্বাতীই ছিল সবচেয়ে নতুন। সামাজিক গেট-টুগেদারে সে প্রায়ই শিকড়হীনতার কষ্টে ভুগত। এই যে অরুণা কেমন শম্পার শাশুড়িকে চেনে,

স্বাতী হাঁকুপাঁকু করে বলেছিল, "নাহ্, বয়স নয়, কোন সিম্পটমই ছিল না, হঠাৎই হল, তা ছাড়া কী-ই বা এমন বয়স, দাসদার চেয়ে সৌম্যকান্তি ছোট হবে, দাসদা তো এখনও কী সুন্দর খেলে!"

স্বাতীর কথায় মিসেস দাস পিছন ফিরে ব্রততীর দিকে তাকিয়েছিল, দু'জনের চোখেই ফুটে উঠেছিল অবিশ্বাস, বিরক্তি, হাসি।

ওদের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বাড়ি ফিরে স্বাতী বলেছিল, "নতুন জায়গায় এই এক জ্বালা, এঁরা কেউ আমাদের অতীতের সাক্ষী নন, এঁদের সঙ্গে স্মৃতি রোমন্থনও এক বিড়ম্বনা।"

সৌম্যকান্তি বলেছিল, "আসলে নাম ধরে

ডাকার মতো দু'-চারটে মানুষ প্রতিদিনের জীবনে বড় প্রয়োজন, তাতে কৈশোরে হাত ধরে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, একই বিন্দু থেকে ফেলে আসা দিনের প্রতি ফিরে তাকানো যায়।"

রিনার গলার চাপা কৌতূহলকে স্বাতী পাশ কাটিয়ে যায়, "সৌম্যকান্তির সঙ্গে আমার আলাপ জানো তো কলেজে, ও আমার চেয়ে দু'-বছরের সিনিয়র ছিল। আমাদের কলেজ-ক্রিকেট টিমে ও ছিল ক্যাপ্টেন, রান নেওয়ার সময় এত জোরে দৌড়ত! খুব হাঁটতে পারত জানো, মাইলের পর মাইল। মাঝে-মাঝে আমরা হাঁটতে হাঁটতে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে হাওড়া স্টেশন যেতাম। তবে আমি অত পারতাম না, ওই ওর পাল্লায় পড়ে জোর করে হাঁটতাম, রিজে উঠেই আমার হাঁফ ধরে যেত, ভয় ভয় চোখে দূরে গঙ্গার ও-পারে হাওড়া লেখা নিওন লাইটের বোর্ডের দিকে দেখতাম। ও কিন্তু আমার চোখ দেখে ঠিক বুঝে নিত। ওর পায়ে তো তখনও একশোটা হাওড়া ব্রিজ পার হওয়ার ক্ষমতা। সৌম্যকান্তি হেসে বলত, 'আর এইটুকু, জোরে হাঁটলে ম্যাক্সিমাম দশ মিনিট।' আমার যে তখন কী অবস্থা!

"সেই মানুষের এমন হয়ে গেল জানো, হঠাৎই, একটা অ্যাক্সিডেন্ট, সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল। তারপর স্পাইনাল কর্ড অপারেশন। সেই অপারেশনের পর থেকেই এমন, খুব ব্যথা বা কষ্ট নেই, তবে হাঁটার সময় আগের মতো পা পড়ে না, মনে হয় যেন পায়ের ব্যথায় খুঁড়িয়ে হাঁটছে।"

রিনা বলল, "অ্যাকসিডেন্ট হওয়া খুবই দুঃখের, তবে বয়সও হয়েছে, ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল নিশ্চয়ই।"

মনে মনে স্বাতী বিরক্ত হয়, উফ ঘুরেফিরে সেই এক কথা, বয়স! তারা যেন বুড়িয়ে গেল, ফুরিয়ে এল...

আসব।"

রিনার ফোন রেখে স্বাতী কিচেনে যায়, ওভেন অফ করে এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। সমুদ্রের হুহু হাওয়া উড়িয়ে নেয় স্বাতীর মনের ভার, বয়ে আনে অপূর্বা আর শুভ্রার স্মৃতি।

অপূর্বা হল সৌম্যকান্তির স্কুলের বন্ধু, খুব প্রাণখোলা মানুষ, হা-হা করে হাসে, জোরে জোরে কথা বলে, খেতে ও খাওয়াতে দুই-ই ভালবাসে। শুভ্রার সঙ্গে স্বাতীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে। অপূর্বা আর শুভ্রা একই পাড়ায় থাকত, ওদের সেই পনেরো বছর বয়স থেকে প্রেম। ইউনিভার্সিটিতে এসে অপূর্বা আর শুভ্রার প্রেম আরও রমরমিয়ে চলতে শুরু করে। অপূর্বার সঙ্গে শুভ্রা এদিক-সেদিক ঘুরতে যায়, মাঝে-মাঝে শুভ্রা স্বাতীর হাত ধরেও টানে।

শুভ্রা বলে, "চল না স্বাতী আমাদের সঙ্গে, আড্ডাটা জমবে।"

রোজ না হলেও এক-আধদিন স্বাতী গেছে, ধীরে-ধীরে অপূর্বার সঙ্গে তার পরিচয়ও গড়িয়ে গিয়েছে বন্ধুত্বে।

সেবার আর্যাকাডেমিতে নাটক দেখতে যাওয়ার কথা, স্বাতী ছিল শুভ্রার সঙ্গে আর সৌম্যকান্তি এসেছিল অপূর্বার সঙ্গী হয়ে।

অপূর্বা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, "আমার বন্ধু সৌম্যকান্তি, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, হায়ার সেকেন্ডারিতে বোর্ডে থার্ড। আমার রবু বউ শুভ্রাকে তো চিনিস। ও হল স্বাতী, শুভ্রার প্রাণের বন্ধু।

"আর হ্যাঁ সৌম্য, স্বাতী কিন্তু এখনও একা, যতদূর জানি ফাঁকা মাঠ, ধারেকাছে কেউ নেই, ছক্কা মারার চেষ্টা করে দেখতে পারিস।"

অপূর্বা ওরকমই, ঠাট্টার ছলেই কথাটা বলেছিল, তবে সেটাই সত্যি হয়ে গেল।

কালো ফ্রেমের চশমার ও-পার থেকে সৌম্যকান্তি কি স্বাতীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল?

স্বাতীর কনুইয়ে চিমটি কাটে শুভ্রা, নিচু গলায় বলে, "মনে হচ্ছে প্রথম দর্শনেই সৌম্যদা তোর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে, কীরকম দেখছে দ্যাখ!"

স্বাতী ফিসফিস করে বলেছিল, "তোর মতো ফরসা সুন্দরী তো নই, কী দেখে প্রেমে পড়বে?"

শুভ্রা বলেছিল, "নিজের গড়নটা আয়নায় দেখেছিস? আজকাল গায়ের রঙের চেয়ে ফিগারের কদর বেশি।"

এরপর সৌম্যকান্তির সঙ্গে একবার এলিটে দেখা হয়েছিল, আর-একবার নন্দনে।

সেটা বোধ হয় জানুয়ারি মাস। অপূর্বার হঠাৎ মাথায় চাপল ডে-আউটে যাবে। যথারীতি শুভ্রা পাকড়াল স্বাতীকে আর অপূর্বা সৌম্যকান্তিকে।

তারা গিয়েছিল ব্যান্ডেল চার্চ। সারা দিন চার্চে কাটিয়ে বিকেলে হাওড়া লোকালে ফিরছিল। ট্রেন চলছিল ভালই। তবে বেলুড় স্টেশন যাওয়ার পরই শুরু হল গন্ডগোল। শোনা গেল, সামনে মালগাড়ির বগি উলটে পড়েছে। লিলুয়া স্টেশনের লেভেল ক্রসিংয়ের কাছাকাছি ট্রেন ঘ্যাচাং করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আধঘন্টা কেটে গেল, ট্রেন আর নড়তেই চায় না। এদিকে শীতের বেলা, অন্ধকার হয়ে আসছে।

শুভ্রার উদ্বেগ দেখে অপূর্বা বলল, "চল এখানেই নেমে পড়ি, লেভেল ক্রসিং পার হয়ে বাস-স্ট্যান্ড চলে যাব।"

প্রথমে সৌম্যকান্তি নেমেছিল, তারপর অপূর্বা। স্বাতীর পরনে ছিল চুড়িদার কিন্তু শুভ্রা একটা হলুদ সিল্কের শাড়ি পরে এসেছিল। তবু অপূর্বা কসরত করে শাড়ি পরিহিতা নিজের প্রেমিকাকে ঠিক ট্রেন থেকে নামিয়ে নেয়। শুভ্রার পিছনে ছিল স্বাতী। শুভ্রা নামতেই ট্রেনটা হঠাৎ নড়ে ওঠে, দুলকি চালে গড়াতে শুরু করে লিলুয়ার দিকে।

স্বাতীর তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। অপূর্বাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

সৌম্যকান্তি চেঁচিয়ে উঠেছিল, জাম্প, কুইক।

সৌম্যকান্তির বয়ে কিছু একটা ছিল, স্বাতী দ্বিতীয়বার ভাবেনি, চলন্ত ট্রেন থেকে এক লাফ দেয়, সৌম্যকান্তি শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলে স্বাতীর হাত...

ধীরে-ধীরে স্বাতী আর সৌম্যকান্তির মধ্যেও সম্পর্ক দানা বাঁধে।

সত্যি, কতদিন হয়ে গেল শুভ্রা আর অপূর্বার সঙ্গে দেখা হয় না। অপূর্বা মানুষটা এত পঙ্গিতিষ!

গতবছর পা নিয়ে সৌম্যকান্তির হা-হুতাশ দেখে বলেছিল, ছাড় তো সৌম্য, তোর পায়ে এমন কিছুই হয়নি, ওরকম-একটু আধটু সমস্যা

দেয়, সৌম্যকান্তি শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলে স্বাতীর হাত।

স্বাতীর গলায় ভার, "হ্যাঁ পুরনো বাড়ির কার্নিসে দেওয়ালের ফাঁকে যেমন আগাছা জন্মায়, বয়সের সঙ্গে স্বাস্থ্যে তেমন ফাটল ধরে, অসুখবিসুখ শুরু হয়। যাক গে ছাড়ো ওসব, অতনু কবে ফিরবে? একটা সিনেমা দেখো, সময় কেটে যাবে।"

রিনা বলল, "হ্যাঁ সময়, সময় কাটানোই এখন এক বিরাট সমস্যা। সামনের বৃহস্পতিবার খালি আছ? লাঞ্চে আসবে? বেশি কিছু না, আমার ঠাকুরমার রেসিপি, লেবুপাতা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধব, সঙ্গে বেগুনি আর চাটনি। ব্রততী, শম্পা, অরুণা সবাই আসবে।"

স্বাতী এক মুহূর্ত ভেবে বলে, "ঠিক আছে,

অনেকেরই থাকে, তা নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলে না। তা ছাড়া, তোর কতই-বা বয়স, জীবনের অনেকটা এখনও বাকি আছে, স্বাতীর কথাও তো ভাবতে হবে, ছেলে আছে তোর, ছেলের বিয়ে দিবি না? তুই শালা হেভি খরুশ শ্বশুর হবি, তা আমি এখনই বলে দিলাম।

অপূর্বার কথার ধরনে ওরা সবাই জোরে হেসে উঠেছিল। এক মুহূর্তে সৌম্যকান্তির বয়স যেন দশ বছর ঝরে পড়েছিল।

সৌম্যকান্তি ঝলমলে মুখে বলেছিল, "আর এক পেগ নিবি তো?"

অপূর্বা বলেছিল, "আগে শুভ্রা আর স্বাতীর গ্লাস ভরে দিই, ভদকা সঙ্গে কমলালেবুর রস।

শুভ্রা আউট হলে নিশ্চিন্তি, তারপর আমি নিট নেব, অন দ্য রকস...”

ড্রয়িংরুম ভরে উঠেছিল হাসি, গান, জোকস আর স্মৃতিচারণে। কফি হাউসের গল্প করতে করতে তারা যেন কলেজ ষ্টিট দিয়েই হাঁটছিল। ওই যে প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্কুল... পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও স্বাতীর মন ছেয়ে ছিল এক অদ্ভুত ভাললাগায়।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যেই স্বাতী পৌঁছে গেল রিনার বাড়ি। স্বাতী পৌঁছে দেখে, অরুণা আর শম্পা ইতিমধ্যে এসে গেছে, মিসেস দাস আর ব্রততী তখনও আসেনি। একে একে ওরাও এসে যায়, আড্ডা জমে ওঠে, শুরু হয় কাচের প্লেট আর চামচের ঠুনঠান শব্দ...

অরুণা বলল, “কী দারুণ রেঁধেছ রিনা, লেবুপাতা দিয়ে খিচুড়ি এই প্রথম খেলাম।”

ব্রততী জিজ্ঞেস করে, “রিনা, তোমাদের বাড়ি কি বর্ধমানে? আমার এক মামিমা আছে, বর্ধমানের মেয়ে, ঠিক এইরকম লেবুপাতা দিয়ে খিচুড়ি করত।”

অরুণা বলল, “আমার ছোটকাকিমা তো বর্ধমানের, ছোটকাকিমাকে কোনওদিন এরকম খিচুড়ি রাঁধতে দেখিনি।”

শম্পা হেসে ফেলে, “আরে, অত জায়গা ধরে সব হয় নাকি? এ যেন বর্ধমানের মিহিদানা! এখন রিনা আমাদের রেসিপি দেবে, আমরা সবাই রিনার ঠাকুরমার মতো খিচুড়ি রাঁধব।”

আড্ডা চলতে থাকে, ঘুরে যায় আলোচনার প্রসঙ্গ।

ব্রততী জিজ্ঞস করে স্বাতীকে, “তোমার শাড়িটা বেশ, জর্জেট? কোথা থেকে নিয়েছ?”

স্বাতী উত্তর দেয়, “দিল্লি থেকে, মীনাবাজার।”

অরুণা ভুরু তুলে, “এই দোকানগুলো নতুন হয়েছে, না? আগে ছিল না।”

শপ, শো-পিসের দোকান, ওখানে কাটলারি পাবে না।।”

শম্পার মনে পড়ে যায়, গতবছর হরাইজনের সেল থেকে অরুণা দুটো বুদ্ধ নিয়েছিল।

মিসেস দাস বলে, “অরুণাদের বাড়ি যা সুন্দর!”

বন্ধুদের প্রশস্তিতে গদগদ হাসে অরুণা।

রিনা বলল, “তোমাদের প্রত্যেকের বাড়িই সুন্দর।”

শম্পা হেসে ওঠে, “হ্যাঁ, ড্রয়িংরুম টু টয়লেট, প্রত্যেকেই রুজ-পাউডার মেখে ফিটফাট।”

শম্পার কথায় এবার একসঙ্গে সবাই জোরে হেসে ওঠে।

আজকাল এইভাবেই স্বাতীর দিন কেটে যায়। সৌম্যকান্তি ডলার উপার্জন করে, দেশ থেকে স্বাতী হাত খুলে শাড়ি আর গয়না কিনে আনে, আর এই পরবাসে সেই শাড়ি-গয়নার গতি করার জন্য আজ যদি লেবুপাতার খিচুড়ির নেমন্তন্নে যায় তো, কাল রাজমা-চাউলের আমন্ত্রণ থাকে, পরশু চা ও ফুচকা।

তবে সত্যি-সত্যি নিমন্ত্রণও থাকে বই কী। অরুণা নিমন্ত্রণ করলে তিন রকমের মাছ, দু’-রকমের মাংস, চার রকমের মিষ্টির কম খাওয়ায় না। এলাহি আয়োজন করে সে! অরণাদের বাড়িতে একতলা-দোতলা-তিনতলা, খোলা ছাদ, সাজানো বাগান। অরুণার সঙ্গে অরুণার শাশুড়ির কথা বন্ধ, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির বিশালতার প্রসঙ্গ উঠলেই অরুণার মুখ আহ্লাদে গলে যায়। অরুণাদের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে একদিন শম্পা বলেছিল, “জানো, আমাদেরও আছে, এর চেয়েও বড় বাড়ি, সল্টলেকে সাত কাঠা জমির ওপর। আমাদের বাগানে চারটে নারকেল গাছ আছে, হিমসাগর আম হয়। সব ছেড়ে চলে এলাম সিঙ্গাপুরে। অরুণাদের বাড়ি তো অনেক আগের, এখন যা দাম! তা ছাড়া এক জেনারেশনে কত আর হয় বলো তো?”

অরুণা ফুট কাটল, “আমার শাশুড়ি আগে যা মোটা ছিল, হাঁটতে-চলতে কষ্ট হত। আমি জোর করে জিমে পাঠিয়ে আট কেজি ওজন কমিয়েছি, এখন পাখির মত ঘুরেফিরে বেড়ায়। তবু ওই জোর করেছিলাম বলে আমার ওপর এখনও রাগ, ছুতোনাতায় খুঁত ধরে।”

স্বাতীর গলায় বিষাদ, “জিমে গিয়ে দেখেছি, কিছু হয় না, আমার থাইরয়েডের দোষ তো।”

স্বাতীর কথাকে পাত্তা না দিয়ে মিসেস দাস যেন অরুণার সঙ্গেই কথা বলছেন, “আমার মেয়ের শাশুড়িও ওইরকম, কিছুতেই ব্যায়াম করবে না, খাওয়াদাওয়া কন্ট্রোল করবে না, সারা দিন শুধু স্বাস্থ্যের অজুহাত...”

স্বাতী মৃদু গলায় আবার বলার চেষ্টা করে, “থাইরয়েড হলে কী যে জ্বালা! এই আমিই কলেজ-জীবনে বেতের মত হিলহিলে ছিলাম, আমার দু’-কেজি ওজন বাড়লে মা আনন্দে গলে যেত।”

মালপোয়ার শেষ টুকরোটা মুখে পুরে ব্রততী বলল, “স্বাতী তোমার কলেজ-জীবনের একটা ছবি দেখাও না।”

স্বাতী বলল, “দেখাব, তবে সে ছবি তো পুরনো ঝাড়বাঝম মেজে, এখানে নেই, সামনের বার দেশ থেকে নিয়ে আসব।”

সত্যি, স্বাতীর ছিপছিপে চেহারার ছবি, শম্পাদের তিনতলা বাড়ি, সৌম্যকান্তির জোরালো পায়ের ইতিহাস, সবই ওই ছেড়ে আসা দেশে পড়ে আছে।

তা হলে এই পরবাসে কী আছে?

এখানে আছে দূষণমুক্ত বাতাস, বিশুদ্ধ জল আর অফুরন্ত রোজগারের সুযোগ।

রিনার বাড়ি থেকে ফিরে আজ দুপুরে তোলা ছবিগুলো স্বাতী মোবাইলে মন দিয়ে দেখছিল। সেইসময়ই ফোন এল সৌম্যকান্তির, “একটা

১০ স্বাতী মৃদু গলায় বলে, “থাইরয়েড হলে কী যে জ্বালা! এই

রিনা মাথা নাড়ে, “না না, মিনাবাজার বহু পুরনো, অনেকদিন হল তোমরা দেশ থেকে চলে এসেছ তাই জানো না।”

এই দেশে, অরুণারা সেকেন্ড জেনারেশন, মিসেস দাস আর ব্রততীদের ছাব্বিশ বছর হয়ে গেল। এই শহর সম্পর্কে মিসেস দাস, ব্রততী আর অরুণা বেশি অবহিত।

মিসেস দাসের দিকে তাকিয়ে অরুণা বলল, “হরাইজনে সেল দিচ্ছে, কেউ যাবে নাকি?”

এইবার রিনার অজ্ঞতা, “হরাইজন কিসের দোকান? আমাকে কিছু কাটলারি কিনতে হবে।”

ব্রততী ব্যাখ্যা করে, “হরাইজন হল গিফট

খিচুড়ি-বেগুনি-চাটনি খাওয়ার পর রিনা বলল, সুইট ডিশ নাও, আজ মালপোয়া আর মিষ্টি দই করেছি।

রিনাদের ডাইনিং স্পেস আর ড্রয়িংরুমের মাঝখানে দু’-ধাপ সিঁড়ির উঁচুনিচু। ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে মালপোয়া আনতে গিয়েই ম্যাসাকারটা বাধল, সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল স্বাতী। সঙ্গে-সঙ্গে হইহই। তবে সিঁড়ির পাশের দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাতী ধীরে ধীরে এসে সোফায় বসল, স্বাতী বুঝছিল তার হাঁটু আবার লক হয়ে যাচ্ছে।

সুখবর আছে। অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি।”

“রিয়েলি? কী গিফট দেবে, গয়না না শাড়ি?”

“টাকা নয়, জোধপুর উমেদ প্যালেসে চার-দিন তিন রাতের প্যাকেজ, সঙ্গে বছর শেষের পার্টি।”

“ধুর, বছর শেষের পার্টি তো এখানেও আছে।”

“বছর শেষের পার্টি ছাড়াও ছোট্ট করে রাজস্থান ঘুরে নিতে পারি। ধরো, জয়সলমীর, জোধপুর আর জয়পুর।”

স্বাতী এইবার নড়ে বসে, তার গলায় উত্তেজনা, “আর ইউ সিরিয়াস?”

সৌম্যকান্তি বলে, "ইয়েস। তবে ট্যুর প্ল্যান তুমিই করো, আমার একদম সময় নেই।"

আগামী সাতদিন স্বাতীর আর অলস সময় বলে কিছু থাকে না। রিনা ফোন করে শোনে, স্বাতী বাড়িতে নেই, মার্কেটে। স্বাতী ফোনে জানায় শপ্পাকে, তারা দশ দিনের ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছে। মিসেস দাসের ইডলি ধোসা খাওয়ার নিমন্ত্রণে সে চোখ বুজে 'না' বলে দেয়।

ট্যুর প্ল্যানে স্বাতী একজোড়া রেলের টিকিট কেটেছে, জয়সলমীর থেকে জোধপুর যাওয়ার। জয়সলমীর থেকে জোধপুর অনেকটা পথ, অতটা পথ বাপু গাড়ির চেয়ে ট্রেনই ভাল। কারণ, প্রথমত, স্বাতীর নাক ভীষণ সুড়সুড়ে, ভাল গাড়িতেও ধুলোর গন্ধ লাগে। দ্বিতীয়ত, অতক্ষণ পা গুটিয়ে বসে থাকা খুব কষ্ট। তৃতীয়ত, হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় পেল্লাই ট্রাকগুলো পাশ দিয়ে গেলে ভয়ে স্বাতীর গা শিরশির করে। চতুর্থত, আসলে স্বাতীর খুব ইচ্ছে করছে ট্রেনে চড়তে, সেই ছোটবেলার মতো।

ছোটবেলায় ট্রেনে উঠলে স্বাতীর জানালার পাশের সিট চাই-ই চাই। চলন্ত ট্রেনের বাইরে ছুটে চলা ধূধূ প্রান্তর দেখে স্বাতীর যেন আশ মিটত না। ওই যে মাইলের পর মাইল সবুজ ধানখেত, দূরে লাঙল কাঁধে চাষি, মেয়েরা ধান বুনতে ব্যস্ত, জলের ডোবা, ডোবার পাশে খানকয়েক ঝুপসি আমগাছ, আমগাছের পিছনটা ঠিক দেখা হল না, বেরিয়ে গেল হুস করে ট্রেন। যা অদেখা রয়ে গেল তা নিয়ে শুরু হয়ে যেত স্বাতীর কল্পনার আকাশে গল্পের বুনন। আনমনে পাতার পর পাতা গল্পের বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে স্বাতীর চোখ বুজে আসত ঘুমে।

পাশ থেকে দিদি ঠ্যালা দিত, "অ্যাই, ঘুমোচ্ছিস যে।"

স্বাতী আবার সোজা হয়ে বসে জানালার বাইরে চোখ রাখত। ওই যে একপাল ছাগল, তিনটে গরু, একটা বাছুর। ওমা, গরুগুলোর পাশে ছোট্ট লাঠি হাতে রাখাল ছেলে! দিদি যেন কী একটা গান গায়, দূরদেশি সেই রাখাল ছেলে...

জয়সলমীর থেকে ফেরার আগের দিন সৌম্যকান্তি হোটেল রিসেপশনে জোধপুর যাওয়ার গাড়ির বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছিল।

স্বাতী বলল, "এই চলে এসো, গাড়ির দরকার নেই, আগামিকাল ভোরে আমাদের ট্রেনের টিকিট আছে।"

সৌম্যকান্তি আকাশ থেকে পড়ে, "তোমার কি মাথা খারাপ? ট্রেনের টিকিট!"

তবে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলল যে, এখান থেকে অনেকেই ট্রেনে জোধপুর যায়, বিশেষত বিদেশিরা। আগামিকাল সকালেও দুটো ফ্যামিলি যাবে। হোটেলের গাড়িই তাদের স্টেশনে ড্রপ করে দেবে।

আমিই কলেজ-জীবনে বেতের মত হিলহিলে ছিলাম..."

সুটকেস গোছানোই ছিল। ভোরবেলা দুটো সুটকেস নিয়ে স্বাতী ও সৌম্যকান্তি যখন বাইরে পোর্টিকোতে এসে দাঁড়ায়, তখনও আলো ফোটেনি, চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটা জমাট ঠান্ডা স্বাতীকে জড়িয়ে ধরে। এই ঠান্ডার ধরনটা খুব আলাদা, স্বাতীর খুব চেনা, বাল্যবন্ধুর মতো। জিপ অপেক্ষা করছিল, দু'-মিনিটের মধ্যে ড্রাইভারও এসে যায়, তার গায়ে ওভারকোট নয়, ভারী কম্বল জড়ানো, কান-মাথা-গলায় একটা ধূসর রঙের খরখরে মাফলার পেঁচিয়ে রেখেছে।

স্টেশনে এত ভোরেও বেশ ভিড়। স্বাতীর কানে আসে পরিচিত ডাক, "কুলি, কুলি চাই বাবু..."

স্বাতী ঘুরে দেখে, নিজের ঝকঝকে সুটকেস আর কুলির অপরিচ্ছন্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবে, তারপর নিজেরাই চাকা-লাগানো সুটকেস ঠেলে স্টেশনে ঢোকে, নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়।

সৌম্যকান্তি বলল, "ট্রেনের এখনও আধঘণ্টা বাকি, চলো ওয়েটিং রুমে যাই, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে।"

স্বাতী ও সৌম্যকান্তি উচ্চশ্রেণির বিশ্রামাগারে ঢুকে দেখে, বিশ্রামাগারের দেওয়ালের পাশ দিয়ে পরপর চেয়ার, অনেক চেয়ার এখনও খালি, তা সত্ত্বেও বিশ্রামাগারের মেঝেয় অনেকেই হোল্ডল খুলে শুয়ে পড়েছে। দু'জন বিদেশি পুরুষ এবং একজন সাহেব ও মেম নিজেদের লাগেজ নিয়ে ওয়েটিং রুমের একপাশে দাঁড়িয়ে।

অবলোকন করে, কিন্তু মিশে যেতে পারে না। এই একাত্ম না হওয়ার অভাব স্বাতী প্রতিনিয়ত টের পায় পরবাসে।

আজ খুব ভোরে উঠতে হয়েছে, সেই সঙ্গে ট্রেনের দুলুনি, কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাতী ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতে সৌম্যকান্তি বলল, "মেয়ে এনেছি প্রায়, আর সোয়া ঘণ্টার পথ।"

তবে কপালে সুখ সইলে তো! অল্প এগিয়েই ট্রেন গেল ব্যাঁয়াক থেকে থেমে। থামল তো থামলই, সে ট্রেন আর নড়ে না, পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে তারপর চলতে শুরু করল।

ট্রেন ছাড়তেই সৌম্যকান্তির গলায় খুশি, "এতক্ষণ থেমে ছিল তো, তাই এখন জোর ছুটছে, মনে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ আধ-ঘণ্টায় ট্রেনে দেবে।"

ও হরি, মিনিট পঁচিশ চলার পরই ট্রেন আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, এবার একটা ছোট স্টেশনে।

স্বাতীদের কামরার সহকারী ছেলেটি বেডসিট গোছাতে গোছাতে বলল, "উফ, আর মাত্র দশ মিনিটেই পৌঁছে যেত!"

স্বাতী জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, ছোট্ট স্টেশনটা দুপুর বারোটার সময়ও শুনশান, একদম ফাঁকা। দূরে একটা গাছের নীচে গোল করে বাঁধানো বেদিতে এক দেহাতি পুরুষ বসে, সঙ্গে তার আহাতার ঘোমটা টানা বউ আর দুটো বাচ্চা মেয়ে। বউয়ের কাঁখে বছর দেড়েকের শিশুপুত্র। বাচ্চা মেয়ে দুটো নিশ্চয়ই পিঠোপিঠি বোন। দু'জনের পরনেই রাজস্থানি ঘাগরা, হলুদ আর নীল, ঘাগরার ঘেরে সস্তা জরির সুতোর দিকে এগোয়।

ঢাউস সুটকেসটা নিয়ে সৌম্যকান্তি নেমে পড়েছে স্টেশনে। এখন দরজার সামনে নীল সুটকেস-সহ স্বাতী।

ট্রেন হঠাৎ নড়ে ওঠে।

সৌম্যকান্তি দ্রুত নীল সুটকেসটা টেনে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে নেয়।

ট্রেন গড়িয়ে যাচ্ছে জোধপুরের দিকে। স্বাতী তখনও ট্রেনে।

সৌম্যকান্তি বলে ওঠে, "স্বাতী কুইক..."

স্বাতী আর ভাবে না, সে এক লাফ দেয়, সৌম্যকান্তি ধরে নেয় স্বাতীর হাত।

পুরো ঘটনাটি ঘটে যায় চোখের নিমেষে, অপ্রত্যাশিতভাবে।

সৌম্যকান্তি জিজ্ঞেস করে, "লাগেনি তো?"

স্বাতী তার কালো জিনস পরা পা দুটোর দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে ওঠে, "ব্যাথা ভ্যানিশ, হাঁটুর লক খুলে গেছে।"

স্বাতীর হাসিতে হলুদ ঘাগরা পরা মেয়েটি ফিরে তাকায়, মেয়েটির বোধ হয় কৌতূহল হয়, সে ছুটে আসতে যায় স্বাতীদের দিকে।

বোন ছুটে যাচ্ছে দেখে নীল ঘাগরা পরা মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে, "এহ ফুলকুমারী, ইধার আ..."

ফুলকুমারীর কচি মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতীর মনে পড়ে দিদির ডাক, "এই স্বাতী, ছাদে-এ-এ..."

স্বাতীর হাসি সংক্রামিত হয় সৌম্যকান্তির মধ্যেও, "জাম্পটা যা দিলে না, একেবারে সেই

১০ স্বাতী ও সৌম্যকান্তি দু'জনেই হেঁটে যায় ঋজু পদক্ষেপে।

সৌম্যকান্তি এবং স্বাতীও দুটো ঢাউস সুটকেস-সহ বিদেশিদের সামান্য তফাতে দাঁড়ায়, চেয়ারে বসে না।

অবশেষে ট্রেন আসে, স্বাতী ও সৌম্যকান্তি ট্রেনে ওঠে, সময়মতো ট্রেন ছেড়েও গেল।

নাহ, আজ আর বালিকা স্বাতী নয়, জীবন অপরাহ্ণের পৃথুলা স্বাতী মন দিয়ে জানালার বাইরে প্রকৃতি দেখছিল।

রাজস্থানের প্রকৃতি রুখুসখু, বাংলার মতো শস্যশ্যামলা নয়। দু'-দিকে ধুধু রুক্ষ মাটি, মাঝে-মাঝে সারিবদ্ধ নয়, একাকিনী একটা গাছ সটান দাঁড়িয়ে। ওই যে, রেললাইনের একটু দূরে দুটো উট। মাঠের মাঝখানে ময়ূরও দেখা যাবে নাকি? স্বাতী জানালার কাচে নাক ঠেসে আশপাশে উঁকিঝুঁকি দেয়।

স্বাতী ভাবছিল। ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে সে ক্যাল-ট্রেনে চড়ে, ইউরোপে ইউ-রেল, প্রকৃতি সেখানে মারকাটারি সুন্দর, তবু কী যেন নেই, কোথাও যেন ফাঁক থাকে। সেই সৌন্দর্য স্বাতী ফুলের নকশা। আরও দূরে বালির ঢিবির ওপর পেট চিতিয়ে একটা নেড়িকুত্তা শুয়ে, শীতের নরম রোদ্দুরে ঘুমোচ্ছে। দশ মিনিট পেরিয়ে কুড়ি মিনিট হতে চলল, ট্রেন আর নড়েই না।

স্বাতী উসখুস করে, "কী জ্বালা, দশ মিনিটের রাস্তা যেতে এখন চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে?"

স্বাতীর কথা শুনে সৌম্যকান্তিও যেন কিছু ভাবে, সে উঠে দাঁড়ায়, "চলো, এখানেই নেমে পড়ি, এখান থেকে ট্যাক্সিতে বাকি রাস্তা চলে যাব।"

কথাটা বলে সৌম্যকান্তি আর দাঁড়ায় না, স্টিল-রঙের সুটকেসটা টেনে এয়ারকন্ডিশন কামরার দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

স্বাতী বলার চেষ্টা করে, "আরে, নামতে গিয়ে যদি ট্রেন ছেড়ে দেয়!"

স্বাতীর কথা সৌম্যকান্তি বোধ হয় শুনতেও পায় না। স্বাতীও আর দেরি করে না, নিজের হাতব্যাগ আর নীল সুটকেসটা নিয়ে দরজার দিকে এগোয়।

ইউনিভার্সিটির স্বাতী, জাস্ট বাইশ।"

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত....

স্মৃতির ঝলকানিতে দু'জনেরই মুখ এখন আলোকিত।

এই মুহূর্তে স্বাতীর পায়ের কষ্ট উধাও। সৌম্যকান্তির কোমরের ব্যাথাই-বা কোথায়!

স্বাতী ও সৌম্যকান্তি দু'জনেই হেঁটে যায় ঋজু পদক্ষেপে, ফুলকুমারীকে পিছনে রেখে, অলস নেড়িকুকুরের পাশ কাটিয়ে, ঢাউস সুটকেস দুটো টেনে, ছোট্ট নিরিবিলি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে।

আসলে উড়ে যায় এক পরিযায়ী পাখি, হেমন্তের ঝরা পাতার বিকেল থেকে ঝলমলে রোদমাখা শরতের আকাশে, যৌবন থেকে কৈশোর, কৈশোর পেরিয়ে শৈশবের সবুজ ধানখেতে...

অঙ্কন: শুভম দে সরকার

YOUR WELLBEING IS OUR PROMISE.

Introducing special privileges for Senior Citizens.

*T&C apply. Please carry your ID Proof to avail this offer

50%* discount on consultation across specialities.

Applicable only for Senior Citizens (60 years & above).

To book an appointment, Call **7603035244**
730, EM Bypass Road, Anandapur, Kolkata - 700 107

Fortis

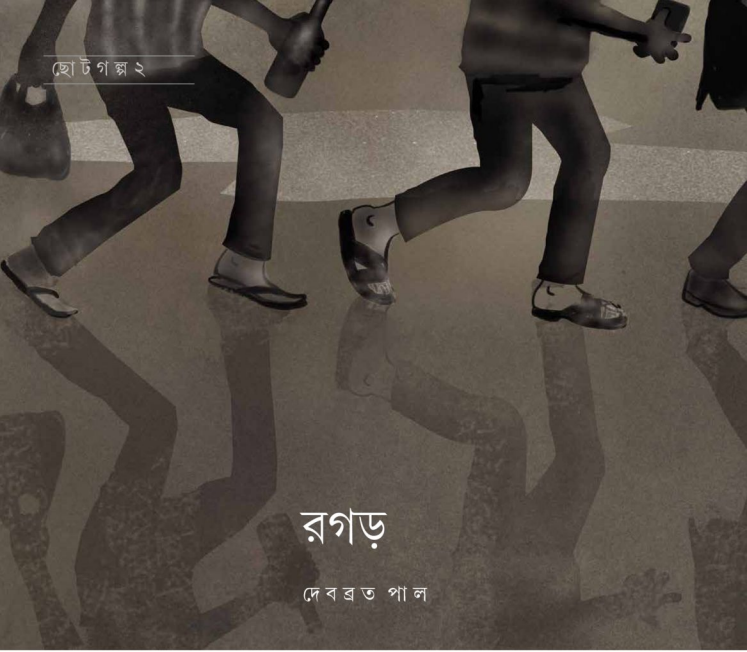

রগড়

দেবব্রত পাল

রাত ন'টা নাগাদ বৃষ্টি নামল। শ্রাবণের বৃষ্টি, বেশ মুষলধারেই নামল। ঘণ্টাখানেক পর কমে এল একটু, কিন্তু হঠাৎই কারেন্ট চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ওরা চারজন গুটিগুটি পায়ে বাজারের শেষ মোড়ের দিকটায় রওনা দিল। ওদের একজনের এক হাতে একটা বড় বোতল আর অন্য হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটে বাজারেরই ঘুরুময়রার বানানো মাটন কষা। দিলীপের হাতে প্লাস্টিকের কাপ। আর পেলুর হাত ফাঁকা। তবে ওর বুকপকেটে আছে মারাত্মক জিনিস। বেগুনখেতের পোকা মারার কীটনাশক। মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে ডুগডুগিকে খাওয়ানো হবে। খেয়ে ডুগডুগি মরলে তারপর হবে রগড়।

এখন প্রায় মধ্যরাত। হালকা হাওয়া দিচ্ছে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিশুতি। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। বৃষ্টি কমে এলেও ঠান্ডা হাওয়ায় বাজারের মেয়ো কুত্তাগুলোও যেন এখানে-ওখানে আশ্রয় খুঁজে নিয়ে নিরুপদ্রবে ঘুম দিতে চাইছে।

ওরা চারজন চলেছে মনাপাগলির আস্তানায়। বাজার থেকে বেশ খানিকটা দূরে, পাকা রাস্তাটা যেখানে খালের উপরের পঞ্চায়েত নির্মিত পাকা ব্রিজটা পেরিয়েছে, সেখানে উঁচু পাকা রাস্তার ঢালের গায়ে জেলাপরিষদ কতগুলো সিমেন্টের পাইপ ফেলে রেখেছে বহুকাল ধরে। সেই পাইপ আর রাস্তার ঢালকে দেওয়াল করে মনাপাগলি তার আস্তানা বানিয়েছে। কালো প্লাস্টিকের ছাউনি, ভাঙা ঝাঁপের বেড়া দিয়ে দেওয়াল, তাতে জড়িয়ে দিয়েছে বাজারের ফেলে দেওয়া সিমেন্টের প্যাকেট, নীচে পেতে নিয়েছে ব্রিজ তৈরির সময়কার কিছু জমে যাওয়া সিমেন্টের বস্তা, তার উপর পাটের ফেঁসো আর প্লাস্টিকের ক্যাচরার গদি। হাতের কাছে পাওয়া

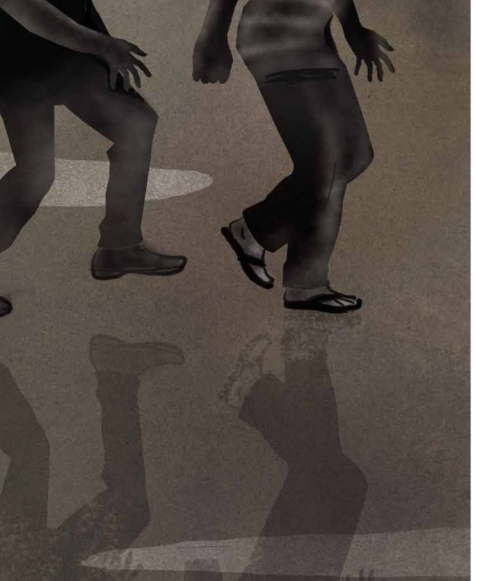

ব্যবহার্য বস্তুগুলো মনা বেশ ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছে।

মনাপাগলির বয়স কত তা বলা যায় না। একটু খাটো আড়ার চেহারা। ধবধবে ফরসা গায়ের রং। মুখটা গোল, চোখ দুটো কটা। মাথার চুলগুলো বেশির ভাগ সময়েই রুক্ষ, পিঙ্গল হয়ে থাকে। তবে মাঝে-মাঝে সেই চুলে তেলের ছোঁয়া, এমনকী কলপ করতেও দেখা যায়। মনাপাগলি বেশির ভাগ সময়েই শাড়ি পরে। ব্লাউজও থাকে। কিন্তু তাতে তার স্তন দু'টির বিশালতা ঢাকা পড়ে না। মনা যখন হাঁটে, মনে হয় ওর বক্ষসৌন্দর্য সর্বাগ্রে চলেছে পথ দেখাতে-দেখাতে। মনার আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, তা হল ওর গলার আওয়াজ। যাকে বলে পুরুষালি গলা, ওর আওয়াজ তা-ই। মোটা কিন্তু মধুর, তাই বলে হিজড়েদের মতো নয়। বরং ওর গলা শুনলে অদ্ভুত মাদকতায় আক্রান্ত হতে হয়।

মনার কাজ হল সকালে উঠেই ভিক্ষে করতে বেরনো। কিন্তু ওর ভিক্ষে আর-সকলের মতো একমুঠো চাল আর দুটো আলু পাওয়া নয়। ও গেরস্থ বাড়িতে গিয়ে আবদার করে বলবে, "এই কাল্টুর মা, আমি আজ তোদের বাড়িতে দু'মুঠো খাব।" এই আবদারে সকলেই যে খুব খুশি হয় তা নয়। কেউ হয়তো বলেও ওঠে, "ভারী আমার চোদ্দোপুরুষের কে এলেন! ওঁকে পা ধোওয়ার জল দিয়ে আপ্যায়ন করে খেতে দিতে হবে!" মনা যে তাতে খুব রেগে যায় তা নয়। অনেকটা মুখরা ননদের মতোই বলে ওঠে, "কী দিনকালই এল রে! তোর মায়ের বাড়ির কুত্তাটা এলেও কত যত্নআত্তি করিস, আমি কি কুত্তারও অধম?" গেরস্থ ভেবে পায় না মনা কাকে কুত্তা বলল, মায়ের বাড়ি থেকে যে এসেছিল তাকেই? কিন্তু পাগলের কথায় রাগ করা চলে না! আরও দু'-চার কথা শুনিয়ে শেষপর্যন্ত দুপুরের খাবারটা উঠোনের পেয়ারাতলায় পাত পেড়ে বসিয়েই দেয়। আসলে মনা এমনই। ওর কথায় এমন এক আত্মীয়তার টান আছে যে, ওর উপর রাগ করা যায় না।

মনা কবে এই বাজারে এসে আস্তানা গেড়েছে কেউ জানে না। শোনা যায় সে এলাকারই এক গেরস্থ চাষির মেয়ে। বিয়েও হয়েছিল সময়মতো, কিন্তু মেয়ের কপাল, বিয়ের মাসখানেকের মধ্যে স্বামী ওকে পরিত্যাগ করে। ও পাগল বলে ছাড়ান দেয়, নাকি পরিত্যাগ করার পর ও পাগল হয়ে যায় তা বলা যায় না। আসলে মনাকে পাগলি বলা কতটা সমীচীন তা নিয়ে উচ্চমানের গবেষণা হয়ে যেতে পারে। আপনমনে থাকে, ভিক্ষা করে। দিনান্তে রান্না করে। একই পাতে নিজেও খায়, ডুগডুগিকেও খাওয়ায়।

কোনওদিন নিজে থেকে যেচে কারও সঙ্গে ওকে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট করতে দেখা যায়নি, উন্মাদিনীর মতো আচরণও করতে দেখা যায়নি। বরং ওর ব্যবহারটাই ভারী মিষ্টি। রান্না করতে-করতে হয়তো কোনওদিন খানিকটা লবণ বা হলুদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল— মনা কাছাকাছি কোনও মুদি-দোকানে গিয়ে হাসিমুখে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর একসময় বলবে, "ও মন্টে, হলুদ-আবাদে রান্না হচ্চে না, এট্টু হলুদ দিবি?" দোকানদাররা ওকে ভালবাসে। দু'-চারটে খিস্তি হয়তো মারে, সেই সঙ্গে দিয়েও দেয় কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি। ও হাসিমুখেই বিদায় নেয়। ওকে রাগতে খুব কমই দেখা গেছে। কেবল এক-একদিন সকালে হঠাৎ ওর মাথা বিগড়ে যায়। শুরু করে দেয় চিল-চিৎকার। সেই চিৎকারে যতটা না অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, তার চেয়ে বেশি থাকে অশ্লীল ইঙ্গিত। ওর চেঁচানির ভঙ্গিটা বড় অদ্ভুত। জনাকীর্ণ বাজারের মধ্যে পরনের কাপড় পেঁচিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে কোনও এক অদৃশ্য মন্টেকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, "পয়সা থাকলে সব কিছু করা যায়, না রে মন্টে? তা কই, পারলিনে কালকে রাতে? খুব তো আমার ডুগডুগিকে মাংস খাইয়ে বশ করতে চেয়েছিলিস, পারলি?" বলে খিল-খিল করে হেসে উঠবে। শুধু যে গতরাতের ঘটনা বর্ণনা করবে তা নয়, কোন রাতে মন্টে কী করতে এসেছিল, সঙ্গে কে ছিল, ডুগডুগি তার কী দশা করেছিল আরও অনেক কিছু বর্ণনা করতে থাকবে। বোঝা যায়, মনার বর্ণিত মন্টে আসলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। যে-ই ওকে উত্ত্যক্ত করতে আসে তাকেই মন্টে বলে উল্লেখ করে ও। ওর চেঁচানি শুনে বাজারের কারও-কারও মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় বটে, তবে অনেকেই মুখ টিপে হেসে বলে, "এই রে, মনা

আবার খেপেছে!"

তবে মনার এই যে হঠাৎ-হঠাৎই কোনও এক সকালে কোনও এক 'মন্টে'কে সম্বোধন করে ক্ষোভ প্রকাশ করা, তা কিন্তু অহেতুক নয়। ওর ওই যে আকর্ষণীয় স্বল্পোচ্চ চেহারা, কটা চোখ আর উদ্ধত স্তনভার— তা শুধু বাজারপাড়া কেন, বেপাড়ারও অনেককেই, যাকে বলে, কামোন্মাদ করে দেয়। তারা অন্তত একটিবার মনার কাছে ঘেঁষার সুযোগ খুঁজতে থাকে নিরন্তর। মনা এককরম অসুরক্ষিতই থাকে শীত-গ্রীষ্ম সারা বছর। মাঠের ধারে ছেঁড়া পলিথিনের শেড দেওয়া আস্তানাকে এইসব লোভী ছোঁকছোঁকানির হাত থেকে আর কতটাই-বা নিরাপদ বলা চলে! কিন্তু তবু বছরের পর বছর মনা কিন্তু এদের দাঁত-নখের আঁচড়-কামড় থেকে প্রায় অক্ষতই রয়েছে। তার কারণ আর কিছু নয়, তার পোষা নেড়িকুকুর ডগডুগি! কুকুরটার চেহারা যে খুব বাঘাটোরা তা নয়, তবে তার পরাক্রম ভীষণ। মনাকে সে, যাকে বলে, দাঁত আর চিৎকার দিয়ে আগলে রাখে। বস্তুত যেদিন সকালেই শুনতে পাওয়া যায় মনাপাগলি 'মন্টে'র উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে, সেদিনই বোঝা যায় আগের রাতে বাজারপাড়ার কোনও লম্পটের কাম উথলে উঠেছিল, কিন্তু ডগডুগির বদান্যতায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

আজ এই বৃষ্টিভেজা প্রায় মাঝরাতে যে-চারজন মনার আস্তানার উদ্দেশে হাঁটছে, তারা অবশ্য একেবারেই নিষ্ঠুরতের পাবলিক। বাজারের যে-দিকটায় মনার আস্তানা, ঠিক তার রুক্ষ, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। চেহারাটা বেশ পেটানো। অনায়াসেই এক বস্তা সিমেন্ট কি এক কুইন্টালের পাথরের চাঙর মাথায় করে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেচারার কপালটা মন্দ। এত যে তার চেহারার তাকত, তবু কোনও লেবার সর্দার তাকে মুনিশ নিতে চায় না। নেবে কী করে! হেডমিস্ত্রি সিমেন্ট আনতে বললে বালির বস্তা নিয়ে আসে, কিংবা ইট আনতে বললে যদি সিমেন্ট মাখতে বসে, তা হলে কোন রাজমিস্ত্রি কাজে নিতে রাজি হবে! আসলে বেচারার শ্রবণযন্ত্রটা একেবারেই অকেজো। বন্ধ কালা! ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কোনও কাজ করতে না বললে ও কিছুতেই বুঝে নিতে পারে না ওকে কোন কাজ করতে বলা হচ্ছে। ফলে কেলেঙ্কারির একশা হয়। এ ছাড়া দিলীপের আর-একটি দোষ, ও প্রচণ্ড রাগী। ওর ধারণা, সকলেই কেবল ওকে হয়রান আর বিদ্রুপ করার জন্য এমনটা করে! ফলে ও রেগে গিয়ে খিস্তি করতে থাকে, কখনও আবার ইট-পাথরও ছুঁড়তে শুরু করে দেয়। তার ফলে ও আবার কাজ হারায়। তবে দিলীপের ক্ষেত্রেও একটি অদ্ভুত ব্যাপার আছে। ওকে সকলেই ভালবাসে। ক'দিন বাদে আবার গিয়ে কাকুতি-মিনতি করলে ক্ষমা-ঘেন্না করে ওকে কাজে নিয়ে নেয়। সেখানেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটতে যদিও দেরি হয় না।

দিলীপ ছোট থেকেই এমন। ছেলেবেলায় একবার প্রবল জ্বর হওয়ার পর থেকেই নাকি ওর শ্রবণশক্তি চলে যায়, গলার স্বরও ফ্যাসফেঁসে হয়ে যায়। কিন্তু তাতে অবশ্য ওর শারীরিক সুকেশ তা শুনে এমন লজ্জিত হয়েছিল যেন আত্মহত্যাই করে বসবে! বন্ধুর ভাব দেখে দিলীপ একটু যেন আশ্বস্তই হয়েছিল। কিন্তু হায় রে তার কপাল! পরদিন বিকেলেই মাঠ থেকে ফিরে সে আবিষ্কার করেছিল বউ পালিয়েছে। কার সঙ্গে আর, সেই সুকেশের সঙ্গেই!

দাদা মৃদু হেসে উপদেশ দিয়েছিল, "দেখ দিলীপ, সংসারের যে কী মজা তা তো বুঝতে পারলি? সংসার তোর জন্য নয়। আর বিয়ে থা-র দিকে যাসনে। তার চেয়ে বরং যে-ক'দিন বাঁচবি, হরিনাম সংকীর্তন, ঠাকুরের নাম-ভজনা করে কাটিয়ে দে।"

দিলীপ মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু বুঝতে বাকি থাকেনি, দাদা আসলে তার দেড় বিঘা সম্পত্তিটার দিকে নজর রেখেই এই সদুপদেশ দিচ্ছে। সে তাই দাদার উপদেশে কান দিতে পারেনি। বরং বন্ধুদের মারফত আবার একটা বিয়ের জন্য পাত্রীর সুলুকসন্ধান চালাচ্ছিল। কিন্তু সেটাই হয়ে গেল তার কাল। এক দুপুরে তাই নিয়ে দাদা-ভাইয়ে বেঁধে গেল তুমুল গোলমাল। দিলীপের রাগ সাংঘাতিক। রাগের মাথায় একটা খেটো তুলে দাদার দিকে ছুড়ে মারল। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগল বউদির মাথায়। বউদি মরেনি, কিন্তু তাতে থানা-পুলিশ, জেল-হাজত আটকাল না! মাস ছয়েক জেল খেটে ফিরে এসে দেখতে পেল ভিটেতে তার বসতঘরের চিহ্নমাত্র নেই, জমিও বিক্রি হয়ে গেছে। কী করে যে তার নামে রেজিস্ট্রি হওয়া জমি বিক্রি হল, তা কিছুতেই তার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠল না। সেই

১০ দিলীপ রাগের মাথায় একটা খেটো তুলে দাদার দিকে ছুড়ে

উলটো দিকে, যেখানে কালীমন্দির লাগোয়া শিরীষ গাছটা রয়েছে, সেখানে ওদের ঠেক। ঠেকে অবশ্য কেবল ওই চারজনই নয়, এলাকার যত গাঁজাখোর, জুয়াড়িও এসে সন্ধ্যার দিকে ভিড় জমায়। সেখানে একটা পলিথিনের ছাউনিগুলা ঘর, তাতে একটা বাঁধানো বেদি। একপাশে একটা বাঁশের মাচান। বেদিতে বছরে একবার করে ত্রিনাথবাবার মূর্তিপুজো হয়, বাজার থেকে চাঁদা তুলে খিচুড়ি মন্ডবও হয়। বছরের অন্যান্য সময়টায় মাচানের উপর চলে ঠেক। সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয় তাসের জুয়ার আসর, সেই সঙ্গে গাঁজা। মদও চলে, তবে ত্রিনাথবাবার প্রসাদ হিসাবে গাঁজাই এখানে বেশি সম্মান পায়।

এই আসরেরই এক সদস্য দিলীপ। সে একজন রাজমিস্ত্রির মজুর। তবে কেবল মজুর বললেই যে দিলীপের সব পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেল তা নয়। তার বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। খর্বকায়। মাথার চুলগুলো পাটের ফেঁসোর মতো বাড়-বৃদ্ধি আটকায়নি, এমনকী বিয়ে হতেও কোনও সমস্যা হয়নি। তার বাবা ছিলেন একজন চাষি— গেরস্ত মানুষ। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর অবর্তমানে ছেলের কপালে কষ্ট আছে। তাই বেঁচে থাকতেই দিলীপের নামে বিঘা দেড়েক জমি লিখে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, আর বয়সেই একটা বিয়েও দিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ সুখেই দিন কাটছিল দিলীপের। কিন্তু কথায় আছে না, সবার কপালে সুখ সয় না! হঠাৎই দিলীপ দেখতে পেল তার ঘরে প্রাণের বন্ধু সুকেশের আগমন দিনকে দিন বেড়েই চলেছে! বউয়ের চালচলনও যেন বদলে যেতে শুরু করেছে। দিলীপ নির্বোধ নয়। বুঝতে পারছিল সবকিছুই। অন্য যে কেউ হলে মুহূর্তেই বন্ধুবিচ্ছেদ করে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সুকেশকে বাইরে বের করে দিত। কিন্তু তার স্বভাব যেমন! অতটা রুক্ষ সে হতে পারে না। বন্ধুকেই অনুরোধ করেছিল, "সুকেশ, আমার দশা তো দেখছিস। তুই আদুরিকে যেন ভাগিয়ে নিয়ে যাসনে। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই।" থেকেই দিলীপ যাকে বলে একরকম নিরাশ্রয় অবস্থায় রয়েছে। দাদা কিছুতেই আর ভিটেতে পা রাখতে দেয়নি। ফলে তার অবস্থা 'ভোজনং যত্রতত্র' গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন ফুলুঠাকুরের পরিত্যক্ত দালানের এক কোণে ঠাঁই নিয়েছিল। বাড়িটা প্রোমোটারের নজরে পড়ায়, সেখানকার বসত উঠে গেছে। এখন নদীর ধারে খাস জমিতে চালা তুলে বসবাস করছে।

তবু দিলীপের ভিতরে একটা নিজস্ব সংসারের আশা যেন নিরন্তর জেগেই থাকে। সে স্বপ্ন দেখে তার নিজের ছোট্ট ঘরের আঙিনায় নেচে বেড়াচ্ছে সুন্দর ফুটফুটে এক শিশু, আর তার বউ ভোরবেলা উঠোনের সদরে গোবরছড়া দিচ্ছে।

অন্য যে-কেউ হলে হয়তো তার এই অন্তর্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কারও কাছে প্রকাশ করত না। কিন্তু দিলীপ সরলসিধে মানুষ। বন্ধুদের কাছে তার এই একান্ত গোপন স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে ফেলে। কিন্তু বন্ধুদের কী দায় পড়েছে তার এই স্বাভাবিক চাওয়ার প্রতি

সংবেদনশীল হওয়ার? তারা বরং এ নিয়ে তাকে মজার খোরাক করতেই বেশি আগ্রহী। তারা প্রায় প্রতিদিনই এক-একটা নতুন কাল্পনিক পাত্রীর সন্ধান নিয়ে আসে। দিলীপের সামনে তারা সেই পাত্রীর রং-ঢং, দেহের খাঁজ-খোঁজ ইত্যাদি হাতের মুদ্রায় বর্ণনা করে। দিলীপ বড়-বড় চোখ নিয়ে তা শুনে খুব আগ্রহী হয়ে পড়ে। কিন্তু কখন যেন আবিষ্কার করে বসে সব পাত্রীর বর্ণনাই শেষে মনাপাগলির বর্ণনার স্তরে মিলে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সে অশ্লীল গালিগালাজ সহকারে চিৎকার করতে থাকে। রং-তামাশা আরও
জমে ওঠে।

দিলীপের বন্ধুদের বর্ণিত সব পাত্রীরই চেহারা মনাপাগলির সঙ্গে মিলে যাওয়ার পিছনেও কিন্তু সেই একই কারণ— অন্তর্গত কামনা। বন্ধুদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনও না-কোনও রাতে মনার আস্তানায় অভিসারে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। সেই ব্যর্থতার জ্বালাই যেন দিলীপের মতো নিতান্ত অচল-অধম ব্যক্তিকে দিয়ে মনাকে রক্তাক্ত করানোর প্রতিশোধ কামনা করে চলে! কিন্তু কেন কে জানে, দিলীপ মনাপাগলির নাম শুনলেই তীব্র প্রতিবাদে চেঁচামেচি করতে থাকে।

আজ সন্ধ্যার আসরেও দিলীপকে নিয়ে তেমনই মজা-মস্তি চলছিল। মনার নাম শুনে দিলীপ চেঁচাতে শুরু করতেই পেলু চেপে ধরল, "মাইরি দিলীপ, সত্যি করে বল তো, মনার উপর তোর এত রাগ কেন?"

পাত্রী ওই মনাই!"

বন্ধুরা যেন রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। বলল, "তারপর? কী করলি?"

দিলীপ বলল, "তাই বলে তোরা যেমন ভাদুরে কুত্তার মতো ছোঁক-ছোঁক করিস আমি তা করিনি।"

"কী করলি?"

দিলীপ একটু চুপ করে রইল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গতবছর চৈত্রশেষের সেই আতসবাজি ফোটা রাঙা বিকেলটার কথা। সেদিন ছিল চৈত্রসংক্রান্তি। চড়কের মেলা বসেছিল হাই স্কুলের মাঠে। নাগরদোলায় চেপে মেয়েরা হলিক-ভলিক চেঁচাচ্ছিল, রঙিন চুড়ির দোকানে জমাট ভিড়ে বউগুলো গয়না কিনছিল, আতসবাজি ফাটছিল আকাশকে রঙিন করে দিয়ে। সে আর কী করবে, একা-একাই আলুক-থালুক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বন্ধুদের অনেকেই মেলা দেখতে এসেছিল, কিন্তু সবাই সব্রীক। তাকে দেখে মুচকি হেসে চলে যাচ্ছে। নিজেকে ভারী নিঃসঙ্গ আর প্রতারিত মনে হচ্ছিল যেন। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎই নজরে পড়ে গিয়েছিল, যেখানটায় আতসবাজি ফাটানো হচ্ছে, সেখান থেকে কয়েক গজ দূরে, একটা পিটুলি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আপনমনেই হেসে চলেছে মনা। ভারী অদ্ভুত, ওর কাছে তখন ডুগডুগি ছিল না।

দিলীপ মেলা থেকে একফালি তরমুজ কিনেছিল খাওয়ার জন্য। মনাকে দেখে কামড় বসানোর কথা ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। হেসে এগিয়ে এসেছিল মনার দিকে। কিন্তু কী যে বলবে ভেবে পায়নি। মনার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল তরমুজের ফালিটা। মনা যদি পাগলি না হত, কিংবা দিলীপ যদি বোকা-হাবা না হত, তা হলে নিশ্চিত তাদের নজরে পড়ত সেই সময়ে পশ্চিম দিকে সবে সূর্য অস্ত গিয়ে লাল আভা দেখা যাচ্ছিল, আতসবাজির তীব্র আলো মাঝে-মাঝেই এসে লাগছিল দু'জনের মুখে, আর সেই আলোয় দিলীপের হাতের লাল তরমুজটাকে তার হৃদয় ওপড়ানো রক্তের মতোই লাগছিল। কিন্তু এতসব কাব্য তাদের জন্য নয়। মনা দিলীপকে দেখেই যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। পুরুষালি গলাকে আরও গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী এটা? এটা আমায় দিচ্ছিস কেন মুখপোড়া?"

দিলীপ হেসে বলেছিল, "খাওয়ার জন্য কিনলাম। তুই আছিস দেখতে পেয়ে আর খাওয়া হল না। তাই তোর জন্যে নিয়ে এলাম," বলে লজ্জায় মুখ নিচু করেছিল।

মনা চাখ বড়-বড় করে হাঁকাচ্ছে গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, "তাই আমার জন্য নিয়ে এলি? কেন, আমি কি তোর সাতপাকে ঘুরানো বউ, নাকি তোর নাং? দূর হ হারামজাদা আমার সামনে থেকে! কোথা থেকে আমার নাং এলেন তরমুজ খাওয়াতে! শালা যত কালা-বুধ, বাপে খেদানো, বউ পালানো আমার কপালে জোটে!"

মেলায় মাইক বাজছিল, চারদিকে হইহই আওয়াজ সেই সঙ্গে শ্রবণযন্ত্রের অসহযোগিতা— সব মিলিয়ে মনার কথার কিছুই বুঝতে পারছিল না দিলীপ। তবে আন্দাজে বুঝতে পারছিল, মনা ব্যাপারটাকে অনুমোদন করছে না। তবু সাহসে ভর করে বলেই ফেলেছিল, "তোকে একটা কথা বলব-বলব করে বলতে পারিনি মনা। শুনবি?" মনা আবার একই ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বলেছিল, "তোর কথা শুনে আমার কাম কী রে? তোকে বললাম না আমার সামনে থেকে দূর হতে?"

দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে একবার চেয়েছিল। তারপর কী মনে করে বলেই ফেলেছিল, "তুই আমাকে বিয়ে করবিং? আমারও ঘর নেই তোরও নেই। তোরও অনেকটা সোহাগও নেই যেন বলেছিল, গগনে চাঁদ উটেচঃ সোন্দর হাওয়া দিচ্চেঃ চারদিকে ফুল ফুটেচঃ তারপরঃ আমি বুজিনে? তুমার শালা ওই পেলু-ঘোঁতনাদের মতোই আমারে করার ইচ্ছা হয়েচে!" তারপর যেন আতসবাজির মতোই বিস্ফারিত হয়ে হাতের তরমুজটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে মেরেছিল দিলীপের

মারল। কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগল বউদির মাথায়।

ঘোঁতন বলল, "তার মানে এই ব্যাটার দশাও আমাদের মতোই, ওর কাছে যেতে গিয়ে ডুগডুগির দাঁতখিঁচানি খেয়ে এসেছে!" বলে দিলীপের ঘাড়ের ঠেঁটি ধরে চাপ দিয়ে বলল, "বল ব্যাটা, সত্যি কি না? সব পাখিই মাছ খায় নাম হয় মাছরাঙার!"

দিলীপ যে এদের সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে তা নয়। আকারে ইঙ্গিতে ধরে নেয়। সে খানিক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর বলল, "তোদের কাম থাকতে পারে আর আমার নেই?"

বন্ধুরা আনন্দে দিলীপকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে হইহই করে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আরে, সেই কথাই তো শুনতে চাইছি। বল, বল, ঘটনাটা কী!"

দিলীপ বলল, "তোদের পায়ে তেল দিয়ে-দিয়ে তো হয়রান হয়ে গেলাম। একটা পাত্রীর সন্ধান কিছুতেই দিতে পারলিনে। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই সন্ধান করতে হল। অনেক সন্ধান করলাম। শেষে বুঝতে পারলাম, আমার উপযুক্ত

দিতেই সে বলল, "মাইরি ঘোঁতনা, আগে আমি ওকে ভালবাসতাম। কিন্তু এখন কেবলই মনে হয়, শালি আমার ভালবাসার মর্যাদা বুঝল না, ওকে একবার বাগে পেলে ছিঁড়ে খেয়ে নুবো!"

ঘোঁতন দিলীপের কথায় যেন মজা পেয়ে গেল। বলল, "আরে থাম! শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। মনাকে কবজা করার ক্ষমতা তোর নেই। তা হলে সেদিন মেলার মাঠ থেকে পালিয়ে আসতিসনে।"

দিলীপের যেন পুরুষকারে লাগল ঠেসটা। চেঁচিয়ে বলল, "ওহে, মেলার ভিড়ের মধ্যে কী করব? আমি কি ভাদুরে কুত্তা?"

দিলীপের বলার ঢঙে ওরা চারজনেই হেসে ফেলল। একই সঙ্গে সকলকেই কী যেন এক হঠকারিতায় পেয়ে বসল। পেলু বলল, "সেদিন না হয় মেলার মাঠ ছিল। আজ তো তা নয়। আজ বৃষ্টির রাত। আজ পারবি?"

দিলীপের চোখের সামনে বোধ হয় সেদিনকার মনার রথরঙ্গিনী মূর্তিটা ক্ষণেকের জন্য ভেসে উঠেছিল। মুহূর্তের জন্য ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়েছিল। তারপর কেমন মিয়ানো গলায় বলেছিল, "কিন্তু ওর যে ডুগডুগি আছে?"

সেই সঙ্গে মজাও দেখা হবে, কী ধরনের নাটকটা হয়! দিলীপ যদি সাকসেসফুল হয়, তার পর না হয় তারাও... যাকে বলে ইয়ে...

চারজনের মধ্যে ঘোঁতনা আর পেলু আগে-আগে হাঁটছিল। পিছন-পিছন দিলীপ আর সমর। দূর থেকে বাবলা গাছের অবয়বটা বর্ষার কালো মেঘের মতোই মনে হচ্ছিল আকাশের গায়ে সেঁটে রয়েছে। সমর দিলীপের পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বলল, "কী রে শালা, ভয় করছে না তো?"

দিলীপ বলল, "আজ রাতে তুরা আমার বিয়ে দিয়েই ছাড়বি মনে হচ্চে!"

আপনমনেই হেঁটে আসছিল ওরা। চারদিক নিঝুম। আকাশে ঘন নুনটের মেঘই ছিল, কিন্তু এখন একটু যেন হালকা হাওয়ায় পশ্চিম দিকের মেঘেরা ছিঁড়ে যেতে শুরু করেছে। সেই ফাঁকে এক টুকরো চাঁদের আভাস কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও আবার ডুবে যাচ্ছে, ফলে বেশ রহস্যময় লাগছে চরাচর। বর্ষার ভিজে হাওয়ায় যে-শীতল আবেশটা আছে, তা আজ যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতোই যত রাজ্যের ঘুম এনে দিতে চাইছে চোখে। আশপাশের সকলেই দারুণ সুষুপ্তিতে মগ্ন, কেবল এই চারজন ছাড়া।

বাবলাতলা থেকে কয়েক গজ দূরে এসে ওদের চলার গতি মন্থর হয়ে এল। খুব সাবধান আর সতর্কও হয়ে গেল ওরা। পেলুর হাতে রাখা মাংসর সঙ্গে শিশির কীটনাশকটা মেশাল ঘোঁতনা। তারপর বিড়ালের মতোই সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে গেল মনার কুঁড়ের দিকে।

কেউ কোনও শব্দ করেনি। সম্ভবত মনার কুত্তা ডুগডুগিও আঁচ করতে পারেনি তাদের আগমন। কিন্তু তার আগেই মনার গলার আওয়াজ ভেসে এল, "দেখ তো ডুগডুগি, কোন হ্যারামি ছেলে আবার জ্বালাতন করতে এল!"

মনার গলার আওয়াজ ওদের কানে ঢোকার আগেই তীক্ষ্ণ শব্দে, যেন বন্দুকের গুলির মতোই ডুগডুগি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরের রাস্তায়। সঙ্গে-সঙ্গেই দৌড় চারজনের।

অন্ধকার রাতে কখন যেন ঘন মেঘের বুক চিরে ফ্যাকাসে চাঁদের আভা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাতে রাস্তার খানাখন্দ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চারজনেই প্রাণভয়ে ছুটছে খানাখন্দ ভেদ করে। তিনজনের পিছনে নেড়িকুত্তা, কিন্তু দিলীপ একটু পিছিয়ে পড়েছে। ছুটতে-ছুটতে পিছন ফিরে একবার তাকাল সে। তাতেই ভয়ে যেন তার চলার গতি শ্লথ হয়ে পড়ল। ওদের তিনজনের পিছনে ডুগডুগি, কিন্তু তার পিছনে কে? খিলখিল করে হাসছে, রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়, শাড়ির আঁচলও উড়ছে। হাতে একটা উদ্যত বোগি দা। মনাপাগলি! প্রচণ্ডবেগে ছুটছে সে। ঘন মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা ফ্যাকাসে চাঁদের আবছা আলোয় দিলীপের মনে হল যেন এক অপার্থিব ব্যাপার! যেন মহাকালই উন্মাদিনী রূপে তাড়া করেছে!

সে আরও জোরে ছোটার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, মনার হাতে ধরা পড়ে গেল। মনা পিছন থেকে তার চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভাঙা গলায় হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "তুই পালাচ্ছিস কোথায় হারামজাদা!"

দিলীপ ভয়ে কুঁকড়ে গেল। চোখ বন্ধ করে ফেলল। হাতজোড় করে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, "আমাকে ছেড়ে দে মনে, দিব্যি গেলে বলচি আর কুনো দিন এমন হবে না। আমি আসতে চাইনি, ওরা জোর করে নিয়ে এসেছে..."

মনা আবার হেসে উঠল খিল-খিল করে। বলল, "ছেড়ে দুব বলে ধরিচি নাকি? আগে ঘুরে আয় তারপর তোর ব্যবস্থা হচ্ছে!"

দিলীপ অনেকটা ভাগ্যের হাতেই যেন নিজেকে ছেড়ে দিল। তার চুলের মুঠি ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়ে ছেঁড়া পলিথিনের ছাউনিওলা ঘরে এনে তাকে হাজির করল মনা।

১৯ দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে মনার দিকে চেয়েই রইল।

ঘোঁতনা-পেলুরা দিলীপের পিঠে চাপড় দিয়ে বলেছিল, "আরে, তুই যে ন্যাতানো বিস্কুটের মতো মিইয়ে গেলি! আগে রাজি হ, তারপর দেখ না, ডুগডুগির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে!"

দিলীপ ভারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আসলে মনার উপর সে ক্ষুব্ধ ঠিকই। সে ক্ষোভ অনেকটা নিজের লোকের উপর অভিমানের মতোই। তাই বলে এমনভাবে ছক কষে নিষ্ঠুরতায় তার মন সায় দিচ্ছিল না। অথচ তখন আর পিছিয়ে আসার উপায়ও ছিল না। বলেছিল, "শোনো, ডুগডুগি তাড়া করলে কিন্তু আমি ছুট দেব!"

ডুগডুগির চেঁচানি স্তব্ধ করার উপায়ও বেরিয়ে এসেছিল। ঠিক হয়েছিল বেগুনখেতে দেওয়ার বিষ বেশ খানিকটা কেনা হবে। ঘুরুময়রার দোকানের খাসির মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হবে। তারপর হবে রগড়।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই ওরা চারজন চলেছে এখন।

মনার আস্তানাটা রাস্তার পাশে বাবলা গাছের লাগোয়া ঢালে, দূর থেকে দেখা যায় না। ওরা চারজন ফিসফিস করে কথা বলতে-বলতে হাঁটছিল। কথার চেয়ে কৌতূহলই বেশি ছিল। প্রথমে ডুগডুগিকে মাংস দেওয়া হবে। ও ব্যাটা খেয়ে মরলে দিলীপকে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে মনার ছেঁড়া পলিথিনের ছাউনি দেওয়া আস্তানায়। তারা তিনজন বাইরে পাহারা দেবে। ঘর তো নয়, যেন আদিম মানুষের গুহা। টিমটিম করে একটা ভাঙা টেমি ল্যাম্প জ্বলছে। ঘরের মেঝেতে পাতা রয়েছে শত-শত ক্যাচরা আর পাটের ফেঁসো। বৃষ্টির ছাঁটে সেগুলোর অবস্থা নিদারুণ স্যাঁতসেঁতে।

বাঘিনী যেমন শিকারকে কবজা করে ডেরায় নিয়ে আসার পর বিশ্রামরত হয়, মনার ভাবখানাও অনেকটা তেমনই। দিলীপ দেখল, মনার হাতে এখন আর বোগি দা-খানা নেই। যে উন্মাদিনীর হাসিটা হাসছিল তা-ও উধাও। তার বদলে যেন লেগে রয়েছে এক অন্যরকম চাহনি। এমন চাহনি সে কোনওদিন কোনও মেয়ের কাছ থেকে পায়নি। দিলীপের মনে হল, মনা একটু যেন হাঁফাচ্ছে। যেন নার্ভাসও। ওর কপালে, নাকের উপর লেগে আছে জলের ফোঁটা। জলেরই ফোঁটা, নাকি ছোটাছুটির ক্লান্তিজনিত ঘাম দিলীপ বুঝতে পারল না।

দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে মনার দিকে চেয়েই রইল। সহসা একটা উথল হাওয়া উঠল। ঘরের ভিতরের টেমি ল্যাম্পটা নিভে গেল। দিলীপ বুঝতে পারল না, সেই হাওয়াতেই মনার পরনের বসনও উড়ে গিয়ে সে দিগম্বরী হয়ে গেল কি না!

বাইরে যেন মেঘের ফাঁক দিয়ে একটুকরো চাঁদ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র

আপনি কি জানেন ?

সর্বাধিক রোগের কারণ পেটের গন্ডগোল ও অসুস্থ লিভার,
তাই লিভার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং রোগ প্রতিরোধে ডাঃ সরকারের
প্রায় ৫০ বছরের আয়ুর্বেদিক গবেষণা ও কোটি কোটি মানুষের ভরসা।

Liver & Stomach Tonic
Carminative & Digestive

- গ্যাস, অ্যাসিডিটি, বদহজম দূর করে ও প্রতিরোধে সাহায্য করে
- হজমশক্তি বাড়ায় ও পেটের গন্ডগোল সারায়
- শরীর ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খুবই কার্যকরী

লিভোসিন খান সুস্থ থাকুন

Ayurvedic Liver Tonic
Protects Liver & Health

- লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়ায় ও সুরক্ষা দেয়
- রক্তকে পরিশোধন করে এবং ইমিউনিটি বাড়ায়
- অসংযমী জীবনযাত্রার কারণে অসুস্থ লিভারকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে
- ফ্যাটি লিভারে কার্যকরী

ডবল স্ট্রেংথ-ডবল অ্যাকশন, লিভারের ডবল প্রোটেকশন্

হেলদি লিভার হেলদি স্কিন
বিউটিফুল ফ্রম উইদিন

Liver & Skin Health Cap
Rejuvenates Liver, Health & Skin

- লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়ায়
- অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টস্ যোগায়
- রক্তকে পরিশোধন করে
- প্রাকৃতিক ইমিউনিটি বাড়ায়

প্রতিদিন খেলে দুটো ক্যাপসুল আপনি থাকবেন বিউটিফুল

কোষ্ঠকাঠিন্য নানা রোগের কারণ,
মুক্তি পেতে ও প্রতিরোধে

Ayurvedic Laxative Granules
Natural, Safe & Effective

আয়ুর্বেদিক ল্যাক্সেটিভ
বেল, ইসবগুল, ত্রিফলা ও অন্যান্য ভেষজগুণে সমৃদ্ধ

পেট ভাল রাখুন আর সুস্থ থাকুন

Dr. Sarkar's Allen GROUP

Distributor's Query : 9903466699 / 8334993910
Medical Help Line : 1800 345 2210 (Toll Free)
Website : www.allenhealthcare.co.in

সমস্ত মেডিকেল স্টোরস্-এ পাওয়া যায়।

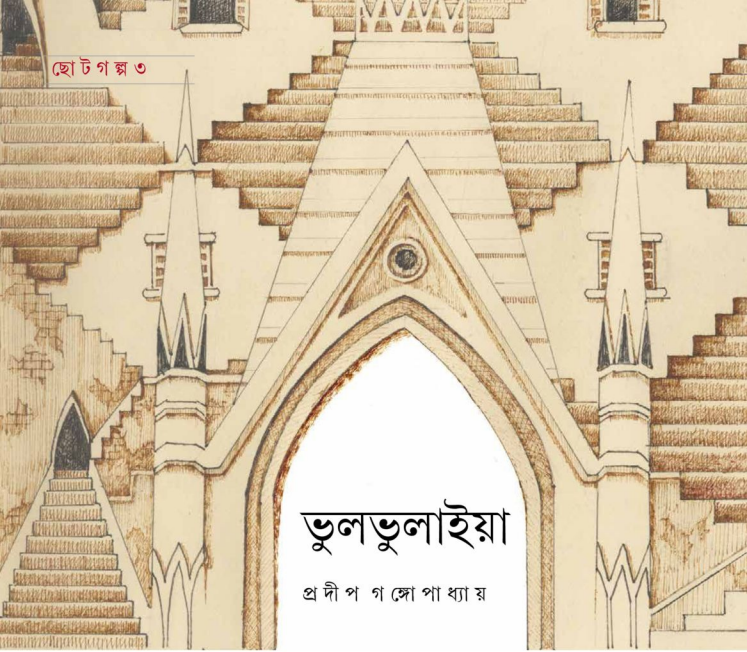

ভুলভুলাইয়া

প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়

"লিফট থেকে তিনতলায় নেমে করিডর ধরে সোজা বাঁ দিকে হাঁটতে হবে, খানিকটা এগিয়ে আবার বাঁ দিকে মোড়, তারপর পঞ্চাশ পা এগিয়ে আবারও বাঁ দিকে ঘুরে কয়েক পা এগোলেই, একেবারে আসল ঠিকে পৌঁছে যাবেন। মানে, তিনতলায় পৌঁছে আপনাকে বামপন্থী হয়ে যেতে হবে, সে আপনি যে-পন্থারই লোক হোন না কেন।"

কথা শেষ করে হো-হো করে হেসে উঠলেন সুমন্ত তরফদার। বিগলিত ভঙ্গিতে হাত কচলে, কান-এঁটো করা হাসিতে মুখ ভরিয়ে নিয়ে তোষামোদের সুরে বিনয়বাবু বললেন, "বেশ বলেছেন সমুদা, আপনার রসবোধের তুলনা নেই।" পঞ্চাশ বছর বয়সের সুমন্তকে ষাট-ছোঁয়া বিনয় চৌধুরী অক্লেশে সমুদা বলে সম্বোধন করেন। এটাই দস্তুর, কেননা সুমন্ত এই অঞ্চলের শাসকদলের যুবনেতা।

গাড্ডায় পড়েছেন বিনয় চৌধুরী। এর জন্য তাঁকেই দায়ী করছে সহকর্মীরা। যে-সরকারের অধীনে চাকরি, তারই বিরুদ্ধে মামলা! এ যেন যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া! বেশ হয়েছে। বোঝো এখন ঠেলা। সরকার তাঁকে টপকে নিয়মের বাইরে গিয়ে জুনিয়রকে প্রোমোশন দিয়েছে। রীতিমতো অপমানিত হয়েছেন বিনয়বাবু। প্রথমে উপরমহলে লেখালেখি, কিন্তু তাতে কোনও ফল না হওয়ায় সোজা মামলা ঠুকে দিলেন হাইকোর্টে। টাকাপয়সা খরচের কথা চিন্তা করে নামী-দামি কোনও উকিলের কাছে যেতে পারেননি। পরিচিত একজনের কাছে খোঁজ পেয়ে তিনি গেলেন মহালয়া মিশিরের কাছে। মহালয়া নির্ভেজাল বাঙালি, মিশিরকে বিয়ে করার ফলে বোস থেকে মিশির হয়েছেন। মহালয়াকে বেশ

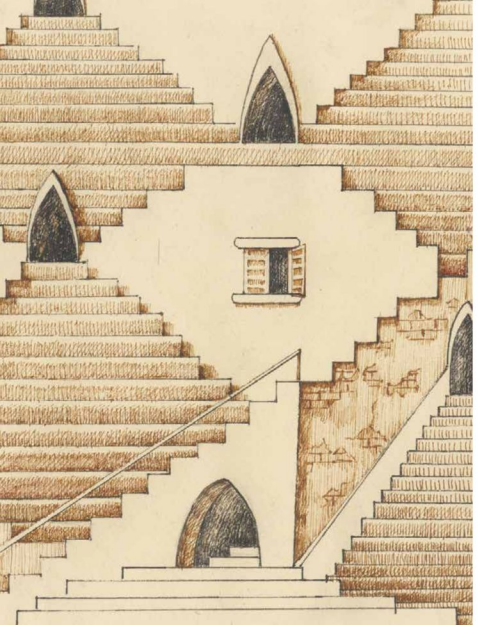

পছন্দ হল বিনয়বাবুর। নাম শুনলেই পুজো-পুজো মনে হয়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের কণ্ঠস্বর কানে বাজে।

সব কথা শুনে মহালয়া বললেন, "এ তো সহজ ব্যাপার মশাই। দু'শো ছাব্বিশের কেস। জিতবেন তো অবশ্যই, রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট পাবেন। সঙ্গে এতদিনের সুদ।"

সার্থক নাম বটে মহালয়ার। সাক্ষাৎ দেবী মহাময়া। ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বিনয়বাবু বললেন, "কতদিন সময় লাগবে ম্যাডাম?"

"বেশি সময় লাগার তো কথা নয়। মামলা হাকিমের সামনে উঠলে, আশা করছি, একটা, বড়জোর দুটো শুনানিতেই ফয়সালা হয়ে যাবে। এ তো পরিষ্কার মামলা, কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। আমি কাগজপত্র তৈরি করছি, সামনের সপ্তাহের শুক্রবার এসে সই করে দেবেন। শুক্রবারটা আমার লাকি ডে," আশ্বাসবাণী শোনালেন মহালয়া।

এসব বছর দেড়েক আগের ঘটনা। একের পর এক দিন কেটেই গিয়েছে, মামলা আর শুনানির জন্য উঠছেই না। মহালয়াকে বললেই উত্তর আসে, "আহা, মামলা না উঠলে আমার কী করার আছে? মামলা উঠলে তবে তো আমি আরগুমেন্ট করব। চেষ্টা করে একবার মামলাটা তুলুন, দেখবেন কী করি তখন। একদিনের শুনানিতেই মামলা শেষ।"

বোকার মতো জিজ্ঞেস করলেন বিনয়বাবু, "মামলা উঠবে কেমন করে?"

মহালয়া রহস্যময় চাপা হাসি নিয়ে বললেন, "আর সবার মামলা যে-ভাবে উঠছে আপনারটাও সেইভাবে উঠবে।"

কিন্তু কীভাবে যে অন্যদের মামলা উঠছে, তার কোনও হদিশ দিলেন না।

হদিশ পাওয়া গেল গৃহিণীর কাছ থেকে। তিনিই বিনয়বাবুকে পরামর্শ দিলেন সুমন্ত তরফদারের কাছে যেতে। কথাটা শুনে অবাক হয়ে বললেন বিনয়বাবু, "সুমন্ত তো রাজনীতির লোক, কোর্ট-কাছারির ব্যাপারে ও কী করবে?"

গৃহিণী হেসে উত্তর দিলেন, "এখন ওরাই তো সব। আঁতুড়ঘর থেকে ছাদনাতলা, তারপর শ্মশানঘাট— সবটাই তো এখন ওদের দখলে।"

সুমন্তর নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছে বিনয়বাবু দেখলেন, করিডরের বেঞ্চিতে জনাপাঁচেক ছোকরা গুলতানি করছে। সুমন্তর কথামতো এরা সব উকিলদের মুহুরি। মুহুরি বলতে বিনয়বাবুর চোখে যার চেহারা ভেসে ওঠে সেটা কালোদাদুর। ঠেঙে করে ধুতি পরা, ঊর্ধ্বাঙ্গে সস্তা লংক্লথের শার্ট, পায়ে খাকি রঙের ক্যাম্বিসের জুতো, ছোট করে ছাঁটা মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল, সুতো দিয়ে কানে জড়ানো চশমা চোখে। বগলে বাঁশের ডান্ডির ছাতা নিয়ে, সামনে ঝুঁকে হেঁটে চলেছেন কালোদাদু।

বেঞ্চিতে বসা ছোকরাদের মধ্যে থেকে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "মুহুরি শ্যামাপদ গুছাইতকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

ছোকরা বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিল, "এখানে মুহুরি-টুহুরি কেউ নেই মশাই, সব ল-অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট, পরনে টাইট জিনস, চোখে কালো চশমা, টি-শার্ট পরা এক যুবক এসে দাঁড়াল। সিগারেটে সজোরে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "কেসটা কী?"

বিনয়বাবু রীতিমতো ঘাবড়ে গেছেন। প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "শ্যামাপদ গুছাইত।"

যুবকটির চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "শ্যামাপদকে চেনেন আপনি?"

"না, আমি চিনি না, আমাকে পাঠিয়েছে একজন।"

"কে পাঠিয়েছে আপনাকে?"

বিনয়বাবু এবার সংকটে পড়লেন। এই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিটির কাছে সুমন্তবাবুর নাম বলাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছেন না তিনি। যুবকটি বলে, "কী হল, কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমার কাছে?"

"আরে, আপনিই শ্যামাপদ!" বিনয়বাবুর কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময় ও উল্লাস। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার তিনি বলেন, "সুমন্তবাবু আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল শ্যামাপদর আচরণে। বিনয়ের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চিতে বসাল। হাঁক দিল চায়ের জন্য, "বদু, দু'কাপ চা দিয়ে যা," বিনয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "সুমন্তদা পাঠিয়েছেন, এ-কথাটা আগে বললেন তো। কেমন আছেন

সুমন্তদা? বলবেন, শিগগিরই একদিন যাব দেখা করতে।''

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছে। শ্যামাপদ চায়ের কাপ বিনয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ''এবার বলুন, আমার কাছে আপনাকে কেন পাঠিয়েছেন সুমন্তদা?''

লম্বা করে চায়ে একটা চুমুক দেন বিনয়বাবু, একটু দম নেন। বোধ হয় কথাগুলো মনের মধ্যে গুছিয়ে নেন। এবার ধীরে-ধীরে বলেন, ''একটা মামলার ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার। সুমন্তদ বলেছেন আপনিই নাকি কাজটা করে দিতে পারেন।''

''কাজটা কী?'' চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল শ্যামাপদ।

''আমার মামলাটা দেড় বছর ধরে পড়ে আছে, শুনানিতে উঠছে না।''

''কার ঘরে আছে মামলা?'' জিজ্ঞেস করে শ্যামাপদ।

''জাস্টিস মজুমদারের ঘরে,'' চায়ে চুমুক দিয়ে মৃদুস্বরে উত্তর দেন বিনয়বাবু।

''মামলাটা কোন বিষয়ে?''

''আমার চাকরির প্রোমোশন সংক্রান্ত।''

''আপনার উকিল কে?''

''মহালয়া মিশির।''

শ্যামাপদ নাকমুখ কুঁচকে বলে, ''সার্ভিস কেসে মেয়েছেলে উকিল। মামলা তো আগে থাকতেই হারার ব্যবস্থা করে রেখেছেন মশাই।''

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ বিনয়বাবুর। কাঁপা গলায় বলেন, ''তা হলে কী হবে?''

বোঁ করে ঘুরে একেবারে বিনয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যামাপদ। ধমকের ভঙ্গিতে বলেন, ''আচ্ছা মাকড়া লোক তো মশাই আপনি। মোহর মানেই কি আকবর বাদশার মোহর? এতদিন কোর্টে ঘুরছেন, আর মোহর জানেন না? এক মোহর মানে সতেরো টাকা। পাঁচশো মোহর হচ্ছে সাড়ে আট হাজার টাকা। এর চেয়ে কমে পারব না মশাই। স্যারের একটা প্রেস্টিজ আছে তো! জানেন, উনি মন্ত্রী ছিলেন একসময়।''

বিনয়বাবুর মনে পড়ে গেল সব। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন শ্যামাকান্ত বাগচীর নামটা কেন তার এত চেনা লাগছিল। বেশ কিছুদিন আগে পশুখাদ্য নিয়ে কেলেঙ্কারির ব্যাপারে প্রায়ই কাগজে নাম বেরোত শ্যামাকান্ত বাগচীর।

দুই

বাড়ি নয়, যেন জাহাজ। শ্যামাকান্ত বাগচীই বলে দিয়েছেন মহালয়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কারণ, কনফারেন্স হবে। কনফারেন্সের কথা শুনে দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বিনয়বাবু। প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে মিউমিউ করে বলেছিলেন, ''উকিলবাবু, কনফারেন্স করতে হবে?''

শ্যামাকান্ত বাগচীর দুই ভুরু কুঁচকে জোড়া লেগে গেল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন বিনয়বাবুর দিকে। সেই দৃষ্টিতে সমপরিমাণ ক্রোধ ও বিস্ময়। শ্যামাপদ হ্যাঁচকা টানে একপাশে টেনে নিয়ে গেল বিনয়বাবুকে। চাপা গলায় ধমকের সুরে বলল, ''আপনার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে?''

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিনয়বাবু, ''কেন, কী করলাম আমি?''

''আপনি স্যারকে উকিলবাবু বললেন?''

বিনয়বাবু আরও অবাক হয়ে বলেন, ''ভুল বললাম কোথায়? উনি তো উকিলবাবুই।''

''না, স্যার বললেন। বুঝেছেন? স্যার বললেন। এ কি মফস্সলের বটতলায় বসা ছেঁড়া কালো কোট পরা উকিল পেয়েছেন নাকি?''

ব্যাপারটা বিনয়বাবুর অদ্ভুত মনে হল। শ্যামাকান্ত তাঁর টিচার নন, বসও নন। তিনি তো টাকার বিনিময়ে শ্যামাকান্তর সার্ভিস নিচ্ছেন। তা হলে তিনি শ্যামাকান্তকে স্যার বলতে যাবেন কেন? কথাটা মনে এলেও তিনি বললেন না। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, ''ঠিক আছে, স্যারই বলব, আর ভুল হবে না।''

আজ রবিবার, কোর্ট বন্ধ। তাই কনফারেন্সের দিন ঠিক হয়েছে আজ। শ্যামাপদ মারফত শ্যামাকান্ত জানিয়ে দিয়েছেন কনফারেন্সের ফিজ চার হাজার টাকা। একটা লম্বা খামের মধ্যে চার হাজার টাকা ভরে নিয়ে এসেছেন বিনয়বাবু। অতবড় একজন নামী মানুষের হাতে ন্যাড়ান্যাংটা টাকা তুলে দিতে সংকোচ বোধ করলে, তাই এই ব্যবস্থা। এখানে মহালয়াকে নিয়ে আসার জন্য সকালে তাঁর বাড়িতে খন্টাখানেক ধরনা দিতে হয়েছে বিনয়বাবুকে। তাঁকেও ফিজ দিতে হবে দু'হাজার। তা ছাড়া ট্যাক্সিভাড়া। মহালয়ার নিজের গাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু মক্কেলের কাজের জন্য তো তেলখরচা করে নিজের গাড়িতে আসবেন না।

মহালয়া কলিং বেল টিপলেন। একজন দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মহালয়া কিছু বলার আগেই লোকটা বলল, ''আপনাদেরই তো আসার কথা ছিল, তাই না?''

মহালয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়াতে লোকটা বলল, ''আসুন,'' একটা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে লোকটা বলল, ''বসুন আপনারা, একটু পরেই স্যার নীচে নামবেন।''

লোকটা বেরিয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখতে লাগলেন বিনয়বাবু। বেশ বড় ঘর, দেওয়াল-জোড়া আলমারিতে ঠাসা বই। প্রত্যেকটি বই বাঁধানো এবং পরিপাটি করে সাজানো। মহালয়া তাঁর হাতের ফাইল খুলে পড়তে শুরু করেছেন। মাঝে-মাঝে পেন দিয়ে এক-একটা জায়গায় দাগ মারছেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর ঘরে ঢুকলেন শ্যামাকান্ত। মহালয়া উঠে দাঁড়ালেন। বিনয়বাবুও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

১০ শ্যামাকান্ত বাগচীর দুই ভুরু কুঁচকে জোড়া লেগে গেল।

শ্যামাপদ আশ্বাস দেয়, ''আরে, অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আমি তো আছি। সমুদা পাঠিয়েছে আপনাকে, ব্যবস্থা একটা অবশ্যই করতে হবে। শ্যামাকান্ত বাগচীকে ঠিক করে দেব, উনি সিনিয়র। পাওয়া অবশ্য মুশকিল ওকে, তবে আমি ধরলে না বলতে পারবেন না।''

''কিন্তু মামলাটা শুনানিতে না উঠলে তো কিছু হবে না।''

''তার জন্য আমি আছি,'' বিনয়বাবুর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয় শ্যামাপদ, বিনয়কে নিয়ে করিডর ধরে হাঁটতে থাকে। উদ্বিগ্ন স্বরে বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করেন, ''শ্যামাকান্তবাবুর ফিজ কত?''

উদার হেসে শ্যামাপদ আশ্বাস দেয়, ''ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। স্যার আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন, ফিজ আমি পাঁচশো মোহরে করে দেব।''

''বিস্মিত কণ্ঠে বিনয়বাবু বলে ওঠেন, ''মোহর! মোহর পাব কোথায়?''

চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে মোলায়েম হেসে শ্যামাকান্ত বললেন, ''দেরি হয়ে গেল একটু। সকালে উঠে চান সেরে পুজো না করে আমি জলগ্রহণ করি না। বলো দেখি মহালয়া, তোমাদের ম্যাটারটা কী?''

শুরু হল আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা নিয়ে আলোচনা। সবকিছুই বিনয়বাবুর কাছে দুর্বোধ্য। তিনি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। বাড়ির বাগানটি খুব সুন্দর। বোঝাই যায় এর জন্য বেশ ভাল খরচ করতে হয় শ্যামাকান্তকে। নানা বর্ণের মৌসুমি ফুলে বর্ণময় হয়ে আছে বাগানটি। বিনয়বাবু ফুল ভালবাসেন। কিন্তু এঁদো গলির যে ঘুপচি একতলা বাড়িতে ভাড়া থাকেন তিনি, সেখানে বাগান করার কথা ভাবাটাও হাস্যকর।

মহালয়ার আলতো ধাক্কায় সচেতন হলেন বিনয়বাবু। শ্যামাকান্ত সহাস্য মুখে বললেন, ''চিন্তা নেই, এবার মামলা শুনানিতে তুলুন, দেখছি সরকারি উকিলের মুরোদ কত।''

পকেট থেকে সন্তর্পণে টাকার খামটা বের করে শ্যামাকান্তর সামনে টেবিলে রাখলেন বিনয়বাবু। শ্যামাকান্ত কিন্তু হাত বাড়ালেন না। একঝলক খামটার উপর চোখ বুলিয়ে বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ''ওর মধ্যে কত আছে?''

''আপনি যা বলেছিলেন, তাই আছে স্যার, চার হাজার,'' বিনীতকণ্ঠে নিবেদন করেন বিনয়।

খামের দিকে হাত না বাড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে সিগারেট জ্বালান শ্যামাকান্ত। লম্বা একটা টান দেন, শ্বাস বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ ধোঁয়া আটকে রাখেন মুখের মধ্যে। তারপর ধীরে-ধীরে যুগপৎ নাক এবং মুখ দিয়ে ধোঁয়া নিঃসরণ করতে থাকেন। সমগ্র ঘটনাটি সমাপ্ত হতে মিনিট তিনেক সময় লাগে। এবার বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, ''চার হাজার বলেছিলাম, না? বড্ড কম বলে ফেলেছি, পাঁচের কমে কনফারেন্সে বসি না আমি। তবে বলে যখন ফেলেছি কিছু তো করার নেই। আপনাকে পাঁচ হাজার দিতে হবে না, আর পাঁচশো দিয়ে দিন ওর মধ্যে।'' সিগারেটে আবার একটা লম্বা টান দেন শ্যামাকান্ত।

পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট বের করে খামে ভরতে যান বিনয়বাবু। শ্যামাকান্ত বলেন, ''মনে করে আমার ক্লার্কের টাকাটা ওর মধ্যে রেখেছেন তো? দুশো দিলেই হবে।''

আরও দুশো টাকা পকেট থেকে বের করেন বিনয়বাবু, টেবিল থেকে খামটা নিয়ে তার মধ্যে বাঁকা-বাঁকা কথা শোনাচ্ছে। সুবিমলবাবু তো সেদিন বাঁকা হাসে বলেন, ''অনেক টাকা তো এরিয়ার পাবেন বিনয়বাবু, আমাদের একদিন ভোজ খাইয়ে দেবেন।''

এসব কথা নীরবে হজম করতে হয় বিনয়বাবুকে। মামলাটা আগে জিতুন, তা হলেই ওদের মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে।

সেই বেঞ্চিখাতা জায়গায় পৌঁছে দেখলেন, শ্যামাপদ তখনও আসেননি। তিনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্যামাপদ এল। বিনয়বাবুকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ''স্যার রাজি হয়েছেন আপনার মামলা নিতে?''

বিনয়বাবু মাথা নেড়ে বলেন, ''হ্যাঁ। শুনানির জন্য মামলা তুলতে বললেন।''

শ্যামাপদ হাত নেড়ে বলে, ''তার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, শুধু একটু টাকা খরচ করতে হবে।''

শুকনো গলায় বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করেন, ''কত টাকা লাগবে?''

শ্যামাপদ হেসে উত্তর দেয়, ''লাগার তো কথা একটু বেশি টাকাই, কিন্তু আপনি সুমন্তদার লোক। আপনাকে যতটা পারি কমে করিয়ে দেব। এমনি তো পাঁচ-ছয়ের কমে হয় না। তবে আপনারটা তিনশোয় করিয়ে দেব।''

টাকা বের করার জন্য বিনয়বাবু পকেটে হাত ঢোকাতে যান, শ্যামাপদ বলে, ''এখন না, সাড়ে বারোটার সময় আমার এখানে আসবেন, আমি এখানেই থাকব।''

রইলেন তিনতলায় শ্যামাপদর ঠেকে। শ্যামাপদর আগমন ঘটল পৌনে একটার সময়। হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, ''এসে গেছেন? টাকা বের করুন। বড্ড দেরি হয়ে গেল।''

বিনয়বাবু টাকা দিতেই একরকম ছুটেই চলে গেল। যেতে-যেতে পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, ''কোথাও যাবেন না। আসছি আমি।''

বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে এল শ্যামাপদ। একমুখ হাসি নিয়ে বলল, ''হয়ে গেছে আপনার কাজ। সহজে কি হয়? নেহাত আমি বলে। শুনুন, সামনের সপ্তাহে বুধবার সকালে আপনার মামলা উঠছে। সকাল দশটায় এজলাস বসবে। আপনি কিন্তু সাড়ে ন'টার মধ্যে চলে আসবেন। আমার সঙ্গে দেখা করবেন।''

একদিন, বড়জোর দু'দিনেই মামলা শেষ। আর তাঁর জিত তো অবধারিত। শ্যামাকান্ত বাগচী রয়েছে না? যে নাকি সার্ভিস কেসে কোনওদিন হারেনি। তা ছাড়া জ্যোতিষ মতে বুধবার দিনটাও বিনয়বাবুর শুভদিন।

চার

উত্তেজনায় রাতটা প্রায় বিনিদ্র কেটেছে বিনয়বাবুর। ভোরের দিকে গিন্নির ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙল। কিছুক্ষণ ঘোরের মধ্যে থাকলেন। গিন্নি মনে করিয়ে দিলেন, ''আজ তো তোমার মামলার দিন, ভুলে গিয়েছ নাকি?''

যেন ইলেকট্রিক শক লাগল বিনয়বাবুর।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিনয়বাবুর দিকে।

সাতশো টাকা ভরে খামটা আবার টেবিলের উপর নামিয়ে রাখেন। খামটা পকেটে রাখতে-রাখতে শ্যামাকান্ত বলেন, ''এবার মামলা হিয়ারিং-এ তুলুন। দেখি সরকারি উকিলের কেরামতি।''

বাইরে এসে মহালয়াও বললেন, ''এবার মামলা তুলে দিন।''

কাতর কণ্ঠে বিনয়বাবু বলেন, ''কেমন করে মামলা তুলব ম্যাডাম?''

মহালয়া সুর করে গেয়ে ওঠেন, ''ভরসা আমার শ্যামাচরণ,'' হেসে বলেন, ''শ্যামাপদকে বলুন, সব ব্যবস্থা ও করে দেবে, ভরসা আপনার শ্যামাচরণ,'' বেশ জোরে হেসে ওঠেন মহালয়া।

তিন

পরদিন সকাল-সকাল স্নানাহার সেরে কোর্টে হাজির হয়ে যান বিনয়বাবু। ক্যাজুয়াল লিভ সব শেষ, এখন অর্নড লিভ নিয়ে চলছে। সহকর্মীরা একজন এসে শ্যামাপদকে ফিসফিস করে কী যেন বলে, ''তাই নাকি?'' বলেই লোকটার সঙ্গে দ্রুত হাঁটতে থাকে শ্যামাপদ। যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, ''তা হলে ওই সাড়ে বারোটায় আসবেন।''

বিনয়বাবু সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা থেকে একতলা নেমে আসেন। কোর্টের বাইরে এসে দাঁড়ান। সামনে একটা বটগাছ, নীচটা বাঁধানো। কয়েকজন লোক বসে আছে তার উপর। বিনয়বাবু সেখানে গিয়ে বসেন। এখন খানিকটা ভরসা পাচ্ছেন তিনি। শ্যামাকান্ত নাকি সার্ভিস কেসে কখনও হারেননি। তা হলে এবার বিনয়বাবুরও দুঃখের দিনের শেষ। মামলা জেতার পর সহকর্মীদের ব্যাঙার মুখের কথা কল্পনা করে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন বিনয়বাবু।

শ্যামাপদ বলেছিল সাড়ে বারোটায় দেখা করতে, কিন্তু বারোটা থেকেই বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে তড়াক করে খাট থেকে নেমে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে-পিছনে গিন্নি বেরিয়ে এসে স্বামীর হাতে গামছা আর ধুতি ধরিয়ে দিলেন। বিনয়বাবু প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে নিতে হবে। তারপর বাড়ি ফিরে এসে সোজা ঠনঠনে। সেখানে কালীমায়ের পায়ে পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরা। পুজোর প্রসাদ মুখে দিয়ে, পকেটে প্রসাদি ফুল নিয়ে কোর্টে যাবেন তিনি। আজ স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই উপবাস।

আদালত বসবে দশটায়। সকাল ন'টার মধ্যেই বিনয়বাবু হাজির হয়ে গেলেন কোর্টে। পৌনে দশটা নাগাদ শ্যামাপদ এল। বিনয়বাবুকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে বলেন, ''আপনার উকিল মহালয়া মিশির কোথায়? তাঁকে খবর দিয়েছেন?''

বিনয়বাবু বলেন, ''উনি জানেন।''

শ্যামাপদ বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলে, ''আচ্ছা লোক মশাই আপনি, উনি জানেন ভেবে নিয়ে

গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

বইয়ের দেশ

বইয়ের দেশ-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে:

গ্রাহক চাঁদা এক বছরে ১৫০ টাকা। বছরে চারটি সংখ্যা— জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবর।

কলকাতা: শেখ আজিজুল ইসলাম
৬ প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ৯১-৩৩-২২৬০০৭৪৫/৬৮০
ইমেল bmagsubs@abp.in

চেন্নাই: সুমন সরকার
৭৪ রয়াপেট্টাহ হাই রোড,
চেন্নাই-৬০০০১৪
ফোন ৯১-৪৪-২৮১৩১২৭৮/ ৭৯/৮৬
ইমেল suman.sarkar@abp.in

দিল্লি: কপিল ঢাল
পাইওনিয়র হাউস, চতুর্থ তল
ব্লক-এ, প্লট ৪৫-৫০
সেক্টর-১৬, নয়ডা-২০১৩০১
ফোন ৯১-১২-০৩৯৭৮০০০
ইমেল kapil.dhal@abp.in

মুম্বই: ঘনশ্যাম এস গাঁওকর
২বি, প্যারাগন কন্ডোমিনিয়াম
সেঞ্চুরি মিলের বিপরীতে,
পি বি মার্গ, ওরলি, মুম্বই-৪০০০১৩
ফোন ৯১-২২-২৪৯৬২৬০১-০৮
ইমেল ghanshyam.gaonkar@abp.in

বেঙ্গালুরু: আরিফ সিরাজ
১৪ মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক রোড,
পঞ্চম তল
বেঙ্গালুরু-৫৬০০০১
ফোন ৯১-৮০-৪১৬২১১০১
ইমেল arif.siraj@abp.in

হায়দরাবাদ: ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
পি টি আই বিল্ডিং, চতুর্থ তল
এ সি গার্ডস,
হায়দরাবাদ-৫০০০০৪
ফোন ৯১-৪০-২৩৩১৭১৪৭
৯১-৪০-২৩৩৯৬৩৬০
ইমেল bmagsubs@abp.in

জামশেদপুর:
শেখ আজিজুল ইসলাম
শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, তৃতীয় তল
বিষ্টুপুর মেন রোড
জামশেদপুর-৮৩১০০১
ফোন ৯১-৯৮৭৪৫২৪৬৬৬
ইমেল sk.islam@abp.in

ভুবনেশ্বর:
শেখ আজিজুল ইসলাম
৩২ ই, অশোকনগর,
চন্দন বিল্ডিং, তৃতীয় তল
ভুবনেশ্বর-৭৫১০০৯
ফোন ৯১-৯৮৭৪৫২৪৬৬৬
ইমেল sk.islam@abp.in

গুয়াহাটি: শেখ আজিজুল ইসলাম
জুপিতারা প্যালেস, চতুর্থ তল,
জি এস রোড, ভাঙাগড়
(রাজীব ভবনের কাছে)
গুয়াহাটি-৭৮১০০৫
ফোন ৯১-৯৮৭৪৫২৪৬৬৬
ইমেল sk.islam@abp.in

আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সরে আছেন! গরজটা আপনার, না তার? যান, তাঁকে গিয়ে খবর দিন, আমি বাগচী স্যারের ক্লার্ককে বলে দিচ্ছি। দ্রুত চলে গেলেন শ্যামাপদ। বিনয়বাবু মহালয়াকে খবর দিতে গেলেন। তাঁকে দেখেই মহালয়া বললেন, ''মনে আছে আমার। আপনি সিনিয়রকে খবর দিন।''

জজসাহেব এজলাসে ঢুকবেন দশটায়। কিন্তু তার অনেক আগেই কোর্টরুমে চলে গেলেন বিনয়বাবু। সামনের দিকে কয়েক সারি চেয়ার পাতা। সেদিকে না গিয়ে পিছনে দেওয়াল ঘেঁসে পাতা বেঞ্চিতে বসলেন। দশটার সময় একজন আরদালি এসে যে-প্ল্যাটফর্মের উপর জজসাহেবের চেয়ার পাতা, সেখানে দাঁড়াল। আর তার পিছনে-পিছনে জজসাহেব এসে হাজির হলেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে বিচারককে সম্মান দেখাল। বিনয়বাবুও উঠে দাঁড়ালেন। জজসাহেব আসন গ্রহণ করতে সবাই বসল। বিনয়বাবুও বসলেন।

এবার তালিকা ধরে নাম ডাকা শুরু হল। শ্যামাপদ বলেছে, বিনয়বাবুর মামলা আছে সাত নম্বরে।

কথা শেষ করতে পারলেন না বিনয়বাবু, শ্যামাপদ ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ''আরে, বাবরাব তো আর ঢেউ চাইতে পারবে না। বড়জোর আর একবার বা দু'বার। তারপর মামলা তুলতেই হবে। জেনে রাখুন যেদিন মামলা উঠবে, সেইদিনই ফয়সলা। বাগচীস্যারের আরগুমেন্টের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না ওরা। আপনিই জিতছেন মশাই। এখন চলুন তো, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। খেতে-খেতে সামনের দিনের ব্যাপারটা ঠিক করে নেওয়া যাবে,'' বিনয়বাবুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল শ্যামাপদ।

দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসতে-বসতে শ্যামাপদ হাঁক পাড়ল, ''দু'প্লেট কষা মাংস আর দুটো মোগলাই।''

বিনয়বাবু তাঁর উপোসের কথা বলতে শ্যামাপদ বলল, ''ভালই করেছেন, মাঝে-মাঝে উপোস করা ভাল।''

খেতে-খেতে শ্যামাপদ বলল, সামনের দিন মনে করে স্যারের ফিজের সঙ্গে ক্লার্কের টাকাটাও নিয়ে আসবেন। আর হ্যাঁ, সামনের দিন মামলা তোলার জন্য তিনশো টাকা দিয়ে যান।''

অবাক হয়ে বললেন বিনয়বাবু, ''মামলা তো আপনি! এতদিন কোর্টে ঘুরছেন আর ফুল কোর্ট জানেন না? একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মারা গেছেন, তাঁর শোকসভা। আজ সকালে কোনও মামলা হবে না। সামনের সপ্তাহে আপনার মামলা হবে।''

পরের বুধবার গিয়ে দেখলেন ল-ক্লার্কদের আদালত বয়কট চলছে। সুতরাং মামলা বন্ধ। তার পরের বুধবার আদালত বসল ঠিক সময়ে, বিনয়বাবুর মামলারও ডাক হল। কিন্তু মহালয়া উঠে দাঁড়িয়ে পরের দিনের জন্য সময় চেয়ে নিলেন।

কারণ, সিনিয়র বাগচীসাহেব অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার অন্য এক আদালত ঘরে ব্যস্ত আছেন। পরের বুধবারের আগেই আদালতে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে গেল।

এই ছুটির দিনগুলো বিনয়বাবু স্ত্রীকে নিয়ে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, তারকেশ্বর প্রভৃতি দেবদেবীর স্থানে পুজো দিয়ে এবং মানত করে বেড়ালেন। স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনের বাছতে এখন বেশ কয়েকটা করে মাদুলি, তাগা এবং রুদ্রাক্ষ। হাফ ডজন জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছেন। মামলার জয় সম্বন্ধে প্রত্যেকেই

১৯ ধপ করে বটগাছটার নীচে বসে পড়লেন বিনয়বাবু।

এটা একটা শুভ লক্ষণ। বিনয়বাবুর লাকি নাম্বার সাত। একে বুধবার, তার সঙ্গে সাত নম্বর। প্রবল উৎসাহ বোধ করলেন বিনয়বাবু। উত্তেজনায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিজের নাম কানে আসতে সংবিৎ ফিরে এল। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, মহালয়া এবং শ্যামাকান্ত দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সরকারি উকিল পরের সপ্তাহের তারিখ চাইলেন। মঞ্জুর হল তার আবেদন। কোর্টরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শ্যামাকান্ত আর মহামায়া।

ওদের পিছনে-পিছনে ছুটলেন বিনয়বাবু। শ্যামাকান্তকে বলার সাহস হল না, মহালয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, ''ম্যাডাম, তা হলে সামনের বুধবার মামলা হচ্ছে?''

দ্রুত হেঁটে যেতে-যেতে মহালয়া উত্তর দিলেন, ''শুনলেন তো সবকিছু। সামনের সপ্তাহে।''

প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন ম্যাডাম। বিভ্রান্ত বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎই কাঁধের উপর হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুরে দেখলেন শ্যামাপদ দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। ভুরু নাচিয়ে শ্যামাপদ বলল, ''কী, যা বলছিলাম, তাই হল তো? দেখলেন, কেমন ভয় পেয়ে সরকারি উকিল ঢেউ চেয়ে নিল।''

''কিন্তু আমার মামলাটা...''

উঠেই আছে।''

বেশ শখ করে হাসল শ্যামাপদ। বলল, ''দূর মশাই, এই লিস্ট সামনের দিনও থাকবে নাকি? কত ওলটপালট হবে। হয়তো দেখবেন আপনার নাম সত্তর নম্বরে চলে গেছে। সেইজন্যেই তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। টাকা দিয়ে যান, আপনার নাম আজকের মতো উপরের দিকে থাকবে।''

খাওয়া শেষ করে শ্যামাপদ উঠে দাঁড়ায়, বেয়ারা বিল নিয়ে আসতে বিনয়বাবুকে বলে, ''নিন, পে করে দিয়ে বাইরে চলুন, ওখানে কথা হবে।''

পাঁচ

আজ কোর্টে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেল বিনয়বাবুর। বাসে এত ভিড় ছিল যে দুটো বাস ছেড়ে দিতে হয়েছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তৃতীয় বাসটির দরজার হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে পৌঁনে দশটার সময় এসে পৌঁছলেন তিনি। এসে দেখেন আদালত কেমন ঠান্ডা মেরে আছে। এপাশ-ওপাশ ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে শ্যামাপদর দেখা পেয়ে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল আজ ফুল কোর্ট। বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''সেটা কী?''

প্রায় ধমকে উঠল শ্যামাপদ, আচ্ছা লোক তো আশ্বাস দিয়েছে।

পুজোর ছুটির পর আদালতে গেলেন বিনয়বাবু। মহালয়াকে পাওয়া গেল না। বার লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলেন বাগচীসাহেবও অনুপস্থিত। খানিকটা খোঁজাখুঁজি করে শ্যামাপদকে পাওয়া গেল বাঁধানো বটগাছটার কাছে। বিনয়বাবুকে দেখতে পেয়ে শ্যামাপদ নিজেই এগিয়ে এল। বিনয়বাবু কিছু বলার আগে নিজেই বলল, ''খবর পাননি?''

''কোন খবর?'' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিনয়বাবু।

''আপনার জজসাহেব তো আব্দামানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে,'' একমুখ ঘোঁয়া ছেড়ে বলল শ্যামাপদ। বিনয়বাবুর উদ্বেগ উৎকণ্ঠাভরা মুখ দেখে বোধ হয় করুণা হল ওর, বলল, ''শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কী করবেন? আপনার মামলার ফাইল চলে গেছে চিফ জাস্টিসের ঘরে। নতুন জজ না আসা পর্যন্ত কোনও আশা নেই।''

ধপ করে বটগাছের নীচে বাঁধানো জায়গাটার উপর বসে পড়লেন বিনয়বাবু। একটু পরে তাকিয়ে দেখলেন, না, তিনি একা নন। তাঁর চারপাশে তাঁরই মতো বিমর্ষ মুখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে আরও অনেক মানুষ।

অঙ্কন: মহেশ্বর মণ্ডল

পুষ্যি

দেবাশিস চৌধুরী

যেদিন থেকে মিত্তিরমশাইদের বাড়িতে কুকুরের আগমন হয়েছে, আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। গিন্নির বায়না তারও ওরকম কুকুর চাই। আরে, মিত্তিরমশাই সাহেব মানুষ। বিলিতি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তাঁর বাড়িতে কুকুর মানাবে না তো কি আমার মতো কেরানির বাড়িতে মানাবে!

গিন্নিকে বোঝায় কার সাধ্য! বলতে শুরু করল, "কোনওদিনই তো কিছু কিনে দাওনি আমায়। এই একটা মাত্র সাধ পূরণ করতে পারছ না?"

মনে মনে বললাম, কিনে দেওয়ার অবকাশ দিয়েছ? নিজেই তো টাকা নিয়ে কিনে আনো। সঙ্গে যেতে গেলে বলো, দরকার নেই। গেলেই ব্যাগড়া দেবে। তার চেয়ে বাড়ি আগলাও।

রোজকার খোঁটা আর বরদাস্ত হচ্ছিল না। ঠিক করলাম আজ কুকুর না নিয়ে বাড়ি ফিরব না।

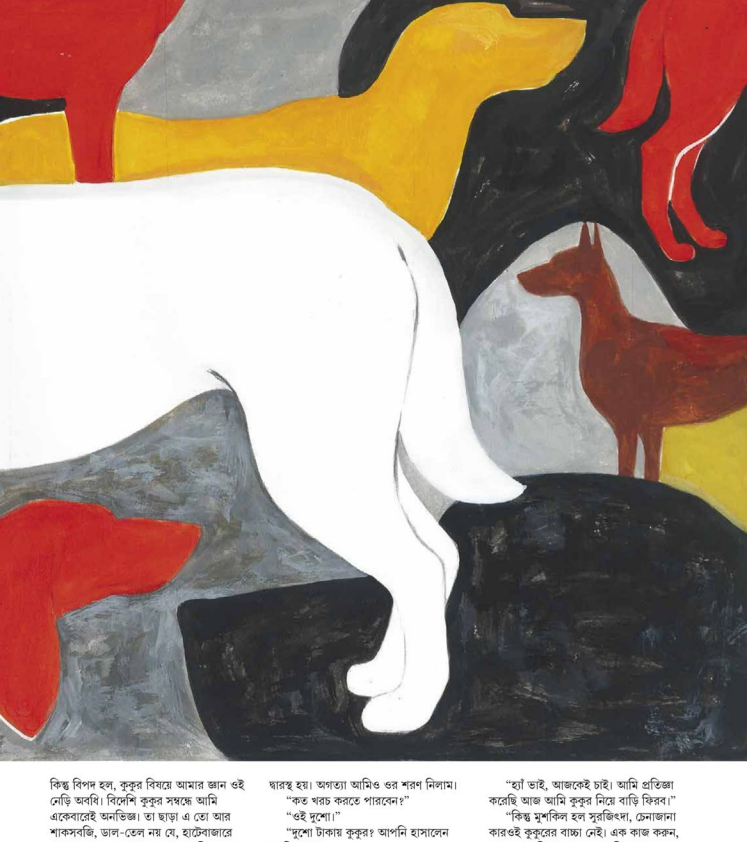

কিন্তু বিপদ হল, কুকুর বিষয়ে আমার জ্ঞান ওই নেড়ি অবধি। বিদেশি কুকুর সম্বন্ধে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। তা ছাড়া এ তো আর শাকসবজি, ডাল-তেল নয় যে, হাটেবাজারে পাওয়া যাবে— ক্যাশ ফেলো আর নিয়ে চলে এসো!

ভাবলাম, একমাত্র অফিসের নরেনই সাহায্য করতে পারবে। ওর মাথা তো নয় যেন আইডিয়ার হাট। উপায় বাতলাতে ওস্তাদ। অফিসে সাহেব থেকে চাপরাশি পর্যন্ত সবাই ওর দ্বারস্থ হয়। অগত্যা আমিও ওর শরণ নিলাম।

"কত খরচ করতে পারবেন?"

"ওই দুশো।"

"দুশো টাকায় কুকুর? আপনি হাসালেন সুরজিৎদা।"

"তা হলে কত খসাতে হবে?"

"কম করে শ-পাঁচেক।"

"বেশ তাই করব। তা, কোথায় পাওয়া যাবে?"

"আর্জেন্ট চাই নাকি?"

"হ্যাঁ ভাই, আজকেই চাই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আজ আমি কুকুর নিয়ে বাড়ি ফিরব।"

"কিন্তু মুশকিল হল সুরজিৎদা, চেনাজানা কারওই কুকুরের বাচ্চা নেই। এক কাজ করুন, কাল তো রবিবার, একবার হাতিবাগানে চলে যান। তবে সাবধান, যারা ফেরি করে তাদের কাছ থেকে কিনবেন না। তার চেয়ে নজর রাখবেন, অনেক বড়লোকেরা গাড়িতে চেপে কুকুর বেচতে আসে, তাদের কাছ থেকে কিনবেন, জাতের কুকুর পাবেন।"

পরের দিন জলখাবার খেয়েই হাতিবাগানে চলে গেলাম। নরেনের কথাই দেখলাম ঠিক। পড়শপাখির মেলা বসেছে। এধার-ওধার দেখতে দেখতে চলেছি। নজরও রাখছিলাম আশপাশে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর ওপর।

ইতিমধ্যে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, "কী দাদা, টিয়াপাখি কিনবেন?"

জবাব দিলাম না। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম, যেন পড়শপাখি বিশারদ। নানারকম কুকুর চোখে পড়ল বটে— ভোঁতামুখো, ঝাঁকড়াচুলো, ল্যাজকাটা। কিন্তু ঠিক কোন জাতের কিনতে হবে ভেবে পেলাম না। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কালো গাড়ির ভিতরে বসে সম্ভ্রান্ত এক মহিলা। কোলে একটা সাদা কুকুর। ঠিক যেমনটা নরেন বলেছিল। কাছে গিয়ে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, "বেচবেন নাকি?"

"হ্যাঁ," মহিলার ছোট্ট জবাব।

"তা, এতবড় কুকুর হঠাৎ বেচে দেবেন?"

"আমার স্বামী আমেরিকায় বদলি হয়েছেন। আমাকেও যেতে হবে। মুশকিল হল এই কুকুর নিয়ে। একে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে না।"

"কত বয়স এর?"

"ছ'মাস। আপনি একে নেবেন?"

"কত দিতে হবে?"

"কিছু দিতে হবে না। শুধু একে যত্ন করবেন। খুব ঠান্ডা," কথাক'টা বলেই ভদ্রমহিলা হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। দেখে খুব মায়া লাগছিল। একেই বলে প্রিয় জিনিস হাতছাড়া করার দুঃখ।

ঝোলটা চাপিয়ে এসেছি, একটু ঘন হলে নামিয়ে দিয়ো। আজ কিন্তু আর কিছু রাঁধতে পারব না। শুধু মাছের ঝোল আর ভাত। আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে!"

বেশ বুঝতে পারলাম আমার দুর্গতির দিন শুরু।

এবার নামকরণের পালা। যতগুলো ইংরেজি নাম মনে পড়ে, আউড়ে গেলাম। গিন্নির মনমতো হল না। খাঁটি দিশি নাম। ওর। কেলো, ভুলো, টিমি। তাও না। অবশেষে রণক্লান্ত গিন্নি নাম রাখলেন টাইগার। আর তিনি আদর করে ডাকবেন 'ঝুনুসোনা' বলে। কুকুরের আবার পোশাকি নাম আর ডাকনাম!

টাইগার। বাঃ, চেহারার সঙ্গে মানানসই নাম বটে। একটা দেড়-ফুটিয়া কুকুরের নাম টাইগার! লোকে শুধু হাসবেই না টিটকিরি দেবে। গিন্নির দেওয়া নাম, বদলানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

ঝুনুসোনার খাওয়ার টাইম, মেনু সব ঠিক করে ফেললেন গিন্নি। সকাল সাতটায় দুটো বিস্কুট সহযোগে দুধ। সকাল ন'টায় ফল। বেলা বারোটায় ভাত। বিকেল পাঁচটায় দুধ। সন্ধে সাড়ে ছ'টায় দু'খানা বিস্কুট। আর রাত সাড়ে ন'টায় দুটো হাতে গড়া রুটি আর দুধ।

এবার লাঞ্চের মেনু। সোমবার ভাত ও কিমা। মঙ্গলবার ডিমসেদ্ধ সহযোগে ভাত। বুধবার পমফ্রেট মাছ। বৃহস্পতিবার মাটন বিরিয়ানি। শুক্রবার মিক্সড ভেজিটেবল। শনিবার দই-ভাত। আর রবিবার চিকেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে,

বাড়িতে অতিথি এলে আলোচনার একটাই বিষয়বস্তু— ঝুনুসোনা। কেন্দ্রবিন্দু সেই এক— ঝুনুসোনা। অপরপক্ষ বিরক্ত হোক বা প্রসন্ন পালটাতে চাক, গিন্নি কোনও আমলই দেন না। ইতিমধ্যে ঝুনুসোনা কয়েকটা ইংরেজি শব্দ আয়ত্ত করে নিয়েছে। সিট বললে বসে। ফ্লিপ বললে শুয়ে চোখ বোজে, যেন এবার ঘুমোবে। আপ বললে উঠে দাঁড়ায়। এসব লোকেদের দেখাতে হবে তো। না হলে নাকি ক্রেডিট পাওয়া যায় না! অবশ্য ক্রেডিটটা দু'জনে ভাগ করে নেয়। একদিকে ভালই হল, বাড়িতে লোক আসা কমল। তবে তা কুকুরের জন্য নয়, গিন্নির কুকুরের প্রশস্তির ভয়ে।

একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে ন্যাড়ার পিসিমার মুখোমুখি হলাম। বুড়িকে পাড়ার সবাই গোজেট বলে জানে। যে-কোনও কলহের উনি প্রত্যক্ষদর্শী। কী করে যে কানে খবর যায় কে জানে?

"কে বাবা, সুরো নাকি?"

"হ্যাঁ পিসিমা।"

"তা অফিস থেকে ফিরছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"আর বোলো না, কী কাণ্ডটাই না আজ হয়েছে!"

"কেন কী হয়েছ?"

"তোমার কুকুরটা পম্বার ভাইটাকে কামড়েছে। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড বাবা! কী ঝাগড়াই না করে গেল তোমার বউয়ের সঙ্গে!"

পম্বা-খম্বাকে পাড়ার সবাই কুঁদুলে বলে

১৯ ছোকরাকে ধাক্কা দিয়ে গিন্নি সগর্বে গেটের দিকে এগিয়ে

কুকুরটাকে আমার হাতে ধরিয়েই ভদ্রমহিলা গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হলেন। আমার মনে তখন আনন্দ আর ধরে না। ভগবান, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! নিশ্চয় গিন্নির নয়। কোথায় ভেবেছিলাম অন্তত শ-পাঁচেক খসবে, এ তো বিনাপয়সায় আকাশের চাঁদ পাওয়া।

আর দেরি করলাম না। একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা বাড়ি। বাইরে থেকেই হাঁকতে শুরু করলাম, "ওগো শুনছ, দ্যাখো তোমার জন্য কী এনেছি।"

গিন্নি খুশি হাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কুকুর দেখে চক্ষুস্থির। "ওমা, কী সুন্দর কুকুর!" বলেই কোলে তুলে চুমু খেতে লাগলেন।

"হ্যাঁ গো, কোথায় পেলে গো?"

"পাব আর কোথা থেকে, কিনেছি। নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে। রোজই বলো তোমার কোনও সাধ-আহ্লাদ পূরণ করিনি কোনওদিন।"

"ও তো রাগের কথা। বেশ দেখতে না গো কুকুরটাকে? তুমি একটা কাজ করো তো, মাছের এসবের কোনও কিছুই কখনও আমার পেটে পড়ে না।

ফ্রিজ থরে-থরে সেজে উঠল চিকেন, কিমা, ডিম, বিট, গাজর, বিনস-এ। এসব শুধু ঝুনুসোনার জন্য। এগুলো খেতে চাওয়া শুধু নিষেধই নয়, তাকানো পর্যন্ত মানা। ঝুনুসোনার নজর লেগে যাবে। আগে টিভি-তে খবর দেখে ঘড়িতে দম দিতাম। এখন ঝুনুসোনার খাওয়ার সময় দেখে ঘড়ি মেলাই। গিন্নিকে দুধ-রুটি দিতে দেখলেই বুঝতে পারি, রাত সাড়ে ন'টা বাজে।

অবশ্য ঝুনুসোনার দৌলতে আমারও সুখাদ্য কিছু কিছু জুটছিল বই কী। যেমন, মুরগির হাড়ের ঝোল, পমফ্রেট মাছের কাঁটার ছ্যাঁচড়া। আহা, মুখ ছেড়ে খাওয়ার জোগাড় হয়। এদিকে জলের মতো পয়সা খরচ হয়ে চলেছে। একটা বড় ট্যালকম পাউডার এক সপ্তাহে শেষ। সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অফিসে যাই বাসে করে, ফিরি হেঁটে। নিজের পেছনে যতটা সম্ভব খরচ কমিয়ে, গিন্নির শখ-আহ্লাদ পূরণ করছি।

জানে। দু'ভাইকে ঝগড়ায় মাত করবে এমন বুকের পাটা নিয়ে আজ অবধি এই পাড়ায় কেউ জন্মায়নি। তাই আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ি ঢুকলাম। ঢুকেই গিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁ গো, টাইগার নাকি পম্বার ভাইকে কামড়েছে?"

"ওকে কামড়ানো বলে না। শুধু দাঁত বসিয়েছে।"

দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আমার বোধগম্য হল না।

"তা, দাঁতই-বা বসাল কেন?"

"বেশ করেছে। ছেলেটার কেমন চোর চোর চাহনি।"

বাঃ, কুকুর তো নয় যেন শার্লক হোমস। চাহনি থেকেই সাধু-চোর চিনে নিয়েছে!

আসল ঘটনাটা ধীরে-ধীরে প্রকাশ্যে এল। পম্বার ভাই এসেছিল মায়ের আহ্লাদ্যসারে চিনি ধার করতে। গিন্নি চিনি আনতে ভেতরে যেতেই ঝুনুসোনা তার পায়ে দিয়েছে কামড়। কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়ে।

শাবাশ দিতে হবে গিন্নিকে। সমান বিক্রমে লড়ে গিয়েছে দু'বোনের সঙ্গে। হারজিত কার হয়েছে জানা যায়নি। ড্র হয়েছে নিশ্চয়ই। তাই-বা কী কম গৌরবের? এ যেন ফুটবলে ভারত বনাম ব্রাজিলের খেলা।

গিন্নি ঠিক করলেন ঝুনুসোনার দাঁত শক্ত হওয়ার জন্য একটা কিছু চিবোতে দেওয়া চাই। একদিন দেখি, আমার শেভিং ব্রাশটা বেশ জুত করে বসে চিবোচ্ছে। আমি হাঁ-হাঁ করে উঠতেই গিন্নি বাধা দিলেন, "ওটা পুরনো হয়ে গিয়েছে তাই দিয়ে দিয়েছি।"

"পুরনো কোথায় হল? বেশ তো চলছিল। কাল কী দিয়ে দাড়ি কামাব?"

"একটা দিন হাতে করে ফেনা করে নিয়ো। আর তাতে না হলে জুতোর বুরুশ দিয়ে ঘষে নিয়ো।"

এর পর আর কোনও জারিজুরি খাটে না। ব্যাজার মুখে বসে বসে ওর চিবনো দেখতে লাগলাম। সোফায় গিন্নির পাশে বসে আরাম করে বুরুশের ডগাটা চিবিয়ে চলেছে। আমার দিকে চাইতেই চোখ রাঙালাম। ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। মনে মনে বললাম, "অকৃতজ্ঞ কোথাকার। আমার জন্যই আজ তোর এত আরাম।"

এক রবিবার গিন্নির বাপের বাড়ি যাওয়া ঠিক হল। বারবার বললাম ঝুনুসোনাকে ন্যাড়াদের বাড়ি রেখে যাও। তার বদলে অযথা মুখঝামটা শুনতে হল।

"নিজের সন্তান হলে ফেলে রেখে যেতে

মতো ঠ্যাং। ওর তো ভুল হওয়ারই কথা। বাড়ি গিয়ে ধুয়ে ফেলো।"

বলেই ঝুনুসোনাকে পুনরায় কোলে তুলে কী আদর, "হিসি পেয়েছিল সোনা?"

আহা কী দৃশ্য! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ট্রেনে তেমন ভিড় ছিল না। ফাঁকাই ছিল। ট্রেন ছাড়তেই মনে পড়ে গেল কুকুরের তো টিকিট কাটিনি। জানিও না কী করতে হয়। এখন কী হবে? ভয়ে হাত-পা যেন পেটের ভিতর সেঁধিয়ে গেল। হে ভগবান, যেন চেকারে না ধরে। করবে!'

অন্যায়টা আমার, নাকি গিন্নির, নাকি রেল কোম্পানির, ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে মনে পেয়াম ঠুকলাম গিন্নিকে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই দেখি গিন্নি জনম দুখিনী সীতার মতো মুখ করে বসে আছে। কারণ জিজ্ঞেস করতে জানা গেল ঝুনুসোনা সারা দিন কিছুই খায়নি। যাকে বলে রীতিমতো অন্নজল ত্যাগ। মুখে অরুচি। সুখাদ্য আর রুচছে না।

আগ বাড়িয়ে বললাম, "জন্তু-জানোয়াররা

চললেন। কোলে ঝুনুসোনা। যেন গদা হাতে দ্বিতীয় পাণ্ডব!

পারতে? তোমার শরীরে এতটুকু মায়ামমতা নেই? আহা, কেষ্টর জীব। আমি বলেই তোমার মতো পাষাণের সঙ্গে ঘর করি!"

অগত্যা সঙ্গে নিতে হল। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে যেতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ট্রেনের জন্য। ছুটির দিন ট্রেন এমনিতেই কম থাকে। গিন্নির কোলে ঝুনুসোনা।

"একটু ঝুনুসোনার বকলসটা ধরো তো, আমি শাড়িটা ঠিক করে নিই।"

গিন্নি আবার চেন বলেন না। বলেন বকলস। ঝুনুসোনার চেন ধরে এদিক-ওদিক দেখছি ট্রেন আসছে কি না। এমন সময় পায়ের পেছন দিকটায় কেমন ভিজে ভিজে ঠেকল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তিনি ঠ্যাঙ তুলে কম্মো সারছেন। রাগে গা রি-রি করতে লাগল। আশপাশের লোকেরা দেখি হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

"দেখলে, দেখলে তোমার কুকুরের কাণ্ড!"

"বেশ করেছে। তোমার যেমন ল্যাম্পপোস্টের ধরলে নিশ্চয় মোটা টাকা ফাইন গুনতে হবে। পকেটে সেরকম টাকা নিয়েও বের হইনি। শেষে জেলে না যেতে হয়।

ট্রেন থেকে নামতেই যা ভয় করছিলুম তাই হল। এক ছোকরা চেকার টিকিট চেয়ে বসল। সন্ত্রস্ত হাতে দুটো টিকিট এগিয়ে দিলাম।

"সঙ্গে এটা কী? কুকুর? এর টিকিট কোথায়?"

আমাকে ঠেলে সরিয়ে গিন্নি এগিয়ে এলেন।

"হ্যাঁ হে, ট্যাঁকের ছেলের টিকিট লাগে এ তোমাদের রেলের আইনে আছে নাকি? দুটো টিকিট দিয়েছি, এতেই সন্তুষ্ট থাকো। বেশি কপচাকপচি কোরো না।"

ছোকরাটিকে কাটিয়ে গিন্নি সগর্বে গেটের দিকে এগিয়ে চললেন। কোলে ঝুনুসোনা। যেন গদা হাতে দ্বিতীয় পাণ্ডব! পেছনে আমি। ল্যাংবোট।

রিকশায় উঠেই বললেন, "একটু গলা ছাড়তে শেখো। মুখ বুজে আর কতকাল অন্যায় হজম জড়িবুটি চেনে। নিজেদের ওষুধ নিজেরাই খুঁজে নেয়।"

ব্যস, তৎক্ষণাৎ হুকুম হল ঝুনুসোনাকে বাইরে ঘুরিয়ে আনার। অগত্যা চেন ধরে বাইরে নিয়ে গেলাম। শুরু হল ওষুধ খোঁজার পালা। ঝুনুসোনাই আমায় ট্রেনে নিয়ে চলল। যেন ট্রেনটা আমার গলাতেই বাঁধা। এ-গলি ও-গলি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এত রাস্তা চিনল কী করে কে জানে। মাঝে মাঝে থামছে, শুঁকছে। ভাবলুম বুঝি ঈপ্সিত ওষুধটি পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু না, তার পছন্দ হল না। অপছন্দের চিহ্ন রেখে গেল ডান ঠ্যাংটি তুলে। এ মোড় ছেড়ে সে মোড়। এক পথেই বার পাঁচেক ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে ঝুনুসোনা ন্যাড়াদের গেট খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটু ইতস্তত করছিলুম। না করার জো নেই। ঝুনুসোনা তখন আমায় টানছে। আর ঠিক সেই সময়ই হল লোডশেডিং। চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

সামনেই ন্যাড়াদের বাগান। ওর ঠাকুরমার

নিজের হাতে সাজানো বাগান। হেন গাছ নেই যে, বুড়ি পোঁতেনি। এখানে নিশ্চয়ই ওষুধ পাওয়া যাবে। "কে লা ওখানে," ন্যাড়ার ঠাকুরমার গলা। আমার পায়ের খসখসানি শব্দ নিশ্চয় বুড়ির কানে গিয়েছে।

"আমি," মিনমিন করে কোনওরকমে বললাম।

"তা, আমিটা কে বাবা?"

পরিচয় দেওয়ার আগেই ন্যাড়ার হাফ ডজন ভাই-বোন চোর চোর বলে চেঁচিয়ে উঠল। আহা কী কোরাস কণ্ঠ। ভাবলাম আর দাঁড়িয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কোনওরকমে ঝুনুসোনাকে কোলে তুলে মারলাম ছুট। একদম এসে থামলাম বাড়িতে। জিভ তখন আমার ঢুলে পড়েছে। বুকের মধ্যে যেন দুরমুশ পিটছে। পা দুটো মনে হচ্ছে যেন নিজের নয়।

"কী গো, ঝুনুসোনা ওষুধ পেয়েছে?"

"না।"

"বাইরে অত হট্টগোল কীসের বলো তো?"

আসল ঘটনা বলার আর অবকাশ পেলাম না। ন্যাড়ার ঠাকুরমা বাইরে থেকে হাঁক দিলেন, "ও নতুন বউমা, জানলা দরজা সব বন্ধ করে রাখো, পাড়ায় চোর পড়েছে।"

তোমার কাছে এসেছি। দ্যাখো না, আমার কুকুরটা সারাদিন কিছুই খায়নি। তোমার কাছে কোনও ওষুধ আছে নাকি?"

"কবে থেকে খাচ্ছে না?"

"আজ সকাল থেকে।"

"দাদা, কুকুররা মাঝে-মাঝে উপোস দেয়। সকাল থেকে দেখবেন আবার খাচ্ছে। ও নিয়ে ভাববেন না।"

"কিন্তু কোনও ওষুধ না নিয়ে বাড়ি ফিরলে তোমার বউদি আস্ত রাখবে না।"

"তা হলে দাঁড়ান দাদা," বলেই মিত্তিরমশাই ভিতর থেকে একটা শিশি নিয়ে এসে হাজির হলেন।

"এটা কী?"

"কাফ সিরাপ। লেবেলটা ছিঁড়ে দিন। এটাই বউদিকে দিয়ে দেবেন। বলবেন খিদের টনিক। বিশ্বাস করুন কোনও ক্ষতি হবে না।"

হাতে নেন মমত পেলাম। তাই নিয়ে এসে গিন্নির হাতে তুলে দিলাম। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, পরের দিন থেকেই ঝুনুসোনার আবার যথারীতি খিদে ফিরে এল। আবার সেই কিমা, ডিম, চিকেন, মিক্সড ভেজিটেবল।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে অফিস থেকে ফেরার পথে বড়সাহেবের গাড়িতে লিফট পেয়ে গেলাম। গলির মুখে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমতা আমতা করে বললুম, "স্যার, এতদূর যখন এলেন একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন না? আবার আমার কবে সৌভাগ্য হবে? এত কাছে যখন এলেন...."

বড়সাহেব কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। হাতঘড়িটা একবার দেখে বললেন, "ঠিক আছে চলো, তবে বেশিক্ষণ বসব না কিন্তু।"

মনে তখন আমার আর-এক ভয় চেপে বসল। নিয়ে তো যাচ্ছি। অচেনা লোক দেখে ঝুনুসোনা আবার কিছু করে না বসে। তা হলে চাকরি একেবারে নট।

বড়সাহেবের সঙ্গে গিন্নির পরিচয় করিয়ে দিলাম। ঝুনুসোনার পরিচয় দিতে দেরি হল না। গিন্নি সগর্বে কোলে করে নিয়ে এসে হাজির। বড়সাহেব দেখলাম ঝুনুসোনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। তারপর আমাদের অবাক করে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। যেন সাধক রামপ্রসাদ মা কালী দর্শন করেছেন। কান্নার হেতুটা বুঝতে পারলাম না। পারলে অন্তত সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। গিন্নি বেগতিক দেখে কেটে পড়েছেন। কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভাবলাম, এই পরিস্থিতিতে তালে তাল মিলিয়ে কাঁদাটাই হয়তো শ্রেয়। কিন্তু কান্না কী কারণে আসে? জীবনে যতগুলি দুঃখের ঘটনা ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করলাম। কান্না এল না। ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার মায় তাপস পালের দুঃখের সিন মনে করে কাঁদার চেষ্টা করলাম। তাতেও কোনও লাভ হল না। অগত্যা যথাসম্ভব কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইলুম।

বড়সাহেবের কান্নার বেগ তখন কমে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে লাগলেন। নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "জানো সুরজিৎ, তোমার কুকুরটার মতো দেখতে অবিকল একটা কুকুর ছিল আমারও। বড় আদরের ছিল। মাস চারেক হল মারা গিয়েছে। বড় মায়ার জিনিস এরা। যত্ন কোরো। সন্তানের মতো দেখো।"

"আমরা তো স্যার নিঃসন্তান। এই কুকুরটাকেই সন্তানের মতো দেখি। যতটা সম্ভব যত্ন করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মাইনে তো আপনার অজানা নয় স্যার। এই টাকায় এই বাজারে নিজেদেরই কুলোয় না ঠিকমতো, কুকুরের যত্ন কেমন করে করব স্যার!"

"আর কত টাকা হলে তোমার চলবে?"

১০ বড়সাহেবের কান্নার বেগ তখন কমে এসেছে।

"না পিসিমা, ভয়ের কিছু নেই। টাইগারকে ছেড়ে দিচ্ছি। এই টাইগার, ছু ছু।"

ঝুনুসোনার ঋণ শোধ করার পালা এবার। ঘেউ ঘেউ করে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে দিল। দাপিয়ে বেড়াতে লাগল সারা বাড়ি।

"হ্যাঁ গো, কুকুরটার ওষুধের একটা ব্যবস্থা করো না।"

"কোথায় পাওয়া যায় কুকুরের ওষুধ কে জানে। তার চেয়ে মোড়ের মাথার বিমল ডাক্তারের দুটো পুরিয়া নিয়ে আসি।"

"তোমার কথা শুনলে না, সত্যি গা-পিত্তি জ্বলে যায়। বলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে মানুষই ঠিক হয় না তায় আবার কুকুর। মিথ্যেই কি আমি পই-পই করে বলি লোকের সঙ্গে মেশো। তা নয় বাড়ি টু অফিস আর অফিস টু বাড়ি। যাও না একবার মিত্তিরবাবুর বাড়ি, যদি কোনও ওষুধ-টুষুধ পাও।"

অগত্যা আবার বেরোতে হল। চোর-চোর রবটা তখন আর নেই। কারেন্টও এসে গিয়েছে। যে-দলটা চোর ধরতে বেরিয়েছিল, তারা নিজের নিজের ঘরে ফিরে এসেছে।

মিত্তিরবাবুর বাড়ির কলিং বেল বাজাতেই স্বয়ং মিত্তিরমশাই দরজা খুলে দিলেন। একগাল হেসে বললেন, "আসুন দাদা, ভেতরে আসুন। বসুন।"

"না ভাই বসব না। একটা বিশেষ প্রয়োজনে

"হাজারখানেক স্যার।"

"হুম। ঠিক আছে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

পরের দিন টিফিনের পরেই বড়বাবুর কাছে ডাক পড়ল। খিটখিটে লোক। আমাশায় ভুগে ভুগে আরও খিটখিটে হয়ে গেছেন। মুখখানা সব সময় আমড়ার আঁটির মতো করে বসে থাকেন। নিশ্চয় আমার কাজে ভুল হয়েছে। মনে মনে দাঁতখিঁচনি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই গেলাম।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই হাতের ইশারায় বসতে বললেন। মুখ পানে ভর্তি। পেছনের জানালা দিয়ে একমুখ পিক ফেলে বললেন, "একটা সুখবর আছে সুরজিৎ। কী খাওয়াবে বলো?"

"সুখবরটা কী বড়বাবু?"

"তোমার হাজার টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। তাই তো আমি বারবার বলি, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

ভদ্রলোক ইদানীং গীতা ধরেছেন। প্রত্যেক কথার খেই ধরে গীতার শ্লোক আওড়ান। আমার তখন আনন্দে ডিগবাজি দিতে ইচ্ছে করছে। কোনওমতে ইনক্রিমেন্টের চিঠিটা বড়বাবুর হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। চিঠিটা কয়েকবার কপালে ঠেকিয়ে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানালাম।

বেঁচে থাক বাবা ঝুনুসোনা।

অঙ্কন: প্রসেনজিৎ নাথ

জোনাকিদের বাড়ি

স্ম র ণ জি ৎ চ ক্র ব র্তী

১৭

পূর্বানুবৃত্তি: বাবার জ্বরের খবর পেয়ে বাড়িতে যাওয়ার পর নানা পুরনো কথা মনে পড়তে লাগল পুশকিনের। স্ত্রী স্মিতা মারা যাওয়ার পর ওর জীবনটাই অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। পুশকিন দেখে, নোঈ এসেছে। একটু পরেই আসে স্মরণ। পুশকিনের বাবা নোঈ আর স্মরণকে বলেন তাদের দুপুরের খাওয়া খেয়ে যেতে। সোনাঝুরির প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা হয় পুশকিন, স্মরণ আর নোঈয়ের মধ্যে। পেখমের বিয়ের ব্যবস্থা করছেন তার মা আর মিতুকাকিমা। কাজুর কথা ভাবতে ভাবতে সারা রাত ভাল করে ঘুমোতে পারেনি পেখম। ভোরে ঠাকুরদার ঘরে গিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলে, "মা আমার বিয়ে দিতে চায় জোর করে।" পেখমকে ঠাকুরদা তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু বলাইয়ের ব্যর্থ প্রেমের গল্প শোনাতে থাকেন। প্রেম করতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছিল বলাইকে। জেলও খাটতে হয়েছিল।

ঠাকুরদা বলে যেতে লাগলেন, "জেল থেকে বেরিয়ে কেমন পাগলাটে হয়ে গিয়েছিল বলাই। ওই শিরীষ গাছের তলায় বসে থাকত। ওর মা ছিল না ছোট থেকেই। এই সবের পর-পরই বাবাও মারা যায়। দাদারা এই সুযোগটাই নিয়েছিল। পাগল ভাইকে বের করে দিয়েছিল বাসা থেকে। আমাদের ছোট্ট বহরিয়া গ্রামে ঘুরে বেড়াত বলাই। রাতের জ্যোৎস্নায় একা-একা চিৎকার করত। আর বলত, 'প্রেম করিস না, ভালবাসিস না। ভালবাসা নরক! আমি সেই নরকের শয়তান!'"

ঠাকুরদা টানা গল্পটা বলে থেমেছিলেন। তারপর তাকিয়েছিলেন পেখমের দিকে।

পেখম কী বলবে বুঝতে না পেরে তাকিয়ে ছিল পালটা! ভাবছিল, কেন এই গল্পটা ওকে বললেন ঠাকুরদা!

পাগল-পাগল লাগছে পেখমের। মাথার ভেতর ঘিলু ফুটছে! মনে হচ্ছে এমন করে তো চলতে পারে না। বাড়ি থেকে একা বেরোতে দেওয়াই হচ্ছে না ওকে। কাজুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না কিছুতেই! কাজুকে যে এসব বলবে তারও উপায় নেই।

ঠাকুরদা যেন ওর মনের কথাই বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, ''আমি যেটুকু জীবন দেখেছি, তাতে প্রেম খুব বিজ্ঞ কাজের জিনিস নয় রে মা! কষ্ট ছাড়া আর কিছু দেয় না। তা ছাড়া সমাজের নিজস্ব একটা রেল লাইন আছে। জীবনে সুরক্ষার একটা ব্যাপার আছে। প্রেম কিন্তু সব কিছু সামলে দিতে পারবে না পেখম!''

পেখমের চোখে জল এসে গিয়েছিল আবার। ঠাকুরদা এমন বলছেন! ও এত ভরসা নিয়ে এল ঠাকুরদার কাছে, সেখানে ঠাকুরদা ওকে এমন করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন!

ঠাকুরদা বলেছিলেন, ''আমি বলাইকে দেখেছি। ঝিকুকে দেখেছি। তুই পাগলি এসবে ঢুকিস না!''

পেখম কাঁপা গলায় বলেছিল, ''আমি পারছি না ঠাকুরদা। আমি কাজুকে ছাড়া...''

ঠাকুরদা উঠে গিয়ে হিটারটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ''একদিন আজকের কথা ভাবলে হাসি পাবে তোর। আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত পেখম। উদ্ভাস্ত বলে আরও জানি টাকাপয়সার মূল্য। তোর মাকে আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না রে। জীবনের সব কিছুর একটা মাত্রা আছে। এই ব্যাপারটা আমার মাত্রার বাইরে। আমায় তুই ক্ষমা করে দিস মা!''

পেখম যন্ত্রের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল শুধু।

ঠাকুরদা বলেছিলেন, ''আমার প্রথমেই ভুল হয়েছিল কাজুকে এই বাড়িতে পড়ানোর জন্য বলা। স্নেহ নিম্নগামী। তোর প্রতি সেই স্নেহের বশবর্তী হয়ে আমি যা করার করেছিলাম। বুঝিনি তুই ক্রমশ এতটা মায়ায় জড়িয়ে যাবি! আমার ভুল হয়ে গিয়েছে মা। আমায় ক্ষমা করিস!''

পেখম ধীরে-ধীরে ফিরে এসেছিল নিজের ঘরে। ঠাকুরদাকে তো ও স্পষ্ট করে কিছুই বলল না, তার আগেই ঠাকুরদা ওকে এসব বলে দিলেন! কেন? কী করে বুঝলেন সব ঠাকুরদা? মা কি কিছু বলে রেখেছে?

নিজের ঘরে ফিরে এসে পাথরের মূর্তির মতো জানলার দিকে তাকিয়ে বসেছিল পেখম। সারা শরীরে কেমন একটা অসাড় ভাব আসছিল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকলেও আসলে দেখছিল না কিছু। শুধু বুঝতে পারছিল খুব ধীরে একটা মৃত্যুর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ওর। বুঝতে পারছিল প্রেম আসলে স্বপ্ন দেখার মতো একটা ব্যাপার। যে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সে-ই জানে। যারা এর মধ্যে থাকে তারাই জানে। সেই দু'জন জানে। মাত্র দু'জন জানে।

''তোর কী হয়েছে বল তো?'' মিতুকাকিমা পেখমের থুতনি ধরে ওর দিকে ফেরাল।

পেখম কষ্ট করে একটু হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না কিছুতেই।

মিতুকাকিমা বলল, ''তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর মা, কাকিমা তোকে ডাকছে।''

আচমকা মাথাটা গরম হয়ে গেল পেখমের। আচ্ছা নাছোড়বান্দা মহিলা তো! বলছে যে, ওর ভাল লাগছে না! সেখানে এভাবে টানাটানি কেন? সব বিষয়ে কি এমন করে ওকে বাধ্য করা হবে? একটু দোকানের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানেও মায়ের আপত্তি! কী করবে ও দোকানে ঢুকে! যে-পাত্রের সামনে ওর বসারই ইচ্ছে নেই, সেখানে শাড়ি দেখে কী করবে? তা ছাড়া যদি ও দেখেও শাড়ি, কিছু পছন্দও করে, তা হলেও কি মা সেটা কিনে দেবে ওকে? এই যে বাবা-মায়েদের একটা ভাব থাকে, আমরা তোমায় স্বাধীনতা দিচ্ছি, কিন্তু সবটাই তো আসলে মিথ্যে! বাবা-মায়েরা সবটাই নিজেদের মর্জিমতো করিয়ে নেয়। সেটা ভাল লাগে না পেখমের। কাজু বলে জীবনের সব কিছুতে রাজনীতি আছে। পাওয়ার স্ট্রাগ্‌ল আছে। দিন কে দিন সেটাই সত্যি মনে হচ্ছে ওর। বুঝতে পারছে বাবা-মা ও সন্তানের সম্পর্কের ভেতরেও একটা ক্ষমতার, অন্যকে বশ্যতা স্বীকার করানোর দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে!

''কী রে?'' মিতুকাকিমা আবার বলল।

পেখম আচমকা এবার ঘুরে দাঁড়াল মিতুকাকিমার মুখোমুখি। তারপর শান্ত কিন্তু কঠিন গলায় বলল, ''আমি কি অন্য ভাষায় কথা বলছি কাকিমা? যাব না আমি। ভাল লাগছে না। তুমি মাকে বলো, আমি যাব না ভেতরে।''

কাকিমা ধতমত খেয়ে গেল একদম। কী বলবে যেন বুঝতে পারল না। মুখ লাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঠোঁট নাড়াল, কিন্তু কোনও শব্দ বেরিয়ে এল না। তারপর নিজের মনে মাথা নেড়ে ঢুকে গেল দোকানে।

পেখমের খারাপ লাগল। কিন্তু ওর কিছু করার নেই। মা যা শুরু করেছে, আর কিছু সহ্য করতে পারছে না। ও জানে এই যে মিতুকাকিমাকে এরকম বলল, এতে ওর বিপদ বাড়বে বাড়িতে। কিন্তু আর নিতে পারছে না ও। মানতে পারছে না কিছু। বাড়িতে ওকে খেতে-পরতে দেয় বলে কি ওর ওপর বাবা-মা এমন জুলুম করতে পারে! আর বাবা! বাবা এটা মানছে কী করে? পেখম বাবার সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাবা কেমন যেন এড়িয়ে যাচ্ছে ওকে। কিছুতেই সামনে আসছে না, কথা বলছে না। পেখম বুঝতে পারছে না, কী হতে যাচ্ছে সামনে। এমনকী, গত এক সপ্তাহ কলেজেও যেতে দেয়নি মা। মায়ের কথা হল ছেলের বাড়ি থেকে এসে কথা বলে যাক, তারপর সব হবে।

এই ব্যাপারটাতেই আপত্তি আছে পেখমের। এত বছরের ওর জীবন, ওর পড়াশোনা, সবটা আটকে যাবে কোথাকার কে এক হরিদাস পালের জন্য। এটা কি হতে পারে। আর বাবাই-বা এমন করে এইসব অন্যায় কথা মেনে নিচ্ছে কেন?

পাগল-পাগল লাগছে পেখমের। মাথার ভেতর ঘিলু ফুটছে! মনে হচ্ছে এমন করে তো চলতে পারে না! বাড়ি থেকে একা বেরোতে দেওয়াই হচ্ছে না ওকে। কাজুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না কিছুতেই। কাজুকে যে এসব বলবে তারও উপায় নেই। নয়নাও আসছে না কেন বুঝতে পারছে না। পেখমের মনে হচ্ছে সবাই মিলে ওকে চারিদিক থেকে বেঁধে রেখেছে!

''পেখমদি, তুমি এখানে?'' আচমকা একটা চেনা গলা পেয়ে ঘুরে তাকাল ও। আরে, বিজন এখানে কী করছে এই সন্ধেবেলা?

গত ক'দিনের ভেতর পেখমের এই প্রথম ভাল লাগল। মনে হল যেন বন্ধুর মুখ দেখল শ্মশানের মধ্যে। একরত্তি একটা ছেলে, যাকে সেভাবে কোনওদিন পাত্তা দেয়নি, আজ তাকে দেখেই মনে হল সমুদ্রে ভাসমান একখণ্ড কাঠ!

পেখম বলল, ''এই দোকানে এসেছি। তুই এখানে বিজু? কী ব্যাপার?''

''আরে, বোলো না, আমাদের একটা পার্টির মিটিং আছে। তাই এসেছি কাজুদার সঙ্গে।''

"কাজুদা এসেছে!" পেখম না চাইতেও কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে! সারা গায়ে কদম ফুটে উঠল যেন!

"হ্যাঁ তো," বিজন বলল, "আমায় তো আসতে দিতেই চায় না। শেষে আমি জোর করে এলাম। আসলে আমাদের পার্টির ব্যাপার তো। আমি দূরে থাকি কেমন করে! বিমলদা বলেছেন আমাদের আরও তৈরি হতে হবে! না হলে..."

"কাজুদা কই রে?" পেখম এদিক-ওদিক তাকাল।

এই জায়গাটায় বেশ ভিড়। তা ছাড়া আজ শুক্রবার। আশপাশের কারখানাগুলোর উইকলি পেমেন্টের দিন। মানুষজন বাজারহাট করে আজ। তাই ভিড়ে জায়গাটা গিঁট পাকিয়ে আছে সামনে। সন্ধে ঘন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে লোকজন আরও বাড়ছে!

"এইখানেই তো কোথায় ছিল!" বিজন ঘুরে ভিড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

পেখম সামান্য এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। এত লোক! তার মধ্যে কোথায় আছে কাজু! ও দ্রুত পৃষ্ঠা ওলটানোর মতো করে মানুষের মুখগুলোকে পালটে দেখতে লাগল। কাজু কই? দেখা পেলে দ্রুত যাবে ওর কাছে। কাজুকে যে বলতে হবে সব কিছু। ওর সঙ্গে কী হচ্ছে, সেটা যে জানাতেই হবে।

বিজন আরও কিছু বলত, কিন্তু কিছু একটা দেখে থমকে গেল। পেখম বুঝল ওর পেছনে কাউকে দেখেছে বিজন। ও মুখ ঘোরাল। দেখল মা বেরিয়ে এসেছে দোকান থেকে। মুখটা টকটকে লাল হয়ে আছে রাগে।

"তুই... তুই... মিতুকে কী বলেছিস?" মা যেন কাঁপছে! যেন ভুলে গিয়েছে ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে!

মা আবার বলল, "এত বাড় বেড়েছিস? এতটা বাড়? ভেতরে চল। চল ভেতরে। মিতুর কাছে ক্ষমা চাইবি চল!" মা এগিয়ে এসে পেখমের হাতটা ধরতে গেল। আর ঠিক তখনই পেখম শুনতে পেল বিজন যেন অস্ফুটে বলল, "কাজুদা!"

পেখম কথাটা শোনামাত্রই মায়ের বাড়ানো হাত থেকে সরিয়ে নিল নিজের হাত। তারপর এক ঝটকায় ঘুরে তাকাল রাস্তার ওই পারের দিকে। দেখল ভিড়ের ভেতর সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাজু।

পেখমের যে কী হল, ও নিজেও যেন বুঝতে পারল না। মায়ের রাগ, মানুষের ভিড়, সব কিছু যেন নিমেষে মুছে গেল ওর সামনে থেকে! ওপাশ দিয়ে আসা রিকশার সারিকে তুচ্ছ করে দৌড়ে গেল অন্য পারে।

"কাজুদা!" পেখম আর্তনাদের মতো করে ডাকল।

কাজু সামান্য চমকে তাকাল ওর দিকে।

"কাজুদা আমি... আমি তোমায়..."

পেখমের সমস্ত কথা একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইল যেন। কিন্তু কোনও কিছু ঠিকমতো বলার আগেই দেখল কাজু কেমন যেন শক্ত হয়ে গিয়েছে।

কাজু স্থির চোখে একবার পেখমকে দেখল। তারপর দ্রুত সাইকেলে উঠে পড়ল। পেখমকে কিছু বলতে না দিয়ে ভিড়ের ভেতর সাইকেলের বেল বাজাতে-বাজাতে যতটা দ্রুত সম্ভব অদৃশ্য হয়ে গেল।

পেখম তাকিয়ে রইল ভিড়ের দিকে। কাজু কথা বলল না ওর সঙ্গে! এভাবে চলে গেল! কেন গেল? কী চায় কাজু? কী শুনেছে ও যে, এমন করে চলে গেল?

চারদিকের ভিড় আর হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল পেখম। আর অবাক হয়ে দেখল, ওর সামনে থেকে আস্তে-আস্তে ঝাপসা হয়ে মুছে যেতে শুরু করেছে মানুষজন, গাড়িঘোড়া, দোকান-বাজারসমেত সকল দৃশ্যপট!

এক নির্জন, জনহীন প্রান্তরে যেন দাঁড়িয়ে রইল পেখম। যেন দেখতে পেল বহু বছর আগের এক গ্রামে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এক তরুণ। বলছে প্রেম নেই! আর প্রেম নেই কোথাও!

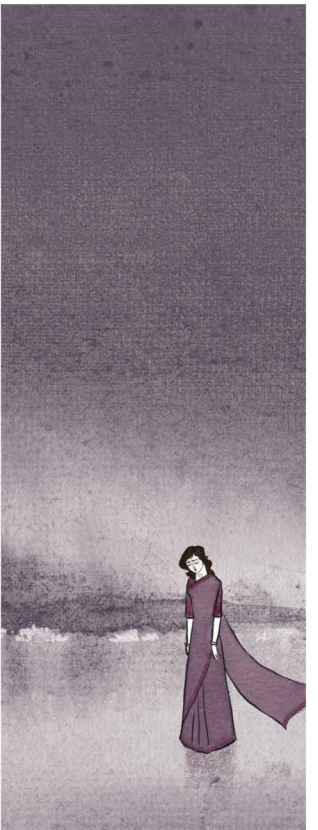

রিতুদা মাহিরকে কোনও খারাপ কাজে পাঠায় না! নানা ব্যবসা আছে রিতুদার। সে সব জায়গায় টাকা কালেকশনের কাজটা করতে হয় ওকে। কেউ দিতে দেরি করলে একটু কড়াভাবে বলতে হয়। সেটা অবশ্য পারে না ও।

আঠারো

মাহির

"আমি আজ আপনাদের সামনে ইতিহাস থেকে উঠে আসা এমন এক জিনিস বিক্রি করতে এসেছি, যার বয়স চার হাজার বছরের বেশি! রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে সিন্ধুসভ্যতার খননকার্যে উঠে এসেছিল অসাধারণ এই বস্তুটি! আর কী তার ইতিহাস! মহামতি সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার হয়ে তৈমুর লং, তারপর সেই বংশের জাহাঙ্গির হয়ে টিপু সুলতান থেকে নেপোলিয়নের হাত ঘুরে সেটি এসেছে বাচ্চা হিটলারের হাতে। আর সেখানেই খোয়া গেছিল, বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক ও নেত্রীর ছোট্ট বয়সের একমাত্র সঙ্গী ছিল বস্তুটি। তাদের সেই শিশু অবস্থার মনন নির্মাণের সঙ্গী ছিল এটি। মাটি, পাথর, কাঠ, ব্রোঞ্জ পেরিয়ে কাচ হয়ে এখন প্লাস্টিক ও পলিমারে এসে থেমেছে বস্তুটি। ইতিহাসের ছোট্ট এটিম্লার মতো আপনার বাচ্চারও মনখারাপের, একাকিত্বের আর ভালবাসার সঙ্গী এই বস্তু। চিলেকোঠায় আটকে থাকা অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের সেইসব দিনগুলোয় তার পাশে এই বস্তুটি যেমন ছিল, তেমনই আপনার সন্তানেরও নিভৃত সময়ের সঙ্গী হওয়ার সমস্ত যোগ্যতাই আছে তার। প্রাচীন সময় থেকে বর্তমান সময়ে আসার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিশু-কিশোরদের একমাত্র সঙ্গী এই বস্তুটিকে আজ এই বনগাঁ লোকালে আমি আপনাদের সামনে এনে হাজির করেছি। এর মাধ্যমে আপনি আপনার স্নেহের সন্তানের হাতে শুধু মনোরঞ্জনের বস্তুই তুলে দিচ্ছেন না, তুলে দিচ্ছেন হামুরাবি থেকে বর্তমান সময় অবধি বয়ে আসা এক ঐতিহ্যের অংশকে। তাই আমার ঝোলার স্টক থাকতে-থাকতে আপনারা সংগ্রহ করে নিন 'ডায়মন্ড টয়েজ়'-এর একমাত্র খেলনা ব্যাঙের বাজায় কত্তাল! সম্রাট আকবর যেমন তাঁর প্রিয় সেখুবাবার হাতে তুলে দিতেন, তেমন আপনিও আপনার সন্তানের হাতে তুলে দিন সিন্ধু নদ থেকে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়া এক ইতিহাসের টুকরো! এই ব্যাঙ, যা বিজ্ঞানের বইয়ে বুঝো মেলানোস্টিকউস নামে আপনাদের জ্বালিয়ে এসেছে, তাকে একবার আপন করে নিয়ে নিজেকে ও নিজের প্রিয় সন্তানকে করে তুলুন ইতিহাসের অংশ! আর কেউ আপনাকে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে এমন ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেবে না। তাই দেরি না করে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে ইতিহাসে নাম ওঠাতে তৎপর হোন।"

মাহির হাঁ হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। দুপুরের বনগাঁ লোকাল। গাড়ি দুর্গানগর ছেড়ে গিয়েছে। ভিড় যা ছিল মোটামুটি নেমে গিয়েছে মধ্যমগ্রাম স্টেশনে। এখন যারা আছে, সব বসেই আছে। সেখানে এই লোকটি সুর করে একটানা বলে গেল এসব! এসব কী?

লোকটাকে দেখল মাহির। বেঁটে, শুকনো চেহারা। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে। জামাকাপড়ও ময়লা। কাঁধে একটা ঝোলা। তাল্লিমারা। আর হাতে প্লাস্টিকের কাচ হয়ে এখন। একটা সবুজ রঙের ব্যাঙ। ব্যাঙের সামনের পা দুটোতে করতাল লাগানো। খেলনার নীচের একটা 'ইউ'-আকৃতির লিভারে চাপ দিলে ব্যাঙের পা দুটো তালির মতো করে কর্তালটা বাজায়!

খুবই সাধারণ খেলনা। মাহির বহুবার দেখেছে। কিন্তু সেটাকে যে কেউ এভাবে বিক্রি করতে পারে, সেটা ওর চিন্তাতেও ছিল না!

মাহির দেখল সবাই লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ-কেউ হাসছেও। কিন্তু লোকটার তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলেই চলেছে এসব জড়ানো-প্যাঁচানো কথা!

মাহির শুনল একজন তো বেশ চেঁচিয়েই বলল, "মালটাকে ট্রেন কাত করে ফেলে দে তো!"

কিন্তু লোকটা পাত্তাও দিল না! সে কর্তাল বাজাতে-বাজাতে এসব বলে চলেছে!

"মালটা এখানেও এসে জুটেছে?" পাশ থেকে টিটি চাপা গলায় বলল।

"মানে?" মাহির তাকাল টিটির দিকে।

"আরে, নকুর সেই পাগলা দাদটা! বলেছিলাম না, লেক মার্কেটে একজনকে কেলিয়েছে বলে পুলিশ ধরেছিল! রিতুদা তারপর ছাড়ায়। সে মাল দেখছি বই ছেড়ে এখন খেলনা ধরেছে!"

মাহির অবাক হল। লোকটা যা বলছে সেটা কতদূর সত্যি তা জানার মতো বিদ্যে ওর নেই, কিন্তু লোকটা নিজে এত কিছু জানল কী করে? আর সামান্য একটা খেলনা কেউ যে এমন করে বিক্রি করতে পারে, সেটাই তো ভাবতে পারে না ও!

লোকজন হাসাহাসি করলেও মাহির দেখল চারজন কিনল খেলনাটা!

"এই যে ভাই, এদিকে আসবেন তো!" পাশ থেকে তুয়াদি হাত তুলে ডাকল খেলনাওয়ালাটাকে।

মাহির ঘাবড়ে গেল। তুয়াদির আবার কী হল? ও এসব কিনছে কেন?

মাহির চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হল তুয়াদি? তুমি কী করছ?"

তুয়াদি বিরক্ত হয়ে তাকাল, "খেলনা কিনব। কেন? তোর আপত্তি আছে?"

মাহির চুপ করে গেল। ও কেন আপত্তি করবে! ও আপত্তি করার কে! কিন্তু তুয়াদি নিজে বিয়ে করেনি। ভাইদের সংসারে থাকলেও আলাদাই খায়। তা হলে কার জন্য কিনবে এসব? তুয়াদি সেলাই করে ভালই রোজগার করছে এখন! কে এক লোক নাকি জামাকাপড় এক্সপোর্ট করে এমন কিছু ছোট কোম্পানির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তারা ভালই কাজ দিচ্ছে। এমনকী, সেদিন তো মাহিরকে বলছিল রিতুদাকে বলে একটা ঘর দেখে দিতে। গেঞ্জির ফ্যাক্টরি দেবে।

"গেঞ্জি!" মাহির খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, "তুমি ফ্যাক্টরি দেবে? বিক্রি করবে কোথায়?"

"তোর জেনে কাজ কী! আমার নিশ্চয় কানেকশন আছে! আমি তো ছাগল নই যে, এমনি-এমনি জায়গা দেখছি!"

মাহির আর কথা বাড়ায়নি। আসলে আজকাল কী হয়েছে তুয়াদির কে জানে! আগে তো এমন করত না! কয়েকমাস যাবৎ ওর সঙ্গে দেখা হলেই কেমন একটা ঝাঁঝি মেরে কথা বলে। চিমটি কেটে উত্তর দেয়। যেন পছন্দ করছে না। আবার নিজের যা কাজ ওকেই ডেকে করায়। মাহির কথা না বললে রাগ করে। ওর গায়ে আচমকা হাত দেয়। এসব কী করছে তুয়াদি? কিছুই বোঝে না মাহির। ও যথাসম্ভব এড়িয়ে থাকে।

কিন্তু মা রাগ করে। বলে, "তুয়া আছে, তাই তোর ভাইটা বেঁচে আছে। আমি কাজে বেরোই। তুইও চটাই করে বেড়াস। তুয়া না থাকলে তোর ভাইকে কে দেখবে? ও যা বলে করে দিবি। আমায় যেন আর বলতে না হয়!"

মা আজকাল সারাক্ষণ রেগে থাকে। ভাইয়ের জন্য যে মায়ের দুশ্চিন্তা হয় সেটা ও বোঝে। কিন্তু তার সঙ্গে ও যে রিতুদার হয়ে এটা-ওটা কাজ

করছে সেটা মা মানতে পারে না। ভাইয়ের ডায়ালিসিস শুরু হয়েছে। রিতুদাই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। তাই মা খুলে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে মায়ের একটা আশঙ্কা আছে যে, মাহির খারাপ পথে চলে যাচ্ছে!

রিতুদা কিন্তু মাহিরকে কোনও খারাপ কাজে পাঠায় না। নানা ব্যবসা আছে রিতুদার। সে সব জায়গায় টাকা কালেকশনের কাজটা করতে হয় ওকে। কেউ দিতে দেরি করলে একটু কড়াভাবে বলতে হয়। সেটা অবশ্য পারে না ও। মাহির কাউকেই কড়াভাবে কিছু বলতে পারে না। সেই কাজটা করে দেয় টিটি।

মাঝখানে টিটি যে নিজের অটোটা চালাত, সেটা আর চালায় না। ভাড়ায় একটা লোক চালায় এখন। মাস গেলে একটা টাকা নেয় টিটি। ওরা বলে বাতচিৎ। টিটি নিজে এখন রিতুদার কাছেই সারাক্ষণ কাজ করছে।

টিটি ওকে বলেছে, "দ্যাখো কাকা, তুমি হলে হাওয়া-ভরা মাল! শরীরটাই বড়। মুখ খুললে একদম ন্যাদাবোদা, চার অক্ষরের বোকা! কেউ টাকা না দিলে বা লেবাররা ট্রাবল করলে তোকে কিছু বলতে হবে না। আমি যা ফাটাবার ফাটাব। তুই শুধু বিশাল চেহারাটা নিয়ে ভুরু কুঁচকে, রাগী মুখ করে তাকিয়ে থাকবি! সাইলেন্ট সিনেমা হয়ে থাকবি কিন্তু। বুঝলি! একদম দাতা কর্ণের মতো মুখ খুলবি না! বুঝেছিস?"

মাহির কথা শোনে টিটির। মুখ খোলে না। চোখমুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

"ক'টা দেব দিদি?" লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

"দুটো," তুয়াদি কুড়ি টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিল সামনে।

লোকটা দুটো খেলনা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে দিল। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট আসছে সামনে।

"নে ঢুকিয়ে রাখ," তুয়াদি মাহিরের দিকে বাড়িয়ে দিল প্যাকেটটা।

হাতের ব্যাগটায় খেলনাটা ঢুকিয়ে ব্যাগটা কোলের ওপর নিল মাহির। এতে সাড়ে ছ'লাখ টাকা আছে। বারাসতের একটা পার্টির কাছ থেকে কালেকশন। কীসের কালেকশন সেটা জানে না মাহির।

রিতুদা গতকাল ডেকেছিল মাহিরকে। বলেছিল, "কাল সকালে বারাসত চলে যাবি। টিটি আর তুই। পেমেন্ট আছে একটা। নিয়ে আসবি। ক্যাশে দেবে। ফলে সেভাবে আনবি। মনে থাকে যেন!"

"ঠিক আছে রিতুদা," মাথা নেড়েছিল মাহির।

"আর শোন," রিতুদা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, "ব্যাগটা তোর কাছে রাখবি, টিটির হাতে দিবি না। গাড়ি করে চলে আসিস।"

কিন্তু গাড়ি করতে পারেনি মাহির। বারাসতে কী একটা ঝামেলা হয়েছে। রাস্তা অবরোধ। তাই গাড়ি করা যায়নি। তার ওপর আবার তুয়াদি এসে জুড়ে বসেছে! কী যে জ্বালা!

টাকা কালেকশন করে কোনও গাড়ি না পেয়ে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে বারাসত স্টেশনে এসেছিল মাহিররা। ভয় লাগছিল ওর। সঙ্গে এতগুলো টাকা। কিছু হয়ে গেলে রিতুদা আস্ত রাখবে না।

টিটি বলেছিল, "রিতুদাকে একটা ফোন করে জানাবি যে, এখানে গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না?"

"না!" মাহির মাথা নেড়ে বলেছিল, "রিতুদা টেনশন করবে। তার চেয়ে ট্রেনে বেরিয়ে যাই চল।"

স্টেশনে লোকের মাথা লোকে খাচ্ছিল! মাহিরের আরও ভয় লাগছিল দেখে। এত লোক! কী যে ভিড় হবে ট্রেনে! আর ব্যাগটা যদি ছিনতাই হয়ে যায়!

আকাশের দিকে তাকিয়েছিল মাহির! মেঘ করছে আবার। জুলাই মাস। ভরা বর্ষা চলছে। এখন বৃষ্টি এলেই মুশকিল হবে, ভেবেছিল মাহির।

"এত ভিড়ে ট্রেনে ওঠা খতরনাক হয়ে যাবে কাকা!" টিটি বলেছিল, "তার চেয়ে কয়েকটা ট্রেন ছেড়ে দিই চল। খিদেও লেগেছে। কিছু সাঁটিয়ে নিই চল।"

চারটে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। স্টেশনেই একটা দোকান থেকে পরোটা আর আলুর তরকারি খেয়েছে এর ফাঁকে। মাহির খেলাধুলো করে, তাই এমন তেলজবজবে খাবার ও খেতে চায় না। কিন্তু উপায় নেই। খিদে বড় বালাই! তা ছাড়া আজকাল খেলাটা কেমন যেন জীবন থেকে আস্তে-আস্তে সরে যাচ্ছে ওর। সাতাশ হতে চলল, এখনও সেকেন্ড ডিভিশনে পড়ে আছে। বড় ক্লাবে ডাকে না। ট্রায়াল হয় না। পতাদার চপবাজি শুনে-শুনে কান পচে গেছে। মাহির ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, আমাদের দেশে লোকে বিদেশি ফুটবল দেখে আর ক্রিকেট খেলে। এখানে কিছু হওয়া যায় না ফুটবল খেলে।

খাবার খেতে-খেতে এ সবই সাতপাঁচ ভাবছিল আর ঠিক তখনই পেছন থেকে কেউ একটা আলতো করে থাপ্পড় মেরেছিল পিঠে! ও খাবারের প্লেট হাতে ঘুরে দেখেছিল, তুয়াদি!

"কী রে, ব্যাগটাকে ওরকম প্রেমিকার মতো জড়িয়ে বসে আছিস কেন?" তুয়াদি জিজ্ঞেস করল।

এই কামরার শেষ সিট এটা। টানা লম্বা। সাতজন বসতে পারে। কিন্তু ন'জন বসেছে! সব জায়গাতেই এমন অবস্থা! অটোয় কলকাতার একটু কোণের দিকে গেলেই উপচে পড়া মানুষ তুলে নেওয়া হয়। জেলাগুলোয় ট্রেকার চলে, নাকি আঠার বিজাপনের সেই মানুষঠাসা গাড়ি চলে কে জানে! বাসে লোক ঝুলছে! মেট্রোতেও মাঝে-মাঝে দরজা বন্ধ করা যায় না! দূরপাল্লার ট্রেনে পর্যন্ত রিজার্ভ সিটকে বাপের সম্পত্তি ভেবে ঠেসে বসে যায় সব। ভাগ্যিস প্লেনে ঝুলে যাওয়া যায় না! গেলে পাইলটকে যে ক'জন মানুষকে কোলে বসিয়ে নিয়ে যেতে হত কে জানে! মাহির বোঝে, গোটা দেশ তেঁতুল পাতার কনসেপ্টে চলছে!

তুয়াদি একদম লেপটে বসেছে মাহিরের সঙ্গে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে ওর।

মাহির দেখল দমদম জংশন ঢুকছে। ও তাকাল টিটির দিকে। কী করবে বুঝতে পারল না। মেট্রোয় গেলে তো গেটে চেক করে আজকাল। সেখানে যদি ধরা পড়ে যায়! ও ভেবেছিল শিয়ালদায় নেমে সাউথ সেকশনের ট্রেন ধরবে বা ট্যাক্সি করে নেবে!

আজকাল তুয়াদির যে কী হয়েছে! নানা! অছিলায় মাহিরের গায়ে হাত দেয়! এত বিরক্ত লাগে ওর! কিন্তু কিছু বলতে পারে না। ও জানে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। শুধু-শুধু ওকেই ভুল বুঝবে!

এখনও ভাল লাগছে না মাহিরের। তুয়াদির বুকটা ওর ডান দিকের কনুইতে লাগছে। ও টিটির দিকে সরে যেতে চাইছে, কিন্তু জায়গা নেই বলে পারছে না। আর ওর মনে হচ্ছে, তুয়াদি যেন ইচ্ছে করে ওর কনুইতে নিজের শরীরটা ঘষছে!

"কী রে বল, কী আছে তোর ব্যাগে? এখানে কী করতে এসেছিলি?" তুয়াদি জিজ্ঞেস করল।

টিটি অন্য সময় ফটফট করে, কিন্তু আজ চুপ। তুয়াদিকে খুব ভাল করে চেনে টিটি। আর ভয় পায়। সেই প্রপোজ করতে গিয়ে মার খেতে-খেতে বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটা এখনও ভোলেনি! তুয়াদি টিটিকে দেখলেই নানাভাবে কথা শোনায়! আজও স্টেশনে বলেছিল, "এই মর্কটটার সঙ্গে এসব গিলছিস? ওর সাপের বিষও হজম হয়ে যায়। কিন্তু তুই? ভাইটা অসুস্থ হয়েছে, এবার কি তুই হবি?"

তাই টিটি একটু সরে-সরে থাকছে। তুয়াদির সঙ্গে যাতে কথা না হয় এমন করে মুখ ঘুরিয়ে রাখছে।

মাহির বলল, "না, আমার কিছু সার্টিফিকেট আছে। সেই কাজেই এসেছিলাম এখানে..."

"সেই কাজে মানে? কী কাজে?" তুয়াদি আরও চেপে এল মাহিরের কাছে।

হালকা সেন্ট আর পাউডার মেশানো একটা গন্ধ পাচ্ছে মাহির। কানের পেছনে দেখছে পাউডার লেগে আছে একটু। কেন জানে না, মাহিরের ইচ্ছে করছে উঠে চলে যেতে!

"কী কাজে এসেছিল বল। আজ রবিবার, আজও কাজ!" তুয়াদি মাহিরের থাইতে হাত দিয়ে ঠেলল।

মাহির কুঁকড়ে গেল একদম। বলল, "হ্যাঁ, ওই একটা চাকরির জন্য। এখন আর রবিবার মানেই সব ছুটি এমন নয়। ইন্টারভিউ ছিল একটা তাই..."

"কীসের কাজ?" তুয়াদি ভুরু কুঁচকে তাকাল।

"এমনি ইয়ে..." মাহির দ্রুত মনে-মনে কথা বানাতে শুরু করল। কী বলা যায়! রিতুদার কাজে এসেছে সেটা বলা যাবে না। তা হলে আরও নানা প্রশ্ন করবে তুয়াদি। রিতুদাকে সবাই ভয় করে, তেলিয়ে চলে! কিন্তু পেছন ঘুরলেই গুন্ডা বলে। তুয়াদিও সেই দলেই। তাই সবারই রিতুদার কাজকর্ম নিয়ে কৌতূহল আছে।

মাহির বলল, "ওই ওরা বাংলাদেশে কিছু জিনিস এক্সপোর্ট করে। তাই মানে..."

"তো নিজে আসতিস, এই মর্কটটাকে আনলি কেন?" তুয়াদি টিটিকে দেখিয়ে জোরে-জোরেই বলল।

অন্য কেউ হলে টিটি এসব কথার বিনিময়ে গালাগালি দিয়ে তার বাপের শ্রাদ্ধ করে দিত। কিন্তু তুয়াদিকে যমের মতো ভয় করে ও। টিটি তুয়াদির কথায় হি হি করে একটা হাসি দিল। পরিস্থিতি ম্যানেজ করার হাসি।

তুয়াদি বলল, "আর দাঁত দেখাতে হবে না। ওগুলো এমনিতেই দেখা যায়!"

মাহির দেখল ব্যাপারটা অন্যদিকে যাচ্ছে। ও বলল, "তুমি এখানে... মানে..."

"কেন তুই জানিস না? বারাসতে আমার মাসির বাড়ি। তাই এসেছিলাম। কাকিমাকে তো বলে এসেছি। তোকেও তো বলেছিলাম।"

"ও হ্যাঁ তা ঠিক। আসলে ভুলে গিয়েছি আর কী!"

মাহির দেখল দমদম জংশন ঢুকছে। ও তাকাল টিটির দিকে। কী করবে বুঝতে পারল না। মেট্রোয় গেলে তো গেটে চেক করে আজকাল। সেখানে যদি ধরা পড়ে যায়! এই নিয়ে টিটিকে বলেওছিল আগে। ও ভেবেছিল শিয়ালদায় নেমে সাউথ সেকশনের ট্রেন ধরবে বা ট্যাক্সি করে নেবে!

টিটিও ওর দিকে তাকাল। মানে কী করবি?

তুয়াদি উঠে দাঁড়াল এবার, "চল নামবি। এখান থেকে মেট্রো করে রবীন্দ্র সরোবর চলে যাব। তাড়াতাড়ি হবে।"

"আমরা ভাবছিলাম," মাহির তোতলাতে লাগল, "মানে... শিয়ালদা গিয়ে..."

"চল!" তুয়াদি মাহিরের হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

মাহির বাধা হয়ে উঠল সিট থেকে। তুয়াদিকে বিশ্বাস নেই। সিন ক্রিয়েট করতে লজ্জা পায় না!

মেট্রোর টিকিট কাউন্টারের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মাহির। কী সুন্দর বাঁশি বাজছে! ও দেখল একজন বৃদ্ধ বাঁশিওয়ালা সাইডব্যাগে অনেকগুলো বাঁশি নিয়ে বড় গেটের এক পাশে দাঁড়িয়ে। কী অদ্ভুত বাঁশি বাজান মানুষটি!

তুয়াদিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর এগিয়ে গেল বাঁশিওয়ালার দিকে। মাহির আর গেল না। তুয়াদির এই একা। সারাক্ষণ কিছু না-কিছু কিনতেই থাকে। ও দেখল তুয়াদি বাঁশি কিনল একটা। মানুষটার সঙ্গে কথাও বলল একটু।

টিটি পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, "শালা, এই মালটা জুটে ঝাড় হয়ে গেল তো! এখন মেট্রোয় যদি আটকায়! আমার যা চেহারা, ক্রিমিনাল বলে ধরে নিয়ে কেলিয়ে লাট করে দেবে! তোকেও হাম্প্ দম দেবে না! তুই শালা উঠলি কেন?"

মাহির কিছু বলার আগেই তুয়াদি ফিরে এল, "তোরা কি ক্যালানে? টিকিটের লাইনে দাঁড়ানসি কেন? যা টিকিট কাট আগে!" বলেই একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল টিটির দিকে।

টিটি আর কথা বাড়াল না। টিকিটের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তুয়াদি তাকাল মাহিরের দিকে। তারপর আলতো করে ওর কনুইয়ের ওপরটা ধরে বলল, "এত ভাল চেহারা তোর। পুলিশে যাস না কেন?"

মাহির কী বলবে ভেবে পেল না।

তুয়াদি আবার বলল, "খুউবলে কিছু হবে না। আমি যে-কারখানাটা করব সেখানে আমার সঙ্গে কাজ করবি? আমার তো লোক লাগবেই! তুই বেশ ম্যানেজারি করবি। আমার লোক তুই। তোকে তো বিশ্বাস করি আমি।"

মাহির কথাটা শুনে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল! সেদিন পলিও এমন একটা কথা বলেছিল না ওকে!

পলি! নামটা মনে পড়লেই ওর মনে হয় নিউ মার্কেটের ফুলের বাজারে দাঁড়িয়ে আছে ও! এমন একটা মেয়ে এই কলকাতায় ছিল! পলির কথা মনে পড়লে ভেতরে-ভেতরে গলে যায় মাহির। বড়-বড় বাদামি চোখ। অমন টিকালো নাক! এসব মেয়েকে ভগবান কেন পাঠায় ওর

সামনে! ও নিজেদের ওই ছোট্ট নোনাধরা ঘরে, চৌকির ওপর শুয়ে রাতে পলির কথা ভাবে। কোলবালিশ জড়িয়ে মনে-মনে আদর করে পলিকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বোঝে পলির কথাই মনে পড়ছে। বোঝে এখন উঠে দাঁড়ানো যাবে না সবার সামনে!

ওল্ড এজ হোমটার নাম 'হোপার ইয়ার্স'। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছের গ্রিক চার্চের পাশের গলি দিয়ে কিছুটা গেলে বাঁ দিকে একটা রাস্তা ঢুকেছে। সেই রাস্তার ওপর একটা দোতলা বাড়িতে এই ওল্ড এজ হোমটা বানানো হয়েছে।

রিতুদা বলেছিল ওকে যেতে। পলির সঙ্গে কথা বলে এক শনিবার বিকেলে গিয়েছিল মাহির। টিটি যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মাহির যেতে দেয়নি।

টিটি বলেছিল, "কেন, আমায় নিবি না কেন?"

মাহির গম্ভীরভাবে বলেছিল, "রিতুদা আমায় একাই যেতে বলেছে। তোকে নিলে রাগ করবে!"

টিটি সরু চোখে তাকিয়ে গাঁজার পুরিয়া বানাতে-বানাতে বলেছিল, "ফরসা মেয়েছেলে বলে আমায় কাটিয়ে দিচ্ছ! আমি কি দেখিনি ভেবেছ? সেদিন এসেছিল রিতুদার অফিসে। শালা কারেন্ট অফ-এ মনে হচ্ছিল পাড়ায় সার্চলাইট ঘুরছে! এমন জিনিসের কাছে এক-একা যেতে চাও! আচ্ছা যাও। আমার শালা ব্রিজের পাশের লড়বউদিই ঠিক আছে।"

হোমটার দুটো তলায় তিরিশ জনের মতো থাকেন। সবারই বেশ বয়স হয়েছে। এটা মহিলাদের হোম। পলির সঙ্গে সব ঘুরে-ঘুরে দেখেছিল মাহির। কীভাবে সবাই থাকেন, কী খান, কোথায় বসে গল্প করেন সবাই, কোথায় রান্না হয়— সবটা দেখছিল।

পলি বুঝিয়ে-বুঝিয়ে দিচ্ছিল নানা জিনিস। আর মাহির মাথা নাড়ছিল খুব। মানে খুব বুঝতে পারছে আর কী, এমন একটা ভাব। কিন্তু আসলে তেমন কিছুই মাথায় ঢুকছিল না! পলির মতো মেয়েদের এত কাছে কোনওদিন আসেনি মাহির।

ওর তো বয়েজ স্কুল ছিল। তাও সব তেমনই ছাত্র! যেমন তাদের আচার-ব্যবহার তেমন মুখের ভাষা! মেয়েরা চিরকাল ছিল নেপচুন-প্লুটোর বাসিন্দা! তার ওপর মাহির ছিল লাজুক। তাই আরওই কিছু হয়নি!

শুধু স্কুল যাতায়াতের পথে ও বড়-বড় স্কুলের নীল বর্ডার দেওয়া হলুদ বাসগুলো দেখত, দেখত সেই বাসের জানলায় নেপচুন আর প্লুটোর মেয়েরা বসে আছে। দেখলেই যেন মনে হত, এদের কাছে যাওয়া মানা। এদের ভাষা, খাবার, পোশাক সব আলাদা। একদমই ওদের পৃথিবীর মতো নয়।

সেই নেপচুন থেকে পলি যেন নেমে এসেছিল মাহিরের পাশে! হাসলেও যেন ঝকঝকে দাঁতে বিজ্ঞাপনের তিরিশ সেকেন্ড ঝলসে উঠছে! পাশে দাঁড়ালে কী দারুণ সেন্টের... মানে ইয়ে, পারফিউমের গন্ধ! হাত নেড়ে কথা বলার সময় আঙুলগুলো দেখছিল মাহির। নখটাও কি স্কেল দিয়ে মেপে কেটেছে! নেলপলিশ না পরেও কী করে এমন হালকা গোলাপি হয় নখগুলো? সাজেনি একটুও, কিন্তু তাও কেমন যেন ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার দিয়ে সাজানো একটা মেয়ে! মাহিরের মাথা সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ও শুধু স্প্রিংয়ের ঘাড়ওয়ালা পুতুলের মতো মাথা নাড়ছিল! বুঝতে পারছিল, ওর বারোটা বেজে গিয়েছে! ওই মেয়ের ওপারের লোকটা কাঙালকে শুধু শাকের খেতের সামনে দাঁড় করায়নি, গড়িয়াহাট বাজারের রমরমে সবজির দোকানগুলোর সামনে মাটির সঙ্গে পুঁতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে!

সব ঘুরে দেখার পরে গেটের কাছে এসে ওরা দাঁড়িয়েছিল। পলি বলেছিল, "ওই সামনে যে-মাঠটা দেখছ, ওটা আমাদের ছিল। একটা ক্লাব ইদানীং দখল করে নিয়েছে। ওটা যদি খালি করিয়ে দিতেন একটু, তা হলে বাড়ি আর মাঠটা নিয়ে পাঁচিল তুলে দিতাম আমরা। বয়স্ক মানুষগুলোর একটু হাঁটার জায়গা হত। আর-একটা উইংও খুলতে পারতাম। বেশির ভাগ মানুষ তো এই বয়স্কদের ফুরিয়ে যাওয়া, বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যাটারি নিয়ে করে! জীবনে মানুষ তো গুডনেসের পেনশন পায় না!"

মাহির যত না কথা শুনছিল, তার চেয়ে বেশি দেখছিল পলিকে। এমন একটা মেয়ে এসব করে! শুনেছে মাস্টার ডিগ্রিও করছে! এত কিছু সামলায় কী করে? ওর তো একটুতেই সব কিছু জড়িয়ে, গিঁট পাকিয়ে যায়!

পলি কথা বলতে-বলতে নিজের অজান্তেই আলতো করে ছুঁয়েছিল মাহিরের হাতটা। বলেছিল, "আমরা নিজেরা টাকাপয়সা নিই না। তাই যদি রিতুদাকে একটু বলেন ব্যাপারটা। প্লিজ!"

মাহিরের মনে হয়েছিল, ওর হাতে থাকলে সারা ভারতবর্ষের বাজেট এই হোমের পেছনে দিয়ে দেয়! কিন্তু ওর হাতে তো কুড়ি টাকার মিষ্টি কিনে দেওয়ারও ক্ষমতা নেই!

মাহির বলেছিল, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কথা দিলাম।"

কথা দিল? শেষের দুটো শব্দ বলেই মনে হয়েছিল, এই রে! বেশি বলে ফেললাম কী? মেয়েটা কি ওর হ্যাংলামো বুঝে ফেলল? শুনেছে মেয়েরা নাকি খুব বুঝতে পারে এসব জিনিস। মাহির মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। নিজের সস্তার জামা, রং নিতে আসা প্যান্ট, চল্‌টা ওঠা স্নিকার্স দেখে মনে হচ্ছিল, ওর নিজেরই তো ত্রাণ আর সাহায্য দরকার। এখানে ও কিনা এসব নিয়ে আর্জি শুনছে!

"আপনি চেষ্টা করলেই হবে, আমি জানি আপনি চেষ্টা করবেন, আমি ভরসা করছি আপনার ওপর... বিশ্বাস করছি," পলি কথাটা বলে আকাশজোড়া বড়-বড় চোখ তুলে তাকিয়েছিল মাহিরের দিকে। আর মাহির বুঝেছিল এমন আকাশ আছে বলেই মানুষের মাঝে-মাঝে পাখি হতে ইচ্ছে করে!

রিতুদা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছিল পঁচিশ সেকেন্ডে। বলেছিল, "আরে, মেয়েটা মাথা খেয়ে নেয় একদম! তাই তোকে পাঠিয়েছিলাম। ও পরে দেখব। এখন সোনাঝুরির দিকে মন দে। শালা ওখানে টাকার বৃষ্টি শুরু হল বলে! শোন, আমাদের দেশে আসল রোল ওয়াটার হারভেস্টিং হোক আর নাই হোক, টাকার বৃষ্টি হলে সেই হারভেস্টিংয়ের জন্য লোক সবসময় রেডি থাকে!"

"আমি কিন্তু দেখলাম রিতুদা, ওদের ফান্ডের দরকার। কত বয়স্ক মহিলারা থাকেন! প্লাস ওদের ওখানে একটা ক্লাব জবরদখল করে..." মাহির উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল একটু।

রিতুদা তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর হেসে বলেছিল, "ফরসা মেয়েছেলে দেখলে অনেকেই পিছলে যায় খোকা। কিন্তু কাজের সময় আলুবাজি নয়! প্রফেশনাল ফিল্ডে আলুবাজি করেছ কি গেছ! এখন আমাদের সোনাঝুরিতে মন দিতে হবে, কেমন?"

মেটো থেকে রবীন্দ্র সরোবরে নেমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মাহির। রবিবার বলেই কি না কে জানে, ট্রেনে কী ভিড়! দমদমে এত ভিড় যে, গেটে কোনও চেকিং হয়নি আজ। ট্রেনটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা কোনওমতে দৌড়ে উঠেছিল কামরায়। এসি ফেল পায়নি, তাই সারাক্ষণ বিকট শব্দ আর গরমে সেদ্ধ হতে হতে এসেছে। তুয়াদি লেডিজ সিটে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল বলে আর সারাটা রাস্তা গায়ের ওপর পড়েনি ওরা।

ট্রেন থেকে নামার সময় একদম ওর পেছনে এসে লেপটে ছিল গায়ের সঙ্গে। কিন্তু সেটা ভিড়ের ঠেলায় না ইচ্ছে করে, তা জানে না মাহির। আর সত্যি বলতে তা জানতেও চায় না। বেকার এসব জিনিস নিয়ে মাথা ভর্তি করে নিলে আর বাঁচা যাবে না। *(ক্রমশ)*

অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র

সুধীর চক্রবর্তী

কলকাতার জিডি বিড়লা সভাগার-এ ১ জুন, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্স নিবেদিত 'দেশ' বিতর্ক ২০১৮ পাওয়ার্ড বাই আত্রেয়ী নির্মাণ এবং মুখরোচক চানাচুর। সহযোগিতায় হিওওয়ার এবং ইফকো। বিতর্কের বিষয়: বাঙালি এখন হিন্দির দাসত্ব করতেই স্বচ্ছন্দ। ইদানীংকালে হিন্দি সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি কতটা অনুরক্ত হয়ে পড়েছে বা আদৌ হয়ে পড়েছে কি না, এই ধারণায় ভর করেই জমে উঠেছিল বিতর্কসভা। এই সভায় মতপ্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন ছ'জন স্বনামধ্যাত বক্তা— পক্ষে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রূপম ইসলাম। বিপক্ষে কৃষ্ণা বসু, দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী।

প্রথম বক্তা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্র, চিত্রশিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে বিহারে, তাই ভাষাগত দিক থেকে অনেক সুবিধেই তিনি নিয়েছেন হিন্দিভাষীদের কাছ থেকে। তবে এখনকার কথা ধরলে নিজেদের বাঙালিয়ানার অসম্ভব পরিবর্তন ঘটেছে— একটি হল ভাষায়, অপরটি পোশাকে। পৃথিবী যে-মাধ্যমে চিনবে বাঙালিকে, সেই পোশাক আর ভাষা দু'টিকেই আমরা কৃতাঞ্জলি করে ফেলেছি! তাঁর মতে, এই দু'টি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সচেতনতার পথ বের করার প্রয়োজন আছে। আজকাল অফিস-কাছারিতে দেখি, বাঙালিরা হিন্দিভাষার দাসত্ব করার মতোই কথা বলছেন। তাই বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। আমরা হিন্দি বলব না তা নয়, কিন্তু বাঙালি হয়েই হিন্দি বলব। সহজভাবে ভাষাকে নিজের হৃদয়ের কাছাকাছি রাখতে পারলে, সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শুভদিন।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপম ইসলাম

সভার বিপক্ষে প্রথম বক্তা ছিলেন কবি কৃষ্ণা বসু। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কৃষ্ণা বসু মূলত কবি। মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের রূপরেখা তাঁর লেখনীতে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রথমেই বললেন, বিতর্কের বিষয়টি একেবারে ভ্রান্তিযুক্ত বিষয়। পৃথিবীতে বহু ভাষা আছে, কিন্তু একমাত্র বাংলা ভাষার জন্যই পৃথিবী মাতৃভাষাদিবস পেল। বাঙালি মানে শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি নন। হিন্দি একটি সংযোগরক্ষাকারী ভাষা মাত্র, সেখানে বাংলা তার সংকরত্ব নিয়ে, মিশ্র বৈচিত্র নিয়ে শত-শত বছর ধরে এগিয়ে চলেছে। বাংলায় বহু ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যা তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। তাঁর মতে, আমরা কখনও কখনও বিনোদনের জন্য হিন্দির আশ্রয় নিই ঠিকই, কিন্তু দাসত্ব কখনওই করি না।

সভার তৃতীয় বক্তা রূপম ইসলাম। বাংলা রক গানের জনপ্রিয়তায় রূপম ইসলাম এবং তাঁর ব্যান্ড 'ফসিলস'-এর ভূমিকা প্রবাদপ্রতিম। সংগীতচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত লেখালিখিও করেন রূপম। তাঁর মতে, বিতর্কের বিষয়ে 'এখন' শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। রূপম নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি

মন্তব্য পেয়েছেন স্কুল থেকে বাংলা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে। কারণ, বাঙালি মাত্রেই বাংলা খানিকটা শিখবে। কিন্তু হিন্দি ভাষা কার্যক্ষেত্রে অনেক বেশি করে প্রয়োজন হয়, সুতরাং হিন্দিতে কিংবা ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ হওয়াই এখন বেশি প্রয়োজন। আমরা আজকে ঠেঁড়স বলি না বলি ভিন্ডি। কিন্তু ছোটবেলায় তো এরকম ছিল না।

বিপক্ষের আসন থেকে পরের বক্তা ছিলেন সংগীত শিল্পী ও গবেষক দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা নাটক ও যাত্রাগানের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রূপমের কথার পিঠে তিনি পালটা যুক্তি রাখলেন, কেউ কিছু না পারলে আমরা তাকে বলি, তুই একটা ঠেঁড়স, তুই একটা ভিন্ডি তো বলি না! স্কুল থেকে বাংলা উঠে যাওয়া নিয়ে তাঁর মত, জীবিকাভিত্তিক ভাবনা আর নিজেদের জীবন থেকে একটা জিনিস উঠে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। বহু মানুষ শুধু বাংলা ভাষা নয়, বাংলা সংস্কৃতি নয়, বাংলা জীবনের চর্চা করে চলেছেন। বাঙালির মন বাঙালির ভাবুকতা নিয়ে আমরা এখনও দিব্যি বেঁচে আছি।

বিতর্কসভার পঞ্চম বক্তা ছিলেন সাহিত্যিক সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, মূল কথা হল হিন্দির আগ্রাসন। ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসন। সবটাই এত সূক্ষ্মভাবে হয় যে, বোঝা দায়! হিন্দি ভাষার একটা ডিকটেট করার ক্ষমতা আছে, যা ভীষণ সত্যি। আমরা আসলে পরিস্থিতির দাস।

সভার সর্বশেষ বক্তা বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় একজন কবি। কবিতা লেখার পাশাপাশি গদ্যেও বিনায়ক সমানভাবে সাবলীল। তিনি বললেন, সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' লিখেছেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেটা পড়ে অবিলম্বে তাঁকে হিন্দি অনুবাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুনীতিবাবু কি হিন্দির দাসত্ব করছিলেন? বিহারের কবি অশোক বাজপেয়ী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সম্মানিত করেছিলেন, এটা কি বাংলার দাসত্ব করা হচ্ছে? কোথায় থাকত হিন্দি সিনেমা যদি বিমল রায়, শচীনকর্তা না থাকতেন? বাঙালি হিন্দির দাসত্ব করছে এটা একটা চাপিয়ে দেওয়া কথা— এটা অতীতেও সত্যি, এখনও সত্যি।

পক্ষের এবং বিপক্ষের ছ'জনের বক্তব্যের পর সারাংশ তুলে ধরেন বিতর্কের বিষয়ের পক্ষে থাকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রূপম ইসলাম। অপরদিকে সভার বিপক্ষ দলের সদস্য বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি কৃষ্ণা বসুও জোরদার যুক্তি পেশ করলেন। সবশেষে সভার সঞ্চালক সুধীর চক্রবর্তী শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে হাত তুলে নিজেদের মতপ্রকাশের জন্য অনুরোধ জানান। সেই সঙ্গে তিনি একথাও যোগ করেন যে, এই তর্ক চিরকালীন, তাই এই তর্কের কোনও ইতি নেই।

অনুষ্ঠানটি সফল করেছেন মুখ্য বিজ্ঞাপনদাতা নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্স পাওয়ার্ড বাই আত্রেয়ী নির্মাণ এবং মুখরোচক চানাচুর সহযোগিতায় হিন্ডওয়্যার এবং ইফকো।

কৃষ্ণা বসু

দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

NEW INDIA ASSURANCE
দি ন্যু ইন্ডিয়া এশ্যুরেন্স কম্পনী লিমিটেড
The New India Assurance Co. Ltd
Presents
দেশবিতর্ক
২০১৮
Powered by
Aatreyee Nirman Private Limited
ISO 9001: 2008 certified company
www.mukhorochak.com
মুখরোচক
ভালো খান সুস্থ থাকুন
In Association with
moonbow by hindware
Co-Sponsor
IFFCO

মঞ্চে দেশ বিতর্কসভার সকল বক্তা ও সঞ্চালক

জলের মধ্যে শহর

কৌশিক সেন

সেই সুদূর কুয়াশায় ভরা মধ্যযুগ থেকে রেনেসান্সের উষালগ্ন আর ফ্যাসিস্ট রাত্রির অন্ধকার পেরিয়ে, ট্যুরিস্টনন্দিত যুগে এসেও ভেনিস তার চরিত্র বদলায়নি।

শুনেছি সব রাস্তা রোমে গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু রোমের রাস্তাঘাট মোটেই কিছু আহামরি নয়, অনেকটা দক্ষিণ কলকাতার মতো। ঘিঞ্জি, এবড়োখেবড়ো, এখানে-ওখানে আবর্জনা, দেওয়ালে উদ্ভট গ্রাফিতি, সব মিলিয়ে বেশ একটা গা-ছাড়া দেহাতি ভাব, পশ্চিম ইউরোপের কিংবদন্তিসুলভ পরিচ্ছন্নতার ধারকাছ দিয়ে যায় না। কিন্তু এঁদো গলি দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ করেই আপনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। দেখবেন, মন্ত্রবলে আড়াই হাজার বছর পিছিয়ে গেছেন, আপনার চারপাশ থেকে চেনা পৃথিবী বেমালুম ভ্যানিশ। এখনই বুঝি টিউনিক আর পালক লাগানো হেলমেট পরে সেন্যেরা বর্শা বাগিয়ে এসে হাজির হবে, তাদের প্রিয় শহর থেকে উজবুক ট্যুরিস্টদের ঠেঙিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি যখন সময়ের স্রোতে কল্পনার নৌকো ভাসিয়ে প্রথম শতকে হাজির হয়েছেন, ঠিক তখনই কানের কাছে দেশজ উচ্চারণে বাংলা শুনে আরও একবার বেদম চমকে উঠবেন। নিউ ইয়র্কের মতো রোমেও ওপার বাংলার অবাধ উপস্থিতি, তাই প্রাচীন দুনিয়ার গা ছমছমে পরিবেশেও কান পাতলেই বাংলা আর হাত বাড়ালেই বন্ধু। পশ্চিমবঙ্গের বাবুদের অবশ্য এইসব চত্বরে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আমি এই যাত্রায় রোম দেখতে আসিনি, আমার গন্তব্য আরও উত্তরে জল দিয়ে ঘেরা এক আশ্চর্য লেগুন, একসময় যার নাম ছিল অপার 'শান্তির প্রজাতন্ত্র ভেনিস'। রোম থেকে ট্রেইনিটালিয়া কোম্পানির হাইস্পিড ট্রেন ধরে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে ভেনিস পৌঁছে যাওয়া যায়। ট্রেন-স্টেশন প্রায় এয়ারপোর্টের মতো ঝাঁ-চকচকে, চারদিকে উচ্চমার্গের দোকানপাট আলোয় ঝলমল করছে অথচ পাসপোর্ট, ভিসা, সিকিওরিটির হাঙ্গামা নেই। একবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের এলাকায় ঢুকে পড়তে পারলেই আপনি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো মনের সুখে এই দেশ থেকে সেই দেশে ঘুরে বেড়াতে পারেন। বোঝা গেল ঠিক এইজন্যেই আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষ ইউরোপের সীমান্তে এসে হাজির হচ্ছে প্রতিদিন। মাঝরাস্তায় নৌকোডুবি হয়ে আভাবাচ্চা সমেত বেঘোরে মারাও পড়ছে অনেকে, ভূমধ্যসাগরের তলায় জমা হচ্ছে তাদের হাড়গোড়। কিন্তু সেইসব অপ্রীতিকর আলোচনা আপাতত তুলে রাখা যাক। যে কথা হচ্ছিল, রোম থেকে ভেনিস ট্রেনযাত্রাটি বেশ আরামদায়ক, হাতের নাগালেই খাদ্য, পানীয় এবং ইন্টারনেট, তাই সময় কাটানো কোনও সমস্যা নয়। ট্রেন থেকে নেমে অভ্যাসমতো ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়েই বুঝবেন, আপনাকে আদতে

ভেনিশিয়ান মাস্ক

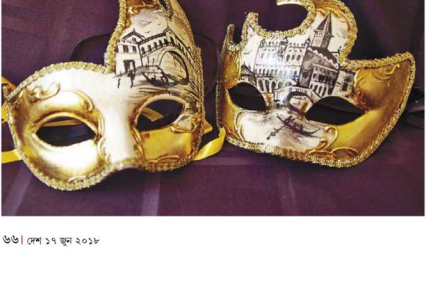

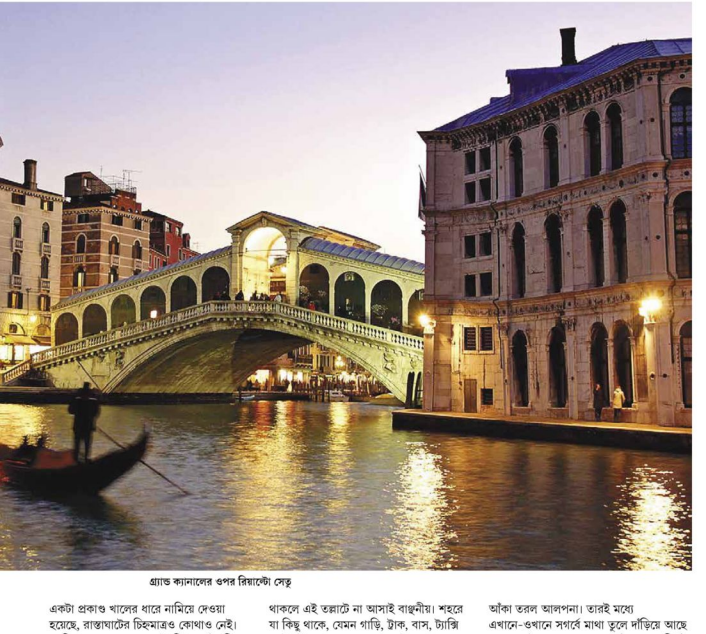

গ্র্যান্ড ক্যানালের ওপর রিয়াল্টো সেতু

একটা প্রকাণ্ড খালের ধারে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাস্তাঘাটের চিহ্নমাত্রও কোথাও নেই। জেটির ওপর লেখা আছে 'ট্যাক্সি', অর্থাৎ কিনা জলচারী ট্যাক্সি। লটবহর নিয়ে তার পেটের ভেতর ঢোকার সময় খেয়াল হল যে, সাঁতারটা ভাল করে শেখা হয়নি।

বহু শতক ধরে ভেনিসে যাতায়াত করার দু'টিমাত্র উপায়— পায়ে হাঁটা এবং নৌকোয় ভাসা। সেই সুদূর কুয়াশায় ভরা মধ্যযুগ থেকে রেনেসাঁসের উষালগ্ন পেরিয়ে, ফ্যাসিস্ট রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এই ট্যুরিস্টনন্দিত আধুনিক যুগে এসেও ভেনিস তার চরিত্র বদলায়নি। দ্বীপমালা, সেতু আর খাল নিয়ে তৈরি কবিতার মতো এই শহরে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর যুগ্ম অধিষ্ঠান। কিন্তু জলাতঙ্ক, গেঁটেবাত বা হাঁপানি থাকলে এই তল্লাটে না আসাই বাঞ্ছনীয়। শহরে যা কিছু থাকে, যেমন গাড়ি, ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি সবই নৌকো অবতারে জল কেটে চলেছে, তার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরঘুর করছে রিকশার বদলে ভেনিসের মার্কামারা ডিঙি-নৌকো, যার নাম গন্ডোলা। আমি বেহালার ছেলে, জলে-ডোবা বাড়ি আমি প্রচুর দেখেছি, কিন্তু এই বাড়িগুলো জলের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে মিশে আছে, ঠিক যেন প্রেমিক-প্রেমিকা, হাত দিয়ে ছুঁতে ভয় হয়। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে জেটি, সেখানে নানা জাতের নৌকো দোল খাচ্ছে। খালের ওপর দিয়ে ছোট, বড়, মাঝারি আকারের সেতু যোগাযোগ রেখেছে, তার ওপরে মানুষের ভিড়। পুরনো বাড়িগুলোর এক-একটার এক-এক রকম রং, জলের ওপর কাঁপছে সেই সব রঙিন ছায়া দিয়ে আঁকা তরল আলপনা। তারই মধ্যে এখানে-ওখানে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাথরে গাঁথা অনুপম সব ভাস্কর্য, প্রাসাদ, গির্জা আর মিনার। সব মিলিয়ে প্রথমবার ভেনিস দর্শনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এর মধ্যেই হোটেল এসে যাবে, আপনিও বোট থেকে জেটি বেয়ে সোজা হোটেলের দরজায় উঠে যাবেন।

লবিতে অপেক্ষা করছে আরিয়ানা, এই যাত্রায় আমাদের গাইড। আরিয়ানা খাঁটি ভেনিশিয়ান, ওর এক পূর্বপুরুষ নাকি তুর্কিদের সঙ্গে ক্রুসেড লড়েছিলেন, আর-এক পূর্বপুরুষ কাচের ব্যবসা করতেন, সেই কাচের আয়নারা নাকি মোঘল বাদশাহদের অন্তঃপুরে শোভা পেত। কোনও কোনও মেয়ে যৌবনের শেষে গিয়ে একটা আলাদা রকমের অভিজাত

লালিত্যের খোঁজ পায়, ইংরেজিতে তার নাম এলিগ্যান্স। আরিয়ানা সেই গোত্রের মেয়ে, ওর ছিপছিপে অথচ টেউখেলানো চেহারা, কাঁধ অবধি চেস্টনাট ব্রাউন চুল আর কাটা-কাটা মুখচোখ সবই এই পরিবেশের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে যায়। আমাদের হোটেল গ্র্যান্ড ক্যানালের ওপরেই, এখান থেকে শহরের প্রধান চত্বর কয়েক মিনিটের পথ। আরিয়ানার পিছনে পিছনে আমাদের দলটা খুব শিগগিরই পিয়াজ্জা সান মার্কো বা সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে পৌঁছে গেল, যেখান থেকে আমাদের ভেনিস ভ্রমণ শুরু।

পিয়াজ্জা সান মার্কো ভেনিস শহরের মধ্যমণি, এখানে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ট্যুরিস্ট গিজগিজ করছে। প্রধান আকর্ষণ সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকা, মার্বেল পাথরের ওপর অপূর্ব সোনালি কারুকার্য করা চার্চটির দিকে তাকালেই চোখ আটকে যায়, ভেনিসের অতীত গৌরব আর ঐশ্বর্য সম্পর্কেও কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

"ইটালিয়ান এবং বাইজেন্টাইন স্টাইলে তৈরি ১০৬৩ সালের এই ব্যাসিলিকা একসময় ভেনিসের নির্বাচিত নেতা বা ডোজে (Doge of Venice) ব্যবহার করতেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রার্থনাগৃহ হিসেবে। ডোজের প্রাসাদ থেকে সরাসরি এখানে আসা যায়। ওই দেখুন সেন্ট মার্কের প্রতীক পাখাওয়ালা এক সিংহ, যে থাবায় একটি বই ধরে আছে," আরিয়ানা আমাদের দেখাল।

"সেন্ট মার্কস স্কোয়ারের অনেক জায়গাতেই এই বিশেষ সিংহমূর্তিটির দেখা মিলবে। বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওই দেখুন চারটি বিখ্যাত ঘোড়া, হর্সেস অফ সেন্ট মার্ক। ওগুলো কিন্তু আসল নয়, আসলগুলো আছে গির্জার ভেতরে। এগুলো প্রাচীন রোমান স্থাপত্য, ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় ভেনিসের সৈন্যদল যখন কনস্টান্টিনোপল লুঠ করেছিল, সেই সময়ে ওরা ট্রফি হিসাবে ভেনিসে আসে। আমার বন্ধু নেপোলিয়ন ১৭৯৭ সালে ওদের চুরি করে প্যারিসে নিয়ে যান, কিন্তু ১৮১৫ সালে আমরা আবার ওদের ফেরত পাই," মুখ বেঁকিয়ে বলল আরিয়ানা। সেই থেকে মাঝে-মাঝেই ওকে "আমার বন্ধু নেপোলিয়ন' বলে ব্যঙ্গোক্তি করতে শোনা গেল। নেপোলিয়ন ভেনিস রিপাবলিক জয় করে সবসুদ্ধ অস্ট্রিয়ানদের দিয়ে দিয়েছিলেন, এতগুলো সেঞ্চুরি পরেও ভেনিশিয়ানরা সেই রাগ ভোলেনি।

শিল্পকলার পিছনে থাকে ঐশ্বর্য, তার পিছনে লুঠ। কিন্তু নিজেদের লুঠকে কেউ লুঠ বলতে চায় না, তার জন্য একটা ভদ্রগোছের নাম আবিষ্কার করে। ইসলামীয় মধ্যপ্রাচ্য এবং ব্রিটান ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের ঘাঁটি ছিল ভেনিস। আদর্শ ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে এখানে টাকাপয়সা লেনদেনের সবরকম সুবিধা ছিল, তার সঙ্গে ছিল ধর্মীয় সহনশীলতা। কিন্তু ক্রুসেডের সময় সব অন্যরকম হয়ে গেল। "আমরা ক্যাথলিক, কিন্তু ভেনিসের ডোজে মোটেই পোপের বশংবদ ছিলেন না, তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতেন। পৃথিবীর যে-কোনও জাতির এখানে ব্যবসা করার অধিকার ছিল," গর্বের সঙ্গে বলল আরিয়ানা।

ক্যাথিড্রাল দেখে আমরা স্কোয়ারের চারদিকে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। একদিকে বিরাট একটা ঘড়ি-মিনার দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই ডোজে-র প্রাসাদ (Doge's palace বা Palazzo Ducale), অন্যদিকে সারি দিয়ে দোকানপাট। স্কোয়ারের মাঝখানটায় পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর, সেখানে পায়রা, ট্যুরিস্ট আর ফেরিওয়ালাদের ভিড়, এইসব পেরিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেই গ্র্যান্ড ক্যানাল, সেখানে ঘাটের পর ঘাট, রেস্তরাঁ আর গন্ডোলাদের ভিড়। খাবার অগ্নিমূল্য কিন্তু সুস্বাদু, বিশেষ করে আপনি যদি পাস্তা এবং সি-ফুডের ভক্ত হন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ডোজে-র প্রাসাদ। সেই নবম শতক থেকে ভেনিশিয়ান রিপাবলিকের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হতেন, এই প্রাসাদ ছিল তাঁদের বাসস্থান এবং সরকারের সদর দপ্তর। ডোজেরা বিশ্বাস করতেন বন্ধুদের চেয়ে শত্রুদের কাছাকাছি রাখা উচিত, তাই জেলখানাটিও প্রাসাদের সঙ্গেই লাগানো, মাঝখানে একটি খালের ব্যবধান। সেই খালের ওপরে সেতুটির নাম দীর্ঘশ্বাসের সেতু বা ব্রিজ অফ সাই (Bridge of Sigh)। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে গথিক রোমান্স মাখানো। ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের জীবন থেকে অন্ধকূপে যাওয়ার আগে সেতুর মাথায় দাঁড়িয়ে শেষবার এই আকাশ আর আলো দেখার অভিজ্ঞতাটা কীরকম হতে পারে, ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

ডোজে হওয়া মুখের কথা ছিল না। অন্যান্য গুণের সঙ্গে তাঁদের বয়স সত্তরের ওপর হতে হত, যাতে তাঁরা বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রেখে স্বৈরাচারী হয়ে না ওঠেন। ডোজেরা নিজেদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারতেন না, তাঁদের মৃত্যুর পরে গ্র্যান্ড কাউন্সিল নতুন ডোজে নির্বাচন করত। এইসব বলতে বলতে আরিয়ানা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, ভেনিস ১৭৯৭ সাল অবধি স্বাধীন দেশ ছিল, এমনকী ভেনিশিয়ানদের ভাষাও ঠিক ইটালিয়ান নয়। ডোজের প্যালেস অবশ্য ইটালির অন্যান্য প্রাসাদের মতোই মাটি থেকে ছাদ অবধি ছবি আর কারুকার্য দিয়ে বোঝাই। বিরাট বিরাট ছবিগুলোয় বাইবেলের বিভিন্ন দৃশ্য, ভেনিসের

বুরানো দ্বীপের রামধনু-রঙা পল্লি

সেই থেকে মাঝে-মাঝেই ওকে 'আমার বন্ধু নেপোলিয়ন' বলে ব্যঙ্গোক্তি করতে শোনা গেল। নেপোলিয়ন ভেনিস রিপাবলিক জয় করে সবসুদ্ধ অস্ট্রিয়ানদের দিয়ে দিয়েছিলেন, এতগুলো সেঞ্চুরি পরেও ভেনিশিয়ানরা সেই রাগ ভোলেনি।

রিকশার বদলে রয়েছে ভেনিসের মার্কামারা ডিঙি-নৌকো, গন্ডোলা

গৌরব আর যিশুর মহিমাগাথা। আরিয়ানার বক্তব্য তিনতোরেত্তো এবং অন্যান্য ভেনিশিয়ান শিল্পীর কাজ মিকেলাঞ্জেলোর তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।

ছবি আর চারুকলার সঙ্গে সঙ্গে ডোজের প্রাসাদে একটি অস্ত্রাগারও রয়েছে। অপার শান্তির রিপাবলিকে যুদ্ধ লেগেই থাকত। ভেনিসের নৌবহর ছিল ভূমধ্যসাগর আর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পাহারাদার, অনেকটা আজকের আমেরিকার মতো ছলেবলে কৌশলে বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখাই ছিল ভেনিসের রাষ্ট্রীয় নীতি। সারা দুপুর ধরে ডোজের প্রাসাদ দেখতে দেখতে যখন আমাদের পা ব্যথা হয়ে উঠেছে তখনই আরিয়ানা ঘোষণা করল, বিকেলবেলাটা আমরা পদব্রজে ভেনিস ভ্রমণ করব। গ্র্যান্ড ক্যানালের ওপর রিয়াল্টো সেতু থেকে এই ট্যুর শুরু হয়। অলিগলি বেয়ে, সিঁড়ি ভেঙে নানা সাইজের খালের ওপর দিয়ে নানা পুরনো চার্চ আর বাড়িঘর দেখতে দেখতে আমাদের যাত্রা। আরিয়ানা গল্প বলে চলেছে, আমরা শুনছি। এখানে মার্কো পোলোর বাল্যকাল কেটেছে, এই চার্চে ভূতের উৎপাত আছে, এখানে ইহুদিদের ঘেটো ছিল, কে জানে শাইলক এইখানেই থাকত কি না, ওই প্যালেসে জর্জ ক্লুনির বিয়ে হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। একসঙ্গে এত সব দেখতে দেখতে মাঝে-মাঝে ক্লান্ত লাগে। যতই শহরের ভেতর দিকে ঢোকা যায়, গলিগুলো ততই সরু আর প্যাঁচালো হয়ে আসে, খালের জল থেকে চেনা-চেনা আদিগঙ্গার গন্ধও নাকে এসে ধাক্কা মারে এক-এক সময়। সন্ধ্যাবেলা আমরা আবার গ্র্যান্ড ক্যানালের ধারে এসে হাজির, সেখানে তখন হাজার বাতির আলো জলের ওপর টলমল করছে। ডিনারের আগে শপিং করার ইচ্ছে থাকলে এই সুবর্ণ সুযোগ, মদ্যপায়ীরা এই ফাঁকে গলা ভিজিয়ে নিতে পারেন। আমি ঘিতীয় দলে, ইটালিতে নানারকম ওয়াইন আর বিয়ার পাওয়া যায়, তারই এক পাত্র নিয়ে আমি জলের ধারে বসে পড়লাম। একটু দূরে ব্যান্ড বাজছে, বাতাসে তারই মূর্ছনা। জলের মধ্যে সারি-সারি খুঁটি পোঁতা, তাদের মাথায় বসে আছে সিদ্ধুসারস, ফাঁকে-ফাঁকে গন্ডোলারা বিশ্রাম নিচ্ছে।

এই শহরের কয়েকজনকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। তারা এই আলো-অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। অনুতাপে দগ্ধ মুর ওথেলো, বিশ্বাসী ক্যাসিও, খল আয়াগো, সুন্দরী দেসদিমোনা, বুদ্ধিমতী পোর্সিয়া, বিষণ্ণ অ্যান্টোনিও, ঘৃণিত শাইলক— এরাও বুঝি হাঁটতে বেরিয়েছে এই ভিজে হাওয়ায়, শ্যাওলার গন্ধমাখা ঘাটে-ঘাটে, নৌকা ভাসিয়েছে লেগুনের কালো জলে। এই হাজার হাজার ট্যুরিস্টের ভিড়ে লুকিয়ে আছে ওরা সবাই।

পরের দিন সকাল থেকে আমাদের জলপথে ভেনিস ভ্রমণ। একশো সতেরোটি দ্বীপ নিয়ে ভেনিস, তাদের ফাঁকে ফাঁকে কোথাও অল্প জল, কোথাও বেশি, কোথাও ব্রিজ আছে, কোথাও নেই, কিন্তু মোদ্দা কথা সবকিছুই জলের ধারে। ভেনিস বলতেই গন্ডোলার কথা মনে এলেও আদতে গন্ডোলায় চড়ে ফুরফুরে প্রেম করা ছাড়া আর কিছু করার সুবিধা নেই এবং তার জন্য গলাকাটা দাম দিতে হয়। আপনি যদি মধুযামিনী করতে ভেনিস গিয়ে থাকেন তো গন্ডোলায় অবশ্যই চাপবেন, আমাদের মতো ব্যাকি হতভাগ্যদের জন্য মোটরবোটই ভাল। জলচর বাস বা ভ্যাপোরেত্তো, ট্রারিস্ট বোট আর ওয়াটার ট্যাক্সি শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা করে বেড়াচ্ছে সারাদিন। পায়ে হেঁটে যেমন একরকম ভেনিস দেখা, জল থেকে দেখা আর-এক রকম।

গন্ডোলার পুরো ইতিহাস লিখতে গেলে আর-একটা প্রবন্ধ লিখতে হয়। চটজলদি বলা যেতে পারে যে, গন্ডোলার প্রতিটি অংশের মাপ, রং, আকৃতি সবকিছু কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, গন্ডোলার মাঝি বা গন্ডোলিয়ার হওয়ার জন্য বিরাট একটি পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। এতদিন শুধু ছেলেরাই এই কাজ করত, ২০১০ সালে জোর্জিয়া বসকলো নামে এক মহিলা প্রথম মেয়ে-গন্ডোলিয়ার হওয়ার সম্মান অর্জন করেছেন।

আমাদের প্রথম গন্তব্য সান্তা মারিয়া ডেলা স্যালু, ভেনিসের সপ্তদশ শতকে বানানো 'প্লেগ চার্চ'। কালো মৃত্যু বা প্লেগ মহামারীর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মানত করা এই চার্চটি গ্র্যান্ড ক্যানালের ওপর এক অপূর্ব শিল্পকর্ম, চার্চের ভেতরে টিশিয়ানের আঁকা ছবিগুলিও

সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে চব্বিশ ঘণ্টা ট্যুরিস্ট গিজগিজ করছে

অসাধারণ। সেখান থেকে একের পরে এক প্রাসাদ দেখতে দেখতে কেটে যাবে সকালটা—সোনার প্রাসাদ (Ca' d'Oro বা Palazzo Santa Sofia), রেজোনিকো এবং মোসেনিগো প্রাসাদ (Ca'Rezzonico আর Palazzo Mosenigo) দর্শন শেষ করে আপনি লাঞ্চ খেয়ে নেবেন। তারপর আবার লঞ্চে চেপে রওনা হতে হবে মুরানো এবং বুরানো নামে যুগল দ্বীপ ভ্রমণে, যাদের না দেখলে ভেনিস দেখা সম্পূর্ণ হয় না।

ভেনিসের দেড় কিলোমিটার উত্তরে সাতটি খুদে দ্বীপ নিয়ে মুরানো গ্রাম, মাত্র ৫০০০ লোকের বাসস্থান, কিন্তু এখানকার তৈরি রঙিন কাচের জিনিসপত্র সারা পৃথিবীতে রপ্তানি হয়। ত্রয়োদশ শতক থেকে এখানকার কাচের কারিগররা দুনিয়ার মদিরাপাত্র ভরে চলেছে, উৎসবের রাতে জ্বালিয়েছে চোখধাঁধানো ঝাড়লণ্ঠন। কারখানাগুলিতে বহু শতকের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে এখনও কাজ হয়ে চলেছে, ট্যুরিস্টরা সেই দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন। এখানে কাচও ভাস্কর্য হয়ে উঠেছে, সৌষ্ঠব, সুষমা আর রঙের অসামান্য মিশ্রণ দেখে যেমন মন ভরে যায়, দাম দেখে পিলে চমকেও ওঠে সেইরকম। শোনা গেল বাজারে ভেনিশিয়ান কাচের চৈনিক নকল বেরিয়ে গেছে, গোলা লোকের পক্ষে তফাত ধরা মুশকিল। কাচের কারখানা আর মিউজিয়াম ছাড়াও মুরানোয় দু'টি অসাধারণ গির্জা আছে, একটুখানি চুপ করে বসে থাকার জন্য জলের ধারে বেঞ্চি আর রেস্তরাঁরও অভাব নেই। সমুদ্রপক্ষীর দল আপনার নৈঃশব্দ্যকে অভিনন্দন জানাবে।

আরও কিছুটা উত্তরদিকে ঠিক একই রকম আর-একটি দ্বীপপুঞ্জের নাম বুরানো। কাচের বদলে এখানকার সওদা লেস। এখানকার মেয়েদের হাতে তৈরি লেস ইউরোপের সুন্দরীদের পোশাকের শোভা বাড়িয়েছে, যতদিন না আধুনিক যুগ এসে ফ্যাশনের খোলনলচে বদলে দিল। কিন্তু বুরানোর আসল সৌন্দর্য এখানকার উজ্জ্বল রং-করা বাড়িগুলো, জলের ওপরে যাদের প্রতিফলন আপনাকে রামধনুর দেশে নিয়ে যাবে। প্রতিটি বাড়ির রং ছন্দ-মেলানো নিখুঁত, জলের ওপর খুদে লোকালয়টি যেন কোন এক ওস্তাদ আর্টিস্টের তুলি দিয়ে আঁকা বিশাল ক্যানভাস।

> বুরানোর আসল সৌন্দর্য এখানকার উজ্জ্বল রং-করা বাড়িগুলো, জলের ওপরে যাদের প্রতিফলন আপনাকে রামধনুর দেশে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকটি বাড়ির রং ছন্দ-মেলানো নিখুঁত।

পরের দিন নিজের মতো করে ভেনিসে কাটানোর দিন। শিল্প আর বাণিজ্যের হাত ধরেই এই শহরে এসেছে কবিতা আর সংগীত। এই সময়টা আপনি পছন্দ করে ভেনিশিয়ান মুখোশ আর মুরানো কাচের জিনিসপত্র কিনতে পারেন। দুপুরে পেট ভরে পাস্তা খেয়ে এক চক্কর গন্ডোলা বিহার করতে করতে ঝিম ধরে আসবে। বিকেলে সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে মানুষের স্রোত দেখার জন্য বসে থাকা যায়। তখনই আপনি বুঝতে পারবেন আশপাশের স্যুভেনির ফেরিওয়ালারা মাঝে মাঝে বাংলায় কথা বলছে, বেহালাবাদকের সুরটাও চেনা-চেনা। গ্র্যান্ড ক্যানালের জল বিকেলের রোদ্দুরে ঝিকমিক করবে, বেল টাওয়ারের ছায়া লুটিয়ে পড়বে হাজার বছরের পুরনো পাথরগুলোর ওপরে। পছন্দমতো মুখোশটা মুখে লাগিয়ে আপনিও অপেরা হাউসের দিকে রওনা হবেন।

'রিদ্‌ম্‌'। শিল্পী মৃণালকান্তি গায়েন

ছায়াচঞ্চল ভাস্কর্য-মায়া

অরুণ ঘোষ

ভাস্কর্য

আদিম সভ্যতায় চিত্রচর্চা ও ভাস্কর্যনির্মাণ দুই-ই নিশ্চয় হত সমান হারেই, তবে তুলনায় বেশিরকম আলোচিত হতে দেখা যায় গুহাভ্যন্তরে আঁকা ছবির প্রসঙ্গই। স্পেনের আলতামিরা বা সুইটজারল্যান্ডস্থিত লাসকাউ গুহার চিত্রাবলি দেখে পিকাসোর স্বগতোক্তি আজ প্রায় সকলেরই জানা। অথচ শিল্পবেত্তারা নজর তেমন দেননি মহেঞ্জোদারোয় সৃষ্ট ভাস্কর্যের গুণবিচারে। খ্রিস্টজন্মের পঁচিশ বা তিরিশ হাজার বছর আগে আদিম পূর্বপুরুষেরা গড়েছিলেন অনেকানেক অনাবৃত নারীমূর্তি। তেমনই একটির নাম উইলেনডর্ফ ভেনাস, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো প্রস্তর ভাস্কর্য (অদ্যাবধি প্রাপ্ত নিদর্শনের নিরিখে)। বিশেষজ্ঞরা এর ভেনাস নামকরণে আপত্তি জানালেও তা বদলায়নি আজও, অর্থাৎ এই মূর্তির প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব নিয়ে জল্পনা কিছুটা হলেও আছে। তুলনায় অবশ্যই বেশিমাত্রায় আলোচিত নাইজিরিয়ার 'বেনিন' ভাস্কর্য। ওদেশের বেনিন রাজার গুহাভ্যন্তর থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তি লুঠ করে নিয়ে যায় বহুশত বেনিন ভাস্কর্য নিদর্শন। আজ তার সিংহভাগই আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। অবশিষ্টাংশের দেখা পাওয়া যায় জার্মানির হামবুর্গ সংগ্রহে এবং নাইজিরিয়ার জাতীয় সংগ্রহালয় লাগোস শহরে। ওই প্রাচীনকালের ভেনাস ভাস্কর্য যা এই লেখার শুরুতেই উল্লিখিত এবং বেনিন ভাস্কর্যের নির্মাণকাল অবশ্য বলা যায় ভিন্ন মেরুতে। বেনিন নিদর্শনগুলির জন্ম দশ বিশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে নয়, অতি সম্প্রতি অষ্টাদশ শতকে। নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, মানবশরীর ও মস্তিষ্কের গঠন গত ত্রিশ হাজার বছরে প্রায় অবিকৃত অতএব ভাস্কর্যকলার গঠনে স্থান ও কালের ভিন্নতা সত্ত্বেও চিন্তামিল অস্বাভাবিক নয়। প্রশ্ন হল, ভাস্কর্যের সূত্রে কাহিনিচিত্রণের বিকাশ এল কোন পথে? মাদার গডেস বা প্রিস্ট কিং, নর্তকী বা মন্দিরস্থিত দেবদেবী, এসবের সঙ্গে বেনিন ভাস্কর্যের পার্থক্যই হল ওই বর্ণনা-প্রাধান্য। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে বেনিনের শাসকের রাজত্বকালে ঘটে যাওয়া

ভাস্কর্যে অবয়ব সৃষ্টির প্রাধান্যই বেশি—অবয়বের ছায়ারূপ খোঁজে কে বা আর! ছায়া-উপচ্ছায়ার রূপছন্দ সার্থক ভাস্কর্যে ধরেছেন মৃণাল।

জলের তলায় প্রাণের অন্বেষণ

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ ভবিষ্যপ্রজন্মের কাছে রক্ষার তাগিদেই নাকি এই ভাস্কর্যকলার সূত্রপাত। ওঁদের সভ্যতার ইতিহাসের এইসব গুরুত্বপূর্ণ দলিল— যার জন্যই আবিশ্ব এর চর্চা অব্যাহত— লুঠ হওয়া ঐতিহাসিক ভাস্কর্য নাইজিরিয়া ফেরত পাবে কি?

মৃণালকান্তি গায়েনের ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আলোচনা প্রসঙ্গেই মনে উঠে এল এইসব। তার স্বপক্ষে বিশদ হওয়ার আগে মৃণালের জীবনকথাও কম প্রাসঙ্গিক মনে হবে না। কাকদ্বীপ ছাড়িয়ে গোসাবার এক প্রান্তভূমিতে কেটেছে তাঁর শৈশব, কলকাতা শহরের তুলনায় সেখানকার জীবনচর্যাও ছিল তেমনই প্রান্তিক। গ্রামের যে-প্রাইমারি স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই স্কুলের একটি মাত্র ঘর টিকে ছিল। তাতেই থাকত স্কুলের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষণদ্রব্যাদি। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর একধারে ছিল সেই ঘর, অপর পারে গ্রামের ক্লাবঘর আর একটি মাটির মন্দির। মাঝে ছিল তিন-তিনটি বিশাল বটগাছ, তার ছায়াতেই চলত পাঠচর্চা। পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই চোখ চলে যেত আদিগন্ত কৃষিজমি পেরিয়ে দূরদূরান্তে। রবীন্দ্রনাথ যে-প্রকৃতিপাঠের সুবন্দোবস্ত নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাসত্রে, শিশু মৃণালের মন দারিদ্রের হাত ধরে এখানে তাই-ই পেয়েছিল। গাছতলায় পাঠকালেই দেখতে শেখা প্রকৃতির নানা রূপ, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত। বসন্তের প্রারম্ভে পাকা বটফল আর পাখির পুরীষ টপটপ ঝরে পড়ে রাঙিয়ে দিত পড়ার বইখাতা বা শিক্ষকের মাথা। শীতের শুকনো পাতা হাওয়ার কোলে ভেসে আশ্রয় পেত পুষ্করিণীর জলতরঙ্গে। পালাপার্বণে আলপনা দেওয়ার সূত্রে গড়ে ওঠা কলাপ্রেম সম্বল করে তাঁর আর্ট কলেজের জীবন শুরু। ইতিমধ্যে কাকদ্বীপের স্কুলে সাঙ্গ হয়েছে মৃণালের স্কুলগণ্ডি, আর্ট স্কুলের দ্বারেই তাঁর পরিচয় হয় এক সিনিয়র ছাত্রের সঙ্গে। আর্ট ফোরাম গোষ্ঠীতে এই সূত্রেই অন্তর্ভুক্তি। তাদেরই পরামর্শে আর্ট স্কুলে ভাস্কর্যবিভাগে ভর্তি, কারণ চিত্রকলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ সীমিত।

ক্রীড়াছন্দ

এজন্য প্রাথমিক দক্ষতা আয়ত্ত করার প্রয়োজনও অনেকটাই বেশি। প্রস্তুতির এই প্রয়োজন তখনও জানা ছিল না মৃণালের।

মৃণালের শহরবাস, দাম্পত্য জীবন ও আর্ট স্কুলেই পাঠাত্তে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা— এ সবেও ইতিমধ্যে কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর। তাঁর সৃষ্টিমূলে আজও অবশ্য বিশেষ ক্রিয়াশীল তাঁর সেই সুন্দরবনের প্রান্তস্থিত গ্রামের শান্তভাব ও তৎসৃষ্ট প্রকৃতিমুগ্ধতা। এই সঙ্গে যোগ হয়েছে স্বতন্ত্রতার অদৃশ্য অথচ অমোঘ হাতছানি। পুকুরপাড়ে গাছপালা, ঝুলে আসা গাছের ডালে পাখির ওড়াউড়ি, পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে এর ছায়া-প্রতিচ্ছায়ার রূপ খুঁজে পেতে চেয়েছে মৃণালের মন ও চোখ। বলা বাহুল্য এ কাজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ভাস্কর্যে অবয়ব সৃষ্টির প্রাধান্যই বেশি— অবয়বের ছায়ারূপ খোঁজে কেই-বা আর।

অনেকেই মৃণালের কাজে পূর্বজ ও অগ্রগণ্য ভাস্কর, মুখ্যত মীরা মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য ঘরানার প্রভাব লক্ষ করতে চাইবেন। প্রবাদপ্রতিম ওই মহিলা-ভাস্করের রচনার মূলে সক্রিয় ছিল পূর্ব আফ্রিকার বেনিন উপজাতির শৈলীর প্রায় অনুরূপ মধ্যপ্রদেশের বস্তারের শৈলী। এও লস্ট ওয়াক্স পদ্ধতি। উক্ত জনজাতির বীরত্ব তথা জীবনসংগ্রামে সাফল্যের ব্রোঞ্জনির্মিত কাহিনিরূপ। শিল্প ভাস্কর্যকলার ইতিহাসে কাহিনিবর্ণনার প্রয়োজন এসেছে এমনতর রাজকাহিনির হাত ধরেই। অবশ্য মন্দিরগাত্রে দেবকাহিনিও অপ্রতুল নয়। বিংশ শতকে, মূলত বাংলায়, মীরা মুখোপাধ্যায়ই তাঁর ভাল লাগার মুহূর্ত নিয়ে গল্প-ভাস্কর্য রচনার এক নিজস্ব ধারা গড়ে তোলেন। সেই পথে আজ অনেকেই মাঝে-মধ্যে পা দেন। বিমল কৃণ্ডু বা সুনীলকুমার দাস বা নিরঞ্জন প্রধান প্রমুখ ভাস্কর এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দাবি করতে পারেন মৃণাল। এবার আসা যাক তাঁর বর্তমান আলোচ্য প্রদর্শনীর প্রসঙ্গে।

স্মৃতি রোমন্থন অর্থাৎ নস্টালজিয়ার ছন্দ— এই ছিল তাঁর এবারের মূল ভাবনা। আগেই বলেছি মৃণালের স্মৃতিভাণ্ডার উপচে পড়ছে তাঁর শৈশব কৈশোর এবং প্রাক্-যৌবনের গ্রামগঞ্জের মুহূর্তমালায়। বলা বাহুল্য এই স্মৃতির উত্তরাধিকার মৃণালের একচেটিয়া নয়। আরও অনেকানেক শিল্পী এমনতর ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন থেকে যান প্রায়শই। মৃণালের মূল সাফল্য সেই ভাবনা তথা স্মৃতি-স্থবির

বুনিয়াদে ভর করে স্বীয় ভাস্কর্যে তার ছন্দোময় প্রতিচ্ছবি ধরতে পারা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, তাঁরই একাধিক ভাস্কর্যের একটিতে দেখা যায় (শিরোনাম আলাদা কিছু নেই) পুকুরপাড়ে কেশরচনায় মগ্ন দুই গ্রাম-যুবতী। মৃত্তিকাময় পুকুরপাড়ও এখানে বিশেষ ছন্দোময় তার অসমৃণ গঠনে, বন্ধিম তটরেখায়, এবং সেই তটরেখায় সৃষ্ট অর্ধবৃত্তে স্পষ্টায়িত পুকুরের অগাধ জলে। দুই যুবতীকে ঘিরে গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদে জেগে উঠছে প্রাণের অস্ফুট তরঙ্গ। জল সইতে আসা গ্রামের মেয়েরা বিকেলের নরম রোদে খুঁজে নেয় দিনভর পরিশ্রমের পর ক্ষণিক আরাম। সেই রোদের রঙেই রেঙেছে তাদের গাত্রবর্ণ— অর্থাৎ রোজের পাতিনায় সৃষ্ট রং নির্বাচনেও শিল্পী রেখেছেন স্বীয় দক্ষতার স্বাক্ষর। 'এই যে এসব ছোটখাটো পাইনে এদের কূল কিনারা'— লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ওই যে ভাস্কর্যটিতে দেখা গেল তিনটি শিশুকন্যা ভূমিতে পড়ে থাকা গাছের ডাল বেয়ে নিঃশব্দ নৃত্যছন্দে ক্রীড়ারত, তাদের জীবনানন্দের স্পর্শ পেতে গাছের নতুন পাতাও সমান উদগ্রীব— এরকম একাধিক ভাস্কর্যে শিল্পী তাঁর দক্ষতার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। তবে এবারেও তাঁর সেরা কাজের অন্যতম প্রসঙ্গগুলির মধ্যে পূর্বদৃষ্ট প্রতিচ্ছায়ারূপই ছিল প্রধান। পুকুরের স্থির জলতলে ভাসে পদ্মপাতা, জলের বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠে মৃণাল, পদ্মকোরক। জলের নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছতায় চোখে আসে জলের তলায় প্রাণের অন্বেষণ। তার সঙ্গে যোগ দেয় স্থির জলে প্রতিফলিত ছায়া উপচ্ছায়া। এর সম্মিলিত রূপছন্দের নির্যাস ধরতে চেয়েছেন মৃণাল। বলা উচিত এ তাঁর ভাস্কর্যে সার্থকতার এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

অনেক কাজই ছিল তাঁর এবারের প্রদর্শনীতে। শিল্পী তথা ভাস্করের হাতে প্রদর্শ নির্বাচনের সময় প্রায়ই সংখ্যার গুরুত্ব প্রাধান্য পায়। তাঁরা যে স্বতঃক্রিয়াশীল এ কথা বোঝানোর জন্য যে প্রাচুর্যের বদলে উৎকর্ষই বেশি চর্চিত হওয়া উচিত, এই আবশ্যিক শর্তটি তাঁরা মাথায় রাখতে চান না। দক্ষ ও পেশাদার 'কিউরেটর'-এর সাহায্য নেওয়ার কথা তো আজও কল্পনাতীত। কথাটা ভাবা দরকার। মৃণালের কাজ দেখার সূত্রে মনে হল তাঁর একাধিক কাজ আরও বৃহত্তর আকারেই সম্ভবত বেশি মনোগ্রাহী হত। ইদানীং সরকারি আনুকূল্যে রাজপথের দু'পাশ সৌন্দর্যায়িত হচ্ছে। বসছে ফাইবার-গ্লাস নির্মিত বৃহদাকার পুত্তলিকা-সদৃশ মূর্তি। এসব স্থানে মৃণালের বৃহদাকার ব্রোঞ্জ অবশ্যই যোগ্যতর ভূমিকা নিতে পারে। বৃহৎ-পুঁজিতে বলীয়ান বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা এমন কর্মকাণ্ড স্পনসর করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে মৃণাল-সহ বাংলার নবীন ও প্রবীণ ভাস্কর, সকলেই সমান উপকৃত হবেন। শহরও সেজে উঠবে প্রকৃত নন্দন-শাসনে।

নাটক

দেওয়ান গাজির কিস্‌সা

মনিব আর চাকরের আপাত সংঘাতের আখ্যানের মাধ্যমে ব্রেখ্‌ট্ তুলে ধরেন সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের আসল চেহারা।

সুব্রত ঘোষ

সত্তর দশকের মাঝামাঝি শেখর চট্টোপাধ্যায় ব্রেখ্‌টের 'মিস্‌টার পুটিলা অ্যান্ড হিজ় ম্যান মাট্টি'র এক অসাধারণ অ্যাডাপটেশন 'পান্থ লাহা' উপহার দিয়েছিলেন বাঙালি দর্শককে। তাঁর থিয়েটার ইউনিটের সেই প্রযোজনাটি ছিল এই আলোচকের কাছে বাংলায় ব্রেখ্‌টীয় কমেডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই একই নাটক অবলম্বনে প্রগতির উপস্থাপনে 'দেওয়ান গাজির কিস্‌সা' নাটকটি দেখতে বসার সময়ে যদিও অতীতের সেই অভিজ্ঞতাকে মন থেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলাম, তবু একটা শঙ্কা মনে থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু নাট্যশেষে টের পেলাম, বাংলাদেশের প্রবীণ নট-নাট্যকার-নাটককার আসাদুজ্জামান নূরের নাটকটি তার ব্রেখ্‌টীয় চলনে ও নিজস্ব শক্তিতে যতটাই বলীয়ান, সন্দীপ ভট্টাচার্যর সামগ্রিক নাট্যনির্মাণেও তা ততটাই স্মার্ট এবং ব্রেখ্‌টকে মেনেই কমেডিয়া দেল আর্তে অনুসারী। বিভাস চক্রবর্তীও বেশ কয়েক বছর আগে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে আসাদুজ্জামানের এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন 'গাজী সাহেবের কিসসা' নামে। তবে, তা এই আলোচকের দেখা হয়ে ওঠেনি।

ব্রেখ্‌ট ১৯৪০ সালে এই প্যারাবেল সদৃশ নাটকটি লিখেছিলেন একটি ফিনিশ নাটক অবলম্বনে। এক ধনী জোতদার ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নানান সাম্যবাদী কথা বলে, হয়ে যায় দানসাগর এবং গরিবগুর্বো মানুষদের পোষণের ভার নেয়। সেই সঙ্গে সে কর্তৃপক্ষ শ্রেণির এক যুবকের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ের যে-আয়োজন করেছিল তাও ভেঙে দেয় মেয়ের এই বিয়েতে মত না থাকায় এবং তার চাকরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু নেশা কেটে ফের প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতেই সে হয়ে ওঠে এক অত্যাচারী নির্মম মানুষ, যে তার প্রজাদের সমস্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করে। এমন পরিস্থিতিতে তার চাকর তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কিন্তু সে তার মনিবের মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। কারণ সে বোঝে, সমাজে শ্রেণি লোপ করা অত সহজ নয়। মনিব আর চাকরের এই আপাত সংঘাতের আখ্যানের মাধ্যমে ব্রেখ্‌ট্ তুলে ধরেন সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের আসল চেহারা। নাটকটির সমালোচনা করতে গিয়ে এক সমালোচক বলেছিলেন, এই নাটক যে-বিশ্বের বার্তা বহন করছে— ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার সৎ প্রচেষ্টা কেমনভাবে শাসক শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির নেশাগ্রস্ত অবস্থার উদ্ধারসকে হারিয়ে দেয়— সেটা পাঠক বা দর্শকের কাছে যতটা গুরুত্বের, তার চেয়েও অনেক বেশি সুখকর ও মনোরম লাগে কেমনভাবে এক

প্রগতি-র উপস্থাপনা 'দেওয়ান গাজির কিস্‌সা'

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ দৃঢ় প্রত্যয়ে সেই ব্যক্তির উদ্ধারকে শমিত করে তাকে কঠিন বাস্তবে এনে ফেলে দেয়। নাটকে রয়েছে এমন বহু শ্রেষ্ঠ্যিয় নাট্য এলিমেন্ট, যা চিনিয়ে দেয় এই বিশিষ্ট ধারাকে। আসাদুজ্জামান তাঁর নাটকে এই সব শ্রেষ্ঠত্বিয় গুণগুলিকে কী অসাধারণ দক্ষতায় এনেছেন, তা প্রতিটি ক্ষণে উপলব্ধি করেন দর্শক। তাঁর বন্দীকরণ এতটাই সুনিপুণ যে, নাটকটি পেয়ে যায় এক মৌলিক নাটকের চেহারা।

এক মনোহারী সুর-লয়-ছন্দে সন্দীপ ভট্টাচার্য নির্মাণ করেছেন সমগ্র নাট্যটি। বেসুর লয়হীন একটি ক্ষণও নেই এই দেড় ঘণ্টার পরিবেশনে। এবং সবটার তিনি সহজ সরল পালার ধারায় রচনা করেছেন। কোনও গিমিক অথবা বৃথা ইন্টেলেকচুয়াল কেরামতিতে দর্শককে তাক লাগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেই। একটি মাত্র চৌকির সাহায্যে তিনি দৃশ্যগুলিকে চলন্ত রাখেন। দর্শকাসনের মাঝের পথ বা সামনের অংশের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার যেমন তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতার কথা বলে, তেমনই পাশশালা অথবা গোসলঘর বা বিয়ের দৃশ্যটির জন্য সামান্য কিছু সামগ্রী ব্যবহার তাঁর মননশীলতার পরিচয় দেয়। তাঁর সামগ্রিক পরিকল্পনাকে নিখুঁতভাবে রূপায়ণে সাহায্য করেছে মনোজ প্রসাদের অনাড়ম্বর আলো এবং দেবকুমার পালের কোরিওগ্রাফি— সেখানে মার্শাল আর্টের অযথা হাত-পা ছোড়া নেই— এবং উজ্জ্বলকুমার রায়ের সাদাসিধে সাজ। তেমনই, দলের অভিনেতাদের প্রত্যেকের নজর-কাড়া নিষ্ঠা ও অনুশীলিত মঞ্চক্রিয়া দলগত অভিনয়কে দিয়েছে এক নিটোল চেহারা। জমিদার গাজির চরিত্রে রাহুল দেব ঘোষ স্বাভাবিক কারণে অনেকখানি ভার বহন করেছেন। এবং তা তিনি করেছেন সুচারু রূপেই। তাঁর অভিনয়ের সাবলীলতা চরিত্রটির দু'টি চেহারাকেই দর্শকের সামনে উপস্থিত করে অতি সহজে। চাকর মাখনের চরিত্রে রাকেশ দুগারও ততোধিক সাবলীল এবং চরিত্রটির নানাবিধ টেনশন দর্শকের কাছে সহজে পৌঁছয়। কন্যা লাইলি চরিত্রে সহেলী চৌধুরীর কাজ দর্শককে তাক লাগিয়ে দেয় তাঁর সংলাপ উচ্চারণ, প্রক্ষেপণ, অভিব্যক্তি প্রকাশ এবং দিধাহীন মঞ্চ ব্যবহারে। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখ করতে হয় সাকিনার ভূমিকায় সীমা চ্যাটার্জি, দারোগার ভূমিকায় অমিত কুমার দাস, মোক্তার চরিত্রে শঙ্কর পাল, কাজির ভূমিকায় প্রভাত মিত্র এবং চেয়ারম্যান চরিত্রে আবির ঘোষের নাম।

পরিশেষে একটি ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে হয়। অভিনয় শুরুর নির্দিষ্ট সময়টাকে প্রায় সব দলই মান্যতা দিয়ে উল্লিখিত সময়ে তাঁদের অভিনয় শুরু করেন। কিছু ক্ষেত্রে সময় পার হয়ে যাওয়ার পর অভিনয় শুরু করতে হয়। কিন্তু গিরিশ মঞ্চে সেদিন অভিনয় শুরু হয়ে যায় নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগেই। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা বটে।

রাজরক্ত

■ আমাদের রাজ্যের ইতিহাসের যে সময়টাকে তার একাধিক রাজনৈতিক অনুষঙ্গ এবং গভীর সার্বিক প্রভাবের কারণে অনেকেই চিহ্নিত করেন হয়তো-বা সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সময় হিসেবে, এমনকী চৌত্রিশ বছরের বাম শাসন অবসানপর্বের ঘটনাক্রমের চেয়েও বেশি— সেই ছয়ের দশকের দ্বিতীয় আর সাতের দশকের প্রথম ভাগের টালমাটাল সময়ের ইতিহাসে যখন দেখা দিচ্ছিল নতুন সমীকরণ, নতুন প্রতিবাদী ভাষা, নতুন সামাজিক ব্যবস্থা পত্তনের চেষ্টা, তখন বাংলা নাট্য ইতিহাসেও দেখা গিয়েছিল এক নতুন জাগরণ। এবং তার একাংশ ঘটেছিল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'গিনিপিগ' নাটকের হাত ধরে। থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় ও বিভাস চক্রবর্তীর নির্মাণে সে নাটক 'রাজরক্ত' নামে রঙ্গনা থিয়েটারে বাংলা নাট্যজগতে বিস্ফোরণ ঘটাল ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে। মোহিতের নাটক যেমন ছিল রাজনৈতিক নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ তেমনই বিভাসের নাট্যনির্মাণের প্রতিটি অংশে ফুটে উঠেছিল তাঁর গভীর রাজনৈতিক বোধ। ফলে চারটি চরিত্র নিয়ে সেই সময়টাকে এমনভাবে কাটাছেঁড়া করে মোহিত-বিভাস মানুষের সামনে মেলে ধরলেন যে-রাজনৈতিক থিয়েটার পেল এক নতুন সংজ্ঞা। ওই বছরের মে মাসে দলের সদস্য ও অন্যতম অভিনেতা সত্যেন মিত্রকে নিহত হতে হয় লুম্পেন রাজনীতির বলি। ফলে বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায় আর মায়া ঘোষের সঙ্গে সত্যেন মিত্রর পরিবর্তে মঞ্চে আসেন রাম মুখোপাধ্যায়। সেই অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের অনেকেরই চৈতন্যে লেগেছিল প্রবল ঢেউ। দর্শকের মধ্যে স্বভাবতই যেমন ছিলেন বিভিন্ন জগতের মানুষ, তেমনই ছিলেন নানান বয়সের দর্শক। দর্শকের যে অংশ সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হয় সচরাচর, সেই অনুভবী পরিবেশে বেড়ে ওঠা সদ্য যৌবনে পা দেওয়া সচেতন তরুণ দলে ছিলেন এই আলোচক। এবং আরও অনেকের মতোই সমাজ-রাজনীতি বিষয়ে এক নতুন অনুভূতি যেন জন্ম নিল তাঁর মধ্যে এই নাটক দর্শনের পর।

সেই নাটকটিই সাতচল্লিশ বছরের ব্যবধানে মঞ্চে আনলেন অন্য থিয়েটার, সেই কিবদন্তি নাট্যনির্মাতা বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনাতেই। সচরাচর আগের দেখা কোনও নাটক নতুন করে প্রযোজিত হলে অত্যন্ত সচেতনভাবেই সেই আগের দেখাকে মন থেকে সরিয়ে নতুন চোখে নতুন কাজটি দেখতে চেষ্টা করি। এ ক্ষেত্রেও মঞ্চের ওপর যে-নাট্যটি উপস্থাপিত হল সেদিন মধুসূদন মঞ্চে, তাকে নতুন চোখে দেখতে হয়তো সমর্থ হয়েছি, কিন্তু চার দশক আগে দেখা নাটকটির স্মৃতি ভুলি কেমন করে? সেই সময়ে নাটকটি মনের গভীরে যে-অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল, তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। তাই সেই নাট্যটি যে-রাগ, যে-ঘৃণা তৈরি করেছিল, সেই অনুভবের কাছে বর্তমানের কাজটি ব্যক্তিগতভাবে আমার যেন বড়ই প্রিয়মাণ মনে হয়েছে। সময় বা কাল এখানে বড় বালাই। যে সময়টাকে চিনিয়ে দিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় কলম ধরেছিলেন অথবা শক্তিশালী প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চেয়ে বিভাস চক্রবর্তী দর্শককে দিয়েছিলেন নীরবে কণ্ঠ মেলানোর ডাক, সেই সময়টা আজ আর নেই। হয়তো সমগোত্রীয় কিংবা আরও চতুর রাজনৈতিক সময়ের মুখোমুখি আমরা আজ। কিন্তু তার চেহারা, তার পদ্ধতি ও প্রকাশ, তার প্রভাব ও ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। তাই সত্তর দশকের আতঙ্কাচ্ছন্ন সাহায্যে তাকে চিহ্নিত করা যাবে না। তবে

অন্য থিয়েটার প্রযোজিত নাট্য 'রাজরক্ত'-র একটি দৃশ্য

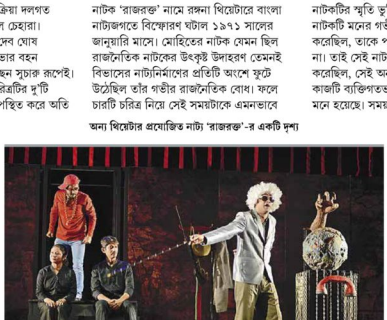

এই নাটক যে কারণে আজও গুরুত্ব পাবে তা হল নিপীড়ন যেহেতু দেশ-কাল নিরপেক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যেহেতু 'আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব সমস্যাই চিরকালের', তাই সেই নিপীড়ন সম্পর্কে সজাগ থাকার প্রয়োজনের কথা এবং 'একা নয়, সকলে মিলে প্রতিবাদ' করার কথা জানিয়ে দেয় এই নাটক।

এতটা অ্যারিস্টাঙ্কি ও নন-অ্যারিস্টটলীয় অথচ গতিশীল নাটককে সাতচল্লিশ বছর পর নতুন করে মাউন্টিং করা যে কী অসম্ভব এক চ্যালেঞ্জ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বয়সের স্বাভাবিক ধর্মকে তুড়ি মেরে বিভাস চক্রবর্তী সেই চ্যালেঞ্জকে কী অনায়াসে অতিক্রম করেছেন তা প্রযোজনাটি না দেখলে মালুম হবে না। হতে পারে পুনর্নির্মাণ কিন্তু আধুনিক নাট্যরীতির এমন সুচারু প্রয়োগ কে অস্বীকার করতে পারবে? না, আধুনিক চল মেনে মুখোশ পরিহিত কোরাসের নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালন বা প্রেক্ষাপটে কোনও স্থির বা চলমান ছবির প্রক্ষেপণের মতো থিয়েট্রিকাল এলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি। চারটি চরিত্র সরাসরি উপস্থিত হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট ভূমিকা তাদের অনিত্য। তাই সংলাপ উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের নানা ব্যবহার, মঞ্চের ব্যবহার, তাদের পোশাক, এবং অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মাধ্যমে রচনা হয় এক ধারাভাষ্য, যা মানুষে মানুষে এবং মানুষের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। স্বাভাবিক কারণেই সাতচল্লিশ বছর আগে বিভাস চক্রবর্তীকে যতটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল এই ব্যাখ্যাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে, তার বহু গুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে আজকের চার তরুণ অভিনেতাকে সেই অভিঘাত উপলব্ধ করাতে। আজকের প্রজন্মের অভিনেতাদের কাছে নাটকের লেখা পঙ্‌ক্তিগুলির অনুষঙ্গকে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। সেই সময়ে যে-অভিনেতারা কাজগুলি করেছিলেন তাঁরা যেন যাপন করেছিলেন সেই পঙ্‌ক্তিগুলি। ফলে প্রতীক দত্ত, তথাগত চৌধুরী, চিরঞ্জীব নাথ বা সুস্মিতা হাটিদের কাজে পাওয়া গেল গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে নির্দেশকের প্রতিটি নির্দেশকে মান্য করার প্রচেষ্টা। তাঁরা প্রত্যেকেই বাহবা পাবেন। মঞ্চ বা আলোর পরিকল্পনায় নির্মাতা কিছু নতুন চিন্তার প্রয়োগ করেছেন, তবে সেই বদ্ধ কারাগার বা মগজ ঘোলাই ঘরের সাজেশন ততটাই ভয়ংকর থেকেছে। সৌমিক-পিয়ালীর মঞ্চ আর সুদীপ সান্যালের আলো যেমন একদিকে একে অপরের পরিপূরক, তেমনই নাট্যচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এই দুই বিভাগ। সমগ্র মঞ্চ উন্মুক্ত থেকেও গারদের ছায়া যেমন সর্বত্র, তেমনই 'রাজা'র সর্বত্রগামী সার্চলাইট যেন লম্বভঙ্গ করে দেয় আত্মপ্রত্যয়কে। সৌরেশ দত্তর আবহ এই প্রযোজনাকে দিয়েছে তার শ্রবণগত দৃঢ়তা। যে মিউজিকস্কেপটা তৈরি হয়, তা যেন নাট্যটিকে পৌঁছে দেয় ভিন্ন স্তরে। শুচিস্মিতা দাশগুপ্তর পোশাক পরিকল্পনায় কিছু আধুনিক ছোঁয়া দর্শকের নজর কাড়ে।

নাট্যকারের কাছে জানা গেল, এই নাট্যে ব্যবহৃত 'ওদের হাতে আইন' গানটি শ্রেখটের 'মাদার' নাটকের গান, যেটি শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করে দিয়েছেন এবং মুরারি রায়চৌধুরী তার সুর করেছেন। এই সংযোজনটি প্রযোজনাটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

• • •

'উমা' ছবিতে যীশু সেনগুপ্ত ও সারা সেনগুপ্ত

চ ল চ্চি ত্র

উমা

ইচ্ছেপূরণের গল্প নিয়ে তৈরি এই হিউম্যান ড্রামা দেখতে বসার আগে বেশ কিছু অসম্ভবকে মেনে নিতে হবে।

সা য় ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

সুজিত মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ছবি 'উমা'-র কাহিনি-উৎস কানাডার ইভান লিভারসেজের জীবন। রেন টিউমরে আক্রান্ত অন্টারিও-র বাসিন্দা ইভান আরও-একটি ক্রিসমাস দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু ডিসেম্বর অবধি সময় তার ছিল না। মা নিকোল অসমরেই ক্রিসমাসের আয়োজন করেছিল ইভানের জন্য। সাত বছর বয়সে মৃত্যু হয় ইভানের, সত্যিকারের ক্রিসমাসের বেশ কয়েকদিন আগেই।

সুজিতের উমা (সারা সেনগুপ্ত) মারণ-ব্যাধিতে আক্রান্ত। সে সুইট্জারল্যান্ডে থাকে, বাবা হিমাদ্রির (যিশু সেনগুপ্ত) সঙ্গে। হিমাদ্রি সিঙ্গল ফাদার। স্ত্রী মেনকা (সায়ন্তিকা) অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে সংসার ছেড়েছে। ডাক্তার হিমাদ্রিকে একদিন বলে দেয়, মেয়ের শেষ যা-যা ইচ্ছে আছে, সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করে দিতে। কারণ, সময় নেই। উমার একটিই ভীষণ ইচ্ছে— বাবার কাছে বহু-শোনা কলকাতার দুর্গাপুজো দেখার। কিন্তু হিমাদ্রি বোঝে, শরৎকাল পর্যন্ত সময় উমার হয়তো নেই। প্রচলিত অকালবোধনেরও "অকালবোধন" আয়োজনের চেষ্টায় নামে হিমাদ্রি, খোদ কলকাতায় এপ্রিল মাসে দুর্গাপুজো দেখাতে হবে! হিমাদ্রির এই অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা, তার রূপায়নই 'উমা' ছবির প্রেক্ষিত।

ইচ্ছেপূরণের গল্প-ভিত্তিক হিউম্যান ড্রামায় কিঞ্চিৎ 'উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ' রাখতে হয়। বুঝতে হয় যে, সিনেমা যতটা আমাদের কাছাকাছি আসতে চায়, ততটাই তা আমাদের অসাধ্যসাধনের প্রতীক। 'উমা'-ও তেমন এক অসাধ্যসাধনের মেটাফর। তাও, সব মেনেই বলতে হয়, মেটাফর এক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেল আর কী। মানে, কলকাতার দুর্গাপুজো ক্রিক্রিয়েট— এই শব্দক্রমই একটি প্যারাডক্স। একটি ভাইফোঁটা, রাখি-উৎসব, একটি দোল করে ফেলা যায়। কিন্তু দুর্গাপুজো, বিশেষত কলকাতার দুর্গাপুজোর (লন্ডনের ক্রিসমাসের ক্ষেত্রেও একই কথা যেমন প্রযোজ্য) ব্যাপ্তি, পরিধিই সেটির সমস্তরকম 'রিক্রিয়েশন'-এর অন্তরায়। না হলে এ ছবির পরিচালককেই-বা কেন দেখপ্রিয় পার্ক, মহম্মদ

আলি পার্কের পুজো দেখাতে আসল দুর্গাপুজোয় শুটিং করে নিতে হয়? ওই ফুটেজই! যাঁরা এখনও দেখেননি, তাঁদের জন্য এ তথ্য একটি স্পয়লার, মানছি) প্রমাণ করে দেয় কী অসম্ভব কাজে নেমেছিল হিমাদ্রি। কলকাতা থেকে দূরে কোথাও, গ্রামের বাড়িতে, জমিদার বাড়িতে সেট করলে বোধ হয় ছবিটির আখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকখানিই বাড়তে পারত। এ ছাড়াও গল্পের উপস্থাপনায় এমন একাধিক গলদ আছে যেগুলি উপেক্ষা না করলে ছবিটি সম্ভবত তৈরিই করা যেত না।

দ্বিতীয়ত, সৃজিত ছবিটিতে একটি পরিচিত তথা পৌরাণিক ট্রোপ ব্যবহার করেছেন— অশুভের পরাজয়, শুভের (বা এই ছবিতে যেমন শুভ ইচ্ছের) জয়। এখানে উমা, উমার দুর্গাপুজো দেখার ইচ্ছে হচ্ছে 'ইনোসেন্স'। এই ইনোসেন্সের বিপরীতে আছে প্রাথমিকভাবে ফ্রাঙ্কেস্টেড চলচ্চিত্র পরিচালক ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্তী (অঞ্জন দত্ত), অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিক মহীতোষ সুর (অনির্বাণ ভট্টাচার্য), এক অবাঙালি গুন্ডা (বাবুল সুপ্রিয়)। এবং খুব প্রেডিক্টেবলি-ই এঁরা প্রত্যেকে উঠতে চাই। তবুও, সিনেমার খাতিরেই মুহূর্ত-রচনা তো প্রয়োজনীয়। আর, মুহূর্ত-রচনার অর্থ সুইচফ্লারল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রচার করা নয় নিশ্চয়।

ছবিটির জোরের দিক সংগীত। সুরকার-গীতিকার হিসেবে অনুপম রায়ের কাজ প্রশংসনীয়। অভিনয়ও সকলেরই ভাল। অঞ্জন দত্ত এখনও বুঝিয়ে দেন ('স্থানবিশেষে আরোপিত ম্যানারিজ়ম সত্ত্বেও), অভিনয়ে তিনি কতটা দক্ষ। অনির্বাণ প্রত্যাশিতভাবেই ভাল। তুলনায় যিশু যেন কিছুটা ম্লান। সারা সেনগুপ্ত প্রথম ছবিতে বেশ স্বাভাবিক। তবে চমকে দিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। বাচনে-বলনে-চলনে তাঁর উপস্থিতি, সংক্ষিপ্ত হলেও, মনে থাকবে।

• • •

জুরাসিক ওয়র্ল্ড: ফলেন কিংডম

■ সত্যি বলতে, এই রাজত্ব শৈশবের। এবং দিনের পর দিন ধরে নির্দয়ভাবে সেই রাজত্বের পতন ঘটিয়ে, তা দলেমুচড়ে দিচ্ছেন ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের

'জুরাসিক ওয়র্ল্ড: ফলেন কিংডম'-র একটি দৃশ্য

ইনোসেন্সের উপস্থিতিতে বা স্পর্শে 'ব্যাড ম্যান' থেকে 'গুড সোল'-এ পরিণত হবেন। সমস্যা হচ্ছে, ভাবনা ভাল হলেও ছবিতে-চিত্রনাট্যে প্রয়োগ দুর্বল। এঁদের ক্যারেকটার শিফট অতি অনুমেয় হয়ে পড়ে। শিফটের ধরনটিও ক্লিশেড, মেলোড্রামাটিক— উমার সামনে এসে/ উমার ছবি দেখে উস্‌কে উঠছে ব্যক্তিগত বেদনার স্মৃতি, উমার ব্যবহারে-কথায় ঘটছে বোধোদয়।

তৃতীয়ত, ছবিটির দৃশ্যনির্মাণও বেশ দুর্বল। এরকম একটি কাহিনিকে কয়েকটি শক্তিশালী 'মোমেন্টস' জরুরি ছিল যা স্মরণে থেকে যাবে, অভিঘাত সৃষ্টি করবে। আফেপ, সে-সব কিছুই নেই। দর্শকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কোথাও যেন ব্যর্থ হচ্ছে ছবির কাহিনিকথন। দাবি এমন নয় যে, মর্মন্তুদ বিষয় নিয়ে ছবি দেখেও না কাঁদলে সে-ছবি ছবিই নয় বা 'কষ্টের-ছবি-দেখছি-অথচ-কান্না-আসছে-না-তো' বলে বাহকরা। এই ছবির নামটিতেও সেই বার্তাই ধরা রইল। হলিউডি ছবির অধুনা ট্রেন্ড, সফল ফ্র্যাঞ্চাইজ়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা। সারা বছর ধরে সুপারহিট্‌সা ছবির মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার আয় করা এবং তা নিতান্ত নিরাপদে! তার সঙ্গে 'পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান', 'জুরাসিক পার্ক'... ফ্র্যাঞ্চাইজ় ছবির কোনও অভাব নেই। আর এই একঘেয়েমিতে, লেখা কচলানোতে যা হয়... ফ্র্যাঞ্চাইজ়গুলি অত্যন্ত নিম্নমানের দিকে এগোতে থাকে। জুরাসিক পার্ক ফ্র্যাঞ্চাইজ়ের ক্ষেত্রেও এটিই হয়েছে। প্রথম সেই ছবির যে, পরিসর এবং যে চমকে দেওয়া ছিল, তা কালের ধাক্কায় বহুদিন হল অদৃশ্য। তবু নস্টালজিয়ার টানে হলমুখো হন মানুষ। আর তারপর... কাহিনি এই, খোদকারির ফলে তৈরি ডাইনোসরগুলি আগ্নেয়গিরির কবলে অবলুপ্তির পথে। তাদের উদ্ধার করার দায়িত্ব পড়েছে ডাইনোপ্রেমী ক্লেয়ার (ব্রাইস ড্যালাস হাওয়ার্ড) এবং ওয়েনের (ক্রিস প্রাট) উপর। তবে এর পিছনে দুরভিসন্ধি আছে কিছু মানুষের। সময়টা তো জিন-যুদ্ধের। ফলে তৈরি হচ্ছে মারণাস্ত্র। ডাইনোসরদা ব্যবহৃত হতে চলেছে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে। এমনকী, 'ইন্ডোর‍্যাপ্টর' নামে একটি হাইব্রিডও তৈরি হয়েছে এর জন্য। ছবির শেষ নিয়ে এসব ক্ষেত্রে কিছু বলার থাকে না, ওটা সবারই জানা। স্পেশ্যাল এফেক্টস নিয়েও কিছু বলার থাকে না। এ যুগে ওটা কোনও আলাদা করে বলার বিষয় নয়। জে এ বাজোনার হবিতে আছে অন্য অনেক কিছু। প্রথমত ছবির 'পেট' থিম, খোদার উপর খোদকারির কুপ্রভাব, আছে জিনবিজ্ঞান ব্যবহারের কুপ্রভাব, যুদ্ধ, আছে যৌনতাও। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হলেও, 'মনস্টার আন্ডার দ্য বেড'-এর প্রচণ্ড যৌনগন্ধী ধারণাটা এ ছবিতে বেশ বলবৎ। বাজোনা হরর ফিল্ম পরিচালক হিসেবে পরিচিত। ফলে ছবিতে পরিবর্তে এ ছবির ডাইনোসরদের দৌড়োদৌড়ি একটি থ্রিলিং বাড়িতে। দুঃস্বপ্নদের বাসা তো এইসব বাড়িতেই। ছোট্ট মেয়েটি নিজের বিছানায় কম্বলের নীচে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে, বারান্দা দিয়ে দরজা খুলে ইন্ডোর‍্যাপ্টর ঢুকে পড়ে, এগিয়ে দেয় নখযুক্ত হাত। পায়ের আঙুল ঠোকা, হাত এগিয়ে দেওয়া... এগুলি প্রচুর হরর ছবিতে দেখে আমরা অভ্যস্ত। পরিচালক যা-ই দেখানোর চেষ্টা করে থাকুন, এই দৃশ্যগুলি কখনও একটু হাস্যকরও বটে। ইন্ডোর‍্যাপ্টরের মুচকি হাসিটি আরও হাস্যকর। ভিলেনরা যেমন স্বাভাবিকভাবেই চিনা, রাশিয়ান ও মার্কিন অর্থলোভী, তেমনই ছবিতে নারীশক্তির জয়জয়কারের কাহিনিও আছে। ইন্ডোর‍্যাপ্টর 'মেয়েলি' তীক্ষ্ণ আওয়াজকে লক্ষ করে। আর, যে ডাইনোসর হারাবে ইন্ডোর‍্যাপ্টরকে (বলেই ফেললাম... আচ্ছা, ভারতীয় নামের অ্যাঙ্গল রাখা কি রাজসরাস অবিকৃত হওয়ার কারণে?), সেই 'ব্লু' তো ওয়েনের পোষা সেই 'মা' ভেলোসিরা‍্যাপ্টরটি! বেজামিন লকউডের নাতনির সাহস তো আছেই। জিন বিজ্ঞানের ফসল সে-ও, সেদিক থেকে বিজ্ঞানের হয়েও একটু খেলা হল। ছবির বেশির ভাগটাই একঘেয়ে এবং অতিদীর্ঘ। কিন্তু আশ্চর্যভাবে দ্বীপের মধ্যে উদ্ধারকার্যটি ঝড়ের মতো পট পরিবর্তন এবং কাহিনি পরিবর্তন করে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়! ছবিটি ওখানেই শেষ কি না, এমন প্রশ্নও জাগে। অতিকিছু, অত দ্রুত দেখালে ক্লান্ত এবং হাস্যকর মনে হয়, বাজোনামশাই। অভিনয়ে একমাত্র জাস্টিস স্মিথ ভাল। সব মিলিয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল শৈশবের পৃথিবীটা! জেফ গোল্ডব্লুমকে ছোট্ট ভূমিকায় আনলে সে ক্ষতে প্রলেপ পড়ে না। আচ্ছা, এবার বন্ধ করলে হয় না?

ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়

গোপন কথাটি

ম ণী শ ন ন্দী

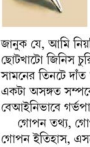

আমাদের সকলেরই কোনও না-কোনও গোপন কথা আছে, যা আমরা চাই না অন্যরা সবাই জানুক। কারও বেশি, কারও কম। হতে পারে আমি চাই না কেউ জানুক যে, আমি নিয়মিত অফিস থেকে ছোটখাটো জিনিস চুরি করি। কিংবা আমার সামনের তিনটে দাঁত আসলে নকল দাঁত। অথবা একটা অসঙ্গত সম্পর্কের পর আমার বোন বেআইনিভাবে গর্ভপাত করাতে বাধ্য হয়েছে।

গোপন তথ্য, গোপন ঘটনা, গোপন সম্পর্ক, গোপন ইতিহাস, এসবের বোঝা আমরা সবাই বয়ে বেড়াচ্ছি। কারও বেশি, কারও কম। সাধারণত দু'ধরনের জিনিস আমরা গোপন রাখি। এক নম্বর, যেটা লজ্জার। জসেলিনের সঙ্গে অনেক বছর কাজ করার পর একদিন আমাকে বিশ্বাস করে বলল যে, একজন সহপাঠী ওকে ছাত্রাবস্থায় ধর্ষণ করেছিল এবং তাতে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়। দু'নম্বর, যেটা হিতকর, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের সুবিধাথে। ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্কে আমার এক সহকর্মী সযত্নে গোপন রেখেছিল যে, সে নিয়মিত কোকেন-সেবক।

আমরা চাই লোকজনকে দেখাতে যে, আমরা কৃতী ও কুশলী, সক্ষম ও সফল। আমরা যা কিছু করেছি, তা বাড়িয়ে বলি, যা কিছু করিনি বা করতে পারিনি, তার উল্লেখও করি না। অন্যদের অসম্পূর্ণ জানার সুযোগ নিয়ে আমরা আমাদের একটা মেকি পরিচিতি বানিয়ে ফেলি, তারপর দিনের পর দিন সেই পরিচিতিটা মেজে-ঘষে উজ্জ্বলতর করার চেষ্টা করি। সারা জীবনে যতজনকে চিনেছি— আত্মীয়, বন্ধু, প্রেমিক, চাকর, সহকর্মী, শিক্ষক— তারা যদি সবাই মিলে আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করার চেষ্টা করত, তা হলে হয়তো আমার একটা সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু সে-সম্ভাবনাটা নেই জেনেই আমরা অবলীলাক্রমে নিজেদের একটা চাকচিক্যময় চেহারা বানাতে এবং জানাতে চাই। তাই গোপন কথার এত প্রয়োজন।

যে-কারণেই আমরা কিছু গোপন রাখি না কেন, তার ভার কম নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন এর চাপ অসামান্য— মানসিকভাবে, এমনকী শারীরিকভাবে। কাজের সূত্রে কূটনীতিকের ভেকধারী একাধিক গুপ্তচরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাদের মুখেই শুনেছি গোপনীয়তা তাদের জীবন কীভাবে ভারাক্রান্ত করেছে, এমনকী, তাদের পারিবারিক জীবন কীভাবে বিষাক্ত হয়েছে। লিঙ্কন বলেছিলেন, নির্ভুল মিথ্যুক হতে হলে নির্ভুল স্মৃতিশক্তি দরকার। শুধু কি স্মৃতিশক্তি? দরকার নিশিদিন সতর্কতা, নিরন্তর কল্পনাপ্রয়োগ এবং শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অবিশ্রান্ত প্রয়াস। এ এক বিরাট বোঝা।

যেহেতু আমরা সকলে সবসময়েই আদর্শ জীবনযাপন করি না, তাই এটা হতেই পারে যে,

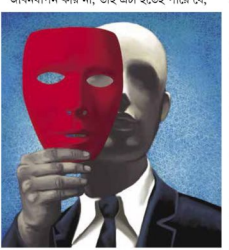

ছবি: শিপ্রা রেজিয়া

আমার ছোটখাটো একটা নেশা আছে বা বিয়ের বাইরে আমার একটা অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। আমি ভাবি এটা নিয়ে কিছু করার নেই, এটা লুকিয়ে রাখাই ভাল। তখন আমার সামনে সাধারণত দুটো পথ খোলা থাকে। একটা পথ হল ভেবে দেখা, আমার সম্বন্ধে কাদের অভিমত আমার কাছে মূল্যবান, কোন কথাগুলো গোপন করে কীভাবে তাদের ভাল অভিমত আমি অর্জন করতে পারি। তখন থেকে শুরু করে তাদের সঙ্গে সত্য সংক্ষেপ করে আমি সর্বদা একটা নাটকসুলভ সংলাপ চালিয়ে যাব।

অন্য পথটা হল নিজের কাছেই সত্যটা গোপন করা। বুদ্ধিমান পুরুষ বা নারীর চেয়ে নিপুণ আত্মপ্রতারক আর কেউ নয়। আমি যদি মদে আসক্ত হই, তা হলে চতুরভাবে নিজেকে বোঝাব যে, আমি অতি অল্পই মদ খাই, আমি মদ খাই কখনও-সখনও নেহাত শখ করে এবং মদের বিশেষ কোনও কুফল নেই। আমি যদি পরিবারের অন্যদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করি, আমি মনে-মনে যুক্তি খাড়া করব, ওটা মোটেই নির্যাতন নয়, ওটা শুধু শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা এবং সেটাও শুধু তাদের মঙ্গলেরই জন্য। মনোবিজ্ঞানী রবার্ট ট্রিভার্স লিখেছেন, অন্যদের মিথ্যে বলাটা অনেক সহজ হয়ে যায় যদি আমি নিজেই সেই মিথ্যেটা বিশ্বাস করি। ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে আছে ফিয়ডর কারামাজভ বউকে পেটাত, তারপর বন্ধুদের করুণকণ্ঠে বলত যে, বউ তাকে পেটায় এবং এমনই আন্তরিকতার সঙ্গে এই গল্প বলত যে, বলার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদতে শুরু করত।

আমাদের কারও কারও আবার গোপনীয়তা রক্ষা করার একটা বিশেষ প্রবণতা থাকে। তারা কিছুতেই তাদের মুখোশটা সহজে খুলতে চায় না। কখনও কখনও এটাই তাদের স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনও কিছু খুলে বলা, নিজের আসল চেহারাটা দেখানো তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এটাই তারা শিখেছে ঘোটে পরিবারে বা সমাজে যে, অন্যদের বিশ্বাস করা, অকপটে তাদের কিছু বলা বোকামি। সব কিছু গোপন রাখাই সমীচীন। কখনও আবার তারা এমন কোন কাজ করেছে বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে— গুপ্তচরবৃত্তি একটাই মাত্র উদাহরণ— যাতে তাদের মনোভাব গোপনমুখী হয়েছে।

আমাদের প্রত্যেকেরই খানিকটা আপন, নিভৃত সময় দরকার। কিন্তু সেইসঙ্গে দরকার অন্যদের সঙ্গে সত্যিকারের সম্বন্ধস্থাপন। নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারগুলোই যদি গোপন কথা বলে লুকিয়ে রাখি, তা হলে সবসময়েই একটা বিরাট বোঝা অযথা নিজের মাথার ওপর চেপে থাকবে। ভেবে দেখা উচিত এত গোপনীয়তার প্রয়োজন কেন এবং কী পরিস্থিতি আমাকে এই অযাচিত গুরুদায়িত্বে নিষ্পেষিত করছে। হতে পারে পরিস্থিতিটাই অস্বাস্থ্যকর। কিংবা পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে আমিই অযাচিতভাবে সন্ত্রস্ত। কার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি?

কাকে বিশ্বাস করে এসব ব্যাপার নিয়ে খোলামনে আলোচনা করতে পারি? যে-বোঝা আমি এতদিন ধরে বয়ে চলেছি, সেটা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করা আমার ভবিষ্যৎ সুখশান্তির একটা বড় নির্ধারক। এবার সেটা জলাঞ্জলি দেওয়ার সময় এসেছে, অংশত হলেও।

মতামত লেখকের

পু ণ্য প্র স ঙ্গ

সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়
(সম্পাদিত)
চৈতন্য চরিতামৃত
৫০০.০০

শ্রীচৈতন্যের জীবনী হিসাবে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার বিশ্লেষণে ও সংগঠনেও তেমনই, এ-বই দ্বিতীয়রহিত। ভক্ত বৈষ্ণব, সাধারণ সাহিত্যামোদী ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসরসিক— প্রত্যেকের পক্ষেই এ এক অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

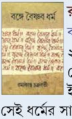

রমাকান্ত চক্রবর্তী
বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম
২০০.০০

কোনও ধর্মের ইতিহাসের উপাদান সেই ধর্মের সাহিত্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এই গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা থেকে লেখক উপাদান সংগ্রহ করেছেন, এক নতুন আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেক্ষাপটকে।

দুলেন্দ্র ভৌমিক
জগন্নাথ কাহিনী
৩০০.০০

পুরীর জগৎবিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দিরের নেপথ্যেও রয়েছে এক নাটকীয় কাহিনী। রাজার আরাধ্য ঈশ্বর নীলমাধব এখানে জগন্নাথরূপে প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত। একাধিক রঙিন চিত্রে শোভিত বর্ণাঢ্য এই গ্রন্থ মানবতা আর মানুষের প্রতি বিশ্বাসে উদ্‌বোধিত হবার প্রেরণা।

অমলেশ ত্রিপাঠী
ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে
শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ১২৫.০০

আশুতোষ মিত্র
শ্রীমা ২০০.০০

স্বামী চিদ্‌রূপানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামাধুর্যে
ভক্ত নবগোপাল ঘোষ ও নিস্তারিণী দেবী ১০০.০০

দয়াময়ী মজুমদার
গীতা ও রামকৃষ্ণের কথা ১০০.০০
নিত্য জীবনে গীতা ১২৫.০০
পরমা প্রকৃতি ১২৫.০০
মহাজীবন কথা: শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ১৫০.০০

নিক্কিয়ো নিয়ানো
(সরোজকুমার চৌধুরী অনূদিত)
পুণ্ডরীক সূত্র: একটি সরল ব্যাখ্যা ৫০০.০০

নিমাইসাধন বসু (সম্পাদিত)
শাশ্বত বিবেকানন্দ ২০০.০০

মঞ্জরী চৌধুরী
শ্রীমা সারদা ও তাঁর সময় ২০০.০০
ছোটদের জন্য লেখা

যামিনীকান্ত সোম
অমৃতময়ী নিবেদিতা ১৫০.০০

রথীন্দ্রনাথ মজুমদার
গল্পকার বিবেকানন্দ ১৫০.০০
ছোটদের জন্য লেখা

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
ভগবান বুদ্ধ ১০০.০০

সরোজকুমার চৌধুরী (অনূদিত)
ত্রিখণ্ড পুণ্ডরীক সূত্র ৪০০.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
নিবেদিতা লোকমাতা
১ম খণ্ড (১ম পর্ব) ৩৫০.০০
(২য় পর্ব) ৪০০.০০
২য় ৪০০.০০ • ৩য় ৪০০.০০
৪র্থ খণ্ড ৪০০.০০
রামকৃষ্ণ-সারদা: জীবন ও প্রসঙ্গ ২৫০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ: নতুন তথ্য নতুন আলো ৪৫০.০০
এই লেখকের ছোটদের জন্য লেখা
আমাদের নিবেদিতা ৮০.০০
বন্ধু বিবেকানন্দ ১২৫.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণের শেষ ক'টা দিন ১৫০.০০
শ্রীমতী রাধার শেষ সংবাদ ১৫০.০০
শেষ প্রহর ২০০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত ৩৫০.০০
এই লেখকের ছোটদের জন্য লেখা
ছেলেদের বিবেকানন্দ ৮০.০০

উ প ন্যা স

অভিজিৎ চৌধুরী
অনুগামিনী ২০০.০০

দেবাশিস ঘোষ
আনন্দ তুমি স্বামী ৩০০.০০

নবকুমার বসু
শ্রীময়ী মা ৩০০.০০

সিগনেটের বই

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি
২০০.০০

ভগিনী নিবেদিতা
প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম
৩০০.০০

পূর্বা সেনগুপ্ত
ভারতপ্রাণা নিবেদিতা
২৫০.০০

সিগনেট প্রেস
একটি আনন্দ প্রকাশনা
সিগনেট বুক শপ
১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন ২২১৯-০০৪৭

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭, ই-মেল publishers@anandapub.in

হিরোইক শাক্তিজম: দ্য ক্যাল্ট অফ দুর্গা ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান কিংশিপ
বিহানী সরকার
ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। ৭৫ পাউন্ড

দুর্গার বিবর্তনের ইতিহাস

ভদ্রকালী

কৃষ্ণা বসু

লেখক তাঁর গভীর গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, অসুরবিনাশিনী, রণদেবী দুর্গা এক জটিল দেবত্ব, যার আখ্যান ও ভূমিকা বহু শতক ধরে নানা স্তরে গ্রথিত হয়েছে।

সাধারণ বাঙালি মননে মা দুর্গা বললেই দু'টি ছবি ভেসে ওঠে। এক অশুভশক্তি বিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি, অপরদিকে আমাদের ঘরের মেয়ে উমা কয়েকদিনের জন্য এসেছেন আবার চলেও যাবেন। পরমেশ্বরীকে আমরা আপনজনের মতো নিজের ঘরে নিয়ে এসেছি। বিহানী সরকারের লেখা

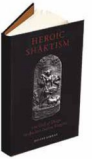

'Heroic Shaktism' (বাংলায় বলতে পারি বীরোচিত শক্তিবাদ) বইটি পড়ে যুগে যুগে দুর্গার বিভিন্ন রূপ ও পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ইতিহাস পেলাম এবং দুর্গাকে যেন নূতন করে আবিষ্কার করলাম।

অনেক পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে লেখক কয়েক শতক ধরে দুর্গার ক্রমিক

বিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি এই কাজে পাথরে উৎকীর্ণ লিপি থেকে শুরু করে পুরাণ, শাস্ত্র, সাহিত্য সবকিছু গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। রাজন্যবর্গের কাছে যুদ্ধের পুরুষদেবতা স্কন্দ মহাসেনাকে ছাপিয়ে দেবীদুর্গা হয়ে উঠেছেন শক্তিদায়িনী। রণক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বে তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী সকল সমরনায়ক রাজন্য।

বিহানী সরকার দুর্গার বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য সুন্দরভাবে বিভিন্ন স্তরে সাজিয়েছেন। প্রথমভাগে তিনি বলেছেন তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের কথা, সেখানে দুর্গা নিদ্রাকালরাত্রি, সেইসঙ্গে বিপদভঞ্জনের দেবী। তখন গুপ্তযুগ, দুর্গা কৃষ্ণবর্ণ হলুদ পোশাক, ময়ূরপালকে সজ্জিত, এখানে এসেছে বৈষ্ণব প্রভাব। পঞ্চম শতক থেকে শৈব প্রভাব এসে পড়ল। দুর্গা তখন শিবের পত্নী পার্বতী। দুর্গা ধীরে ধীরে যুদ্ধের দেবতা স্কন্দকে অতিক্রম করে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছেন, চালুক্য লিপির মধ্যেও তার প্রমাণ রয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক খুবই বৈচিত্রপূর্ণ এবং দুর্গা সারা দেশে তাঁর দেবীমাহাত্ম্য নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় দেবীদের সঙ্গে দুর্গা নানাভাবে একাত্ম হয়ে পড়লেন যথা— ভীমা, নানা, কাস্তেশ্বরী, এঁরা চালুক্য। এঁরা ছাড়াও আছেন

তখন গুপ্তযুগ, দুর্গা কৃষ্ণবর্ণ হলুদ পোশাক, ময়ূরপালকে সজ্জিত, এখানে এসেছে বৈষ্ণব প্রভাব। পঞ্চম শতক থেকে শৈব প্রভাব এসে পড়ল। দুর্গা তখন শিবের পত্নী পার্বতী। দুর্গা যুদ্ধের দেবতা স্কন্দকে অতিক্রম করে ক্রমে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছেন।

মল্লদের মঞ্চেশ্বরী, নাগাদের দন্তেশ্বরী এবং আরও অন্যান্য। বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে ছোট ছোট রাজন্যবর্গের কাছে দুর্গা শক্তিদায়িনী হিসেবে পূজিতা হচ্ছেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে রাজা দেবীর আরাধনা করবেন অথবা যুদ্ধে পরাজিত হলে দেবীকে আরাধনা করলে আবার বিজয়ী হওয়া যাবে এই বিশ্বাস। চণ্ডীরূপে দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন রাজৈশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে— যেমন রাজার তলোয়ার, মুকুট, দেবীর সিংহাসন ইত্যাদি। যেগুলি যুদ্ধের সময়ে রাজার ক্ষমতা প্রদর্শনের নিমিত্ত ব্যবহার করা হত। পাল রাজাদের যুগে বাংলায় দেবী তারার প্রতীক রাজা মহেন্দ্রপালের ধ্বজায় দেখা যায়, যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ, পালরাজকে পরাজিত করে যুদ্ধের লুট হিসেবে কবজা করেছিলেন। বিহানী সরকার দেখিয়েছেন, কীভাবে এই বিভিন্ন যুদ্ধের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক, যেমন অস্ত্র, তলোয়ার, রথ ও দুর্গকে শক্তির নামাঙ্কিত করে তাদের মধ্যে দেবীশক্তির মহিমা ও ক্ষমতা প্রদান করা হত। দশম শতকের পর যখন ভারতবর্ষে মুসলমান ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়, তখন এইসব 'দেবী প্রদত্ত অস্ত্র' ইসলামবিরোধী সংগ্রামে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হত। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকে ক্ষমতাশালী মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এইভাবে দেবীশক্তির উপর ভর করে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করত— যেমন শিবাজি ও পান্ড্যারাজাগণ। আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজির নামাঙ্কিত তলোয়ার শুধু দেবীমাহাত্ম্যই নয়, তাঁর রাজনৈতিক বিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

অপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক লেখক তুলে ধরেছেন। একদিকে সম্রাট ও রাজা-মহারাজারা যেমন দেবী দুর্গার আরাধনা করছেন, সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেবী শক্তিদায়িনী

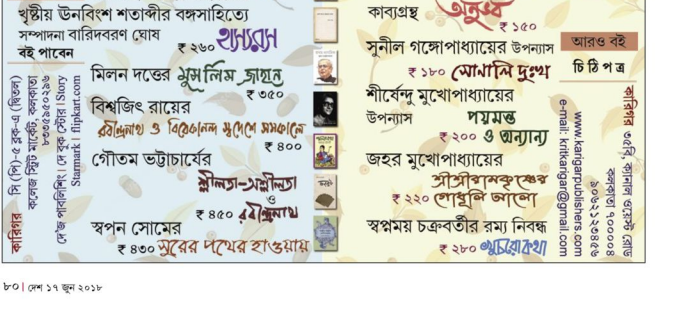

বিপদভঞ্জনকারিণী রূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন।

নবরাত্রি প্রথার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই রাজা-মহারাজার জাঁকজমকপূর্ণ পূজায় জনসাধারণও অংশগ্রহণ করেন।

নবরাত্রি অথবা দুর্গোৎসব ছিল দেবী দুর্গার মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিজয়োৎসব। বিহানী সরকার দেখিয়েছেন, কীভাবে এই উৎসব মধ্যযুগে দেবীর ক্ষমতা রাজন্যবর্গের উপর ও তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। এই উৎসব সে যুগে ছিল দৈব ও রাজকীয় ক্ষমতা প্রদর্শনের উপায়। বর্ষাকালের শেষে এই উৎসব পালিত হত, যখন একদিকে রাজাদের যুদ্ধারম্ভের সময় ছিল ও অপরদিকে সাধারণ মানুষদের নানা রোগ, পীড়া, অভাব, অশুভ সময় আসন্ন হত। এই সময়ে নবরাত্রির উৎসব দ্বৈত তাৎপর্য বহন করত— রাজাদের যুদ্ধে জয়লাভ ও প্রজাদের ব্যাধিবিপত্তি থেকে সুরক্ষা। এই সময় থেকেই, লেখকের মতে, এই দেবীপ্রথা শুধুমাত্র রাজন্যবর্গের ক্ষমতাবৃদ্ধি করেনি, জনসাধারণের মধ্যেও এই ক্ষমতার দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে পড়ে। রাজোর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ দেবীর আরাধনার বিভিন্ন অঙ্গের দায়িত্ব নেয়। কিছু সম্ভ্রান্ত পরিজন রাজার নবরাত্রি উৎসবের সঙ্গে জড়িত হন ও সাধারণ মানুষ দর্শক হিসেবে যোগদান করে অথবা নিজেদের গৃহের অভ্যন্তরে দেবীর আরাধনা করে।

লেখক নবরাত্রি উৎসবের নিয়মাবলির জন্য পুরাণ ও স্মৃতির উপর নির্ভর করেছেন, যদিও এই শাস্ত্রগুলি উৎসব কীভাবে অনুষ্ঠিত করা উচিত তার বিবরণ, যা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হত, তা নয়। তিনি এও জানিয়েছেন যে, পূজার নিয়মের আঞ্চলিক ভেদ এইসব অঞ্চলভিত্তিক পুরাণে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের নিদ্রা, কালরাত্রি কালীর ও কৃষ্ণের জন্মতিথিতে নগরপূজা দিয়ে শুরু করে, পঞ্চম থেকে দশম শতকের রাষ্ট্রণাধর্মের সামরিক আশ্বিনমাসের উৎসবের বিবরণের পরে গৌড়, কামরূপ ও উড়িষ্যার তান্ত্রিক নিয়মে দেবীপূজার বর্ণনা করেছেন। লেখকের মতে মহাষ্টমী ও মহানবমীর রীতি এই প্রাচ্য দেশগুলিতেই লিখিত হয়েছিল— দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণে। এই পুরাণ রচনার সঙ্গে নবরাত্রির উৎসবও ভারতের প্রাচ্যের প্রথম পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে, পরে ভারতের অন্যান্য অংশে প্রচারিত হয়। প্রাচ্যের নবরাত্রির মধ্যে প্রথা ভাঙার পরিচয় দেখা যায়, যার মাধ্যমে পুরাণের রীতির সঙ্গে তান্ত্রিকরীতির যোগসাধন হয়, শাক্ত ঐতিহ্যের মধ্যে দেবীপূজা প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের তমলুক (পূর্ববর্তীকালে তাম্রলিপ্ত) অঞ্চলে এক বিদ্ধ্যবাসিনী দেবীর পীঠস্থানে এই দেবীপূজার লিখিত হয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকে। মহাষ্টমী ও মহানবমীর সঙ্গে যুক্ত হয় আশ্বিনের প্রথমা থেকে পূজা। এই সমে সাধক উপবাস করে, তিনবার শিবপূজা, মন্ত্রপাঠ করে, হোম ও কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত করেন। অষ্টমীতে দেবীকে ন'টি কাষ্ঠের সিংহাসনে বসিয়ে, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করে, তলোয়ার বা ত্রিশূল প্রদান করা হয়। ফুল, ফল ও নানাবিধ উপহারও দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। অষ্টমী/নবমীর সন্ধিক্ষণে রাজা পশুবলি প্রদান করেন— চতুর্দিকের চার অসুরকে দমন করতে দশমীর বিজয়াদশমী পূজা নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে প্রচলিত হয়— যখন কালিকাপুরাণ অনুযায়ী দেবীকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়, সেদিন সকল সাধারণ মানুষ একদিনের জন্য জাতহীন হয়ে ওঠে।

বিহানী সরকার মিথিলা, দেবগিরি, বিজয়নগর ও মাদ্রাজে এই দেবীমাহাত্ম্যের প্রচার বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের দেবীপূজার মূল কারণগুলি— মিলিতভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া ও অশুভের নাশ— এখনও দুর্গাপূজার মূল ভিত্তি।

লেখক তাঁর গভীর ও দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে অসুরবিনাশিনী, রণদেবী দুর্গা এক জটিল দেবত্ব, যার আখ্যান ও ভূমিকা বহু শতক ধরে নানা স্তরে গ্রথিত হয়েছে। পাঠকের সবচেয়ে মনোগ্রাহী হয় এই বর্ণনা, যেখানে দেবীর রূপ বিভিন্ন সময়ে আলাদা— কখনও কৃষ্ণবর্ণ, কখনও গৌরবর্ণে আলোকিত, কখনও কুমারী, কখনও মাতা, কখনও

ছবি আচার্য্যের বই থেকে

শক্তিদেবী

রবীন্দ্র-রচনাবলী
১২ খণ্ডে সমাপ্ত দাম ৩৪০০
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, বড় টাইপে, ভালো কাগজে, ঝকঝকে ছাপা, সংগ্রহ করার যোগ্য প্রকাশন।
রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সমগ্র
রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র ৪০০/৪০০
গল্পগুচ্ছ ১৫০
সঞ্চয়িতা ১৫০ গীতবিতান ১৫০
রবীন্দ্র নাটক সমগ্র দুই খণ্ডে ৪০০
সুনির্বাচিত
রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি
বাছাই ৫৩২টি গানের স্বরলিপি ৪০০
মানিক রচনাসমগ্র
৬ খণ্ডে সমাপ্ত দাম ১৮০০
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, বড় টাইপে, ভালো কাগজে, ঝকঝকে ছাপা, সংগ্রহ করার যোগ্য প্রকাশন।
মানিক উপন্যাস সমগ্র -১ম খণ্ড ২৫০
মানিক উপন্যাস সমগ্র -২য় খণ্ড ২৫০
মানিক উপন্যাস সমগ্র -৩য় খণ্ড ২৫০
মানিক গল্প সমগ্র -১ম খণ্ড ২৫০
মানিক গল্প সমগ্র -২য় খণ্ড ২৫০
মানিক কিশোর রচনা সমগ্র-১২০
অবনীন্দ্র রচনাবলী
প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে সমাপ্ত
প্রথম খণ্ড ২৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ২৫০
অবনীন্দ্র কিশোর রচনা সমগ্র ১৫০
বিভূতি রচনাবলী
৬ খণ্ডে সমাপ্ত দাম ১২৫০
মজবুত বোর্ড বাঁধাই, বড় টাইপে ভালো কাগজে ঝক ঝকে ছাপা সংগ্রহ করার যোগ্য প্রকাশন
বিভূতি উপন্যাস সমগ্র
প্রথম খণ্ড ২৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ২৫০
বিভূতি গল্প সমগ্র
প্রথম খণ্ড ১৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ১৫০
বিভূতি কিশোর রচনা সমগ্র ১৫০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
গল্পসমগ্র (অখণ্ড) ৩০০
বুদ্ধদেব গুহ
বারোটি উপন্যাস ৫০০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
দশটি কিরীটী উপন্যাস ৪০০
আশাপূর্ণা দেবীর
সেরা বারোটি উপন্যাস ৪০০
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কল-৯
ফোন ঃ ২২৪১-৩৩৩২

বইয়ের জানালা

ইতিহাসের ধারা

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা বই। বাংলা সংস্করণে দু'টি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ লভ্য— সব্যসাচী ভট্টাচার্যর 'দ্য ডিফাইনিং মোমেন্টস ইন বেঙ্গল, ১৯২০-১৯৪৭' বইটি প্রকাশিত হয়েছে **বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা, ১৯২০-১৯৪৭** নামে। বইটির মূল বিষয় 'বিশ শতকের বাংলার জীবন ও মনের গড়ন ও চলনের প্রকৃতির অনুসন্ধান', প্রসঙ্গত এসেছে গান্ধীবাদী রাজনীতি, বিভেদের রাজনীতি। দ্বিতীয় বইটি ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের লেখা 'টাইম অ্যান্ড আ মেটাফর অফ হিস্টরি: আর্লি ইন্ডিয়া'-র শাশ্বতী রায় কৃত অনুবাদ **সময়: ইতিহাসের রূপক, প্রাচীন ভারত**। লেখক মুখবন্ধে জানিয়েছেন, 'এই বক্তৃতায় ব্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি এবং এর সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রারম্ভিক ধারার সম্পর্ক অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে।'

সাক্ষাৎকার

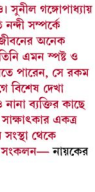

'আমার গল্পের মধ্যে বিবেক সবসময়ই একটা বড় স্থান দখল করে আছে। এই বিবেকই সবসময় মানুষের মধ্যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে'— একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন মতি নন্দী। তাঁর সাহিত্যকে কোনওভাবেই কেবলমাত্র ক্রীড়াসাহিত্যের খোপে ফেলে দেওয়া যায় না, সিরিয়াস কথাসাহিত্যে তাঁর সার্বিক অবদান নিয়ে সংশয় নেই কোনও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী মতি নন্দী সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'মানুষের জীবনের অনেক গোপন অনুভূতির কথা তিনি এমন স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন, সে রকম লেখা বাংলা ভাষায় আগে বিশেষ দেখা যায়নি।' বিভিন্ন সময়ে ও নানা ব্যক্তির কাছে দেওয়া মতি নন্দীর ছ'টি সাক্ষাৎকার একত্র করে ভালো বই প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটি সংকলন— **নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান**।

স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা যুবতী, কখনও শীর্ণা কঙ্কালভূষিতা কালরাত্রি। লেখকের মতে এইসব বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিচ্ছবি, দুর্গার বিভিন্ন পরিচয় ভারতের বিভিন্নতার পরিচায়ক, যদিও বিপদভঞ্জনকারিণী দেবী এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য।

পরিশেষে একটি কথা। পিকিং ইউনিভার্সিটিতে চিনা ছাত্রীরা মহা উৎসাহে সংস্কৃত পড়ছেন এবং আর্যভট্ট অথবা হর্ষবর্ধন নিয়ে গবেষণা করছেন দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। বঙ্গতনয়া বিহানী সরকার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে দুর্গাকে নিয়ে একটি চমৎকার তথ্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন, নইটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

পক্ষ পাঠ

দুনিয়া কাঁপানো এক জীবন

মৃত্যুহীন প্রাণ: লিউ শিয়াওবোর সমর্থকদের মিছিল

দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন কারাবাস তাঁকে শারীরিকভাবে হয়তো বন্দি করে রেখেছে অন্ধকারে, কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে অজানা থাকেনি কবি, চিন্তক, মানবমর্যাদা স্থাপনে নিরন্তর কর্মী লিউ শিয়াওবো (১৯৫৫-২০১৭)-র রচনা। চিনের তিয়েনানমেন স্কোয়্যারে ১৯৮৯-এর ছাত্র-আন্দোলনে সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদ করার পর কারারুদ্ধ করা হয় শিয়াওবো-কে। কোলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং স্কলারের পদ ছেড়ে স্বদেশে এসে আন্দোলনে যোগ দেন শিয়াওবো, পরবর্তী দুঃসময় কেবলই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে রাখার ইতিহাস। 'কাউন্টার-রেভলিউশনারি প্রোপাগান্ডা'-র ভূত কখনও পিছু ছাড়েনি তাঁকে। তবু শিয়াওবো ২০০৩ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট চাইনিজ় পেন সেন্টার-এর প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন, পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার (২০১০)। মানবাধিকার রক্ষার ইস্তাহার 'চার্টার ৮'-এ চিনের আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শিয়াওবো স্বাক্ষর দেওয়ায় তাঁকে ২০০৯ সালে আবার বন্দি করা হয়। লিউ শিয়াওবো-র জীবন ও সৃষ্টির আলোচনা এই বই, যেখানে শিয়াওবো-র অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ অনূদিত হয়েছে। তবে অনুবাদের মান নিয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, 'একটি অঞ্জলি/ সেই মেয়েটির জন্য যার কোন গোলাপের দরকার নাই'ক আর/ যার গানে নরকও আলো হয়ে যেত/ সে একটা ঢ্যাংকের অশালীন গর্জনের মুখে/ অবিচল দাঁড়ায়েছে'— বড়ই দুর্বল মনে হয় এই ভাষান্তর। আর যাঁকে নিয়ে বই, তাঁর নামের উচ্চারণটিও নিঃসন্দেহে শিয়াওবো, জিয়াওবো নয়।

তিয়েনানমেন স্কোয়্যারের কবি লিউ জিয়াওবো

রমা কুণ্ডু
রেডিয়্যান্স। কল-৭৩
১৫০.০০

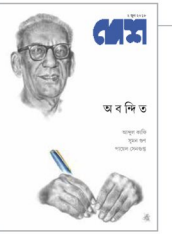

বিগত সময়ে শরদিন্দুবাবুর সঠিক মূল্যায়ন না হলেও, এখন বোধ হয় সেটি করা দরকার। বাংলা সাহিত্য-সমালোচকদের উন্নাসিক মনোভাবের কারণেই তিনি এতদিন 'অবন্দিত'।

অসীমকুমার বসু, কলকাতা-৭০০০১৯

ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়তো ত্রুটিপূর্ণ

'মার্ক্স ২০০' (১৭ মে ২০১৮) সংখ্যার নিবন্ধগুলি স্বাতন্ত্র্যের গুণে ঋদ্ধ। কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সে সময় যে-দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে 'ইস্তাহার'কে 'মার্কসীয় ফতোয়া' আখ্যা দিয়ে কিছুটা লঘু করার চেষ্টায় মার্ক্সবাদী পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো অনেকেই সেদিন ব্যথিত হয়েছিলেন। এবারের সংখ্যাটি যে দরাজ-দাক্ষিণ্যে ভরপুর তাতে কোনও সংশয় নেই।

আলোচ্য সংখ্যায় মার্ক্সের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনও নিবন্ধকারই দ্বিরুক্তি করেননি। তবু একটা কথা সব সময়ই মনে রাখা দরকার, তত্ত্ব আর প্রয়োগ— এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। তাত্ত্বিক দিককে যখন বাস্তবের রূঢ় ভূমিতে প্রায়োগিক আলোয় উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করা হয়, তখনই তার সাফল্য-সার্থকতার পরিমাণ অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। কোনও রকম ওজর-আপত্তি না-করেই মার্ক্স একসময় নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন, 'Theory becomes a material force, when it grips the masses.' কিন্তু অশিক্ষিত জনমানসে সেই তত্ত্বকে পৌঁছে দেওয়া এবং তার সঙ্গে একীভূত করা তো সহজ কাজ নয়। মার্ক্সবাদের টানে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মপ্রত্যয়ী-নির্লোভ মানুষ যদি লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-শোষিতদের সঙ্গে নিয়ে সমাজে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারেন, তবেই দুনিয়ায় দীর্ঘজীবী বিপ্লবের অনাবিল ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু লোভ নামক 'মৃত্যুশেল' সমাজদেহ থেকে উপড়ে ফেলা যে কত কঠিন, সে-কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মর্ম দিয়ে অনুভব করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণকে আগাম সতর্ক করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'Zvestie' পত্রিকাকে বলে এসেছিলেন, কোন কাজে দোষত্রুটি বড় হয়ে দেখা দিলে দীর্ঘায়ত সাফল্য অসম্ভব, তাই আরব্ধ কাজ যেন সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ থাকে। মানুষের ওপর মার্ক্সের বিশ্বাস আর ভালবাসা ছিল অগাধ। তাই প্রায়শই তিনি বলতেন, 'Man is the measure of everything.' কিন্তু বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া মানুষ যে আবার অধঃপতন আর চারিত্রিক দৈন্যে দীর্ণ হতে পারে— এই অমোঘ সত্যটি বোধ হয় ইস্তাহারের প্রেক্ষিতে তখন বিচার্য বিষয় হতে পারেনি। তা না হলে সোভিয়েত ও অন্যান্য সোশ্যালিস্ট দেশের সমাজব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে কেন? এসব কারণে বোধ হয় আনাতোল ফ্রাঁস অনেক আগেই নির্মম সত্যটি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন— ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় মুশকিল হল যে, দুনিয়ার সব কাজ তাঁকে করাতে হয় মানুষকে দিয়েই। টুটস্কি সব সময়ই স্থায়ী বিপ্লবের কথা বলতেন। স্তালিনের নিন্দা করে তিনি একসময় প্রশ্ন করেছিলেন, 'What is the Soviet Union and where is it going?' তাই রাশিয়ার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা যে 'bureaucratic' কেন্দ্রিকতা ছাড়া আর কিছু নয়— এমন অপ্রিয় সত্যটি এই অসম সাহসী টুটস্কির মুখেই মানায়। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমরা জানি, কমিউনিস্টরা সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। স্তালিনও পারেননি। তাই এজেন্ট লাগিয়ে মেক্সিকোতে তিনি টুটস্কিকে হত্যা করেন। তবে বেঁচে থাকলেই কি টুটস্কি মার্ক্সবাদ প্রতিষ্ঠা

মুক্তমনা মানবিকতার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে মার্ক্সীয় দর্শন

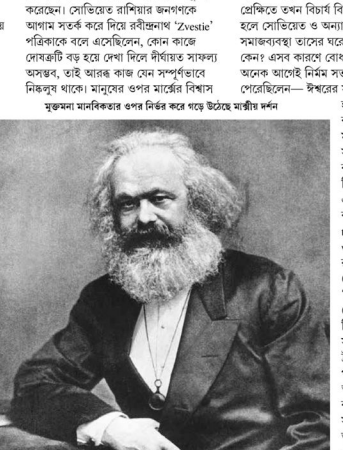

গুগল ইমেজেস

করতে পারতেন? এর উত্তর অবশ্যই 'না'। ট্রটস্কি-র মতাদর্শের ভিত্তিতেই এমন কথা বলা যায়। 'The Eternal Revolutionary' বইটিতে সঠিকভাবেই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, 'Trotsky's individuality lay primarily in his obsession with the idea. For him the idea was the equivalent of a philosophical Temple.' শুধু সোভিয়েত রাশিয়া কেন, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, কোথাও কেউ এই Temple-এর দরজা খুলতে পারেনি। তাই তাদের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। চিন দেশেও বিশ্বায়করভাবে কায়েম হয়েছিল বাজার অর্থনীতি। মজার ব্যাপার, গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য যাঁকে দীর্ঘ পনেরো বছর গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল, সেই ঝাও-এর হাত ধরেই শেষপর্যন্ত চিনে প্রতিষ্ঠা পেল এই বাজার অর্থনীতি। মার্ক্সবাদ যদি অন্যান্য আর বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে থাকে, তা হলে এমন স্ববিরোধিতা থাকবে কেন? আলোচ্য 'দেশ'-এর কোনও নিবন্ধে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের বিচার-বিশ্লেষণ থাকলে ভাল হত। এইচ জি ওয়েলস মার্ক্সবাদকে বলেছেন, 'Sabotage of civilization by the disappointed.' বহু বছর আগে বটকৃষ্ণ ঘোষ নামে এক প্রথিতযশা বাঙালি অধ্যাপক এভাবে এর অনুবাদ করেছিলেন, 'মার্কসবাদ হইল ক্ষুধার তাড়নায় পশুভাবাপন্ন গণমানবের চরম তিক্ততার পরম পরিণাম।'

প্রসঙ্গত একটা প্রশ্ন উঠে আসে, দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত মার্ক্সবাদী নেতারা চারিত্রিক দৈন্যে জর্জরিত না হয়ে যদি নির্লোভিতার আশ্রয় নিয়ে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠতেন, আর যদি তাঁদের 'চেতনা জুড়ে থাকত মার্ক্সীয় প্রভার প্লাবিত বিভাস', তা হলে হয়তো বামশাসন আরও কিছুদিন স্থায়িত্ব লাভ করত। কিন্তু সরষের মধ্যে ভূত থাকলে তো নিরাকরণ কোনওভাবেই সম্ভব নয়!

বাণীবরণ সেনগুপ্ত, শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

দুই

সম্পাদকীয় 'কার্ল মার্ক্স দ্বিশতবর্ষ' (১৭ মে ২০১৮) এবং তাঁকে নিয়ে তিনজন লেখকের মূল্যবান নিবন্ধগুলি পড়লাম। মুগ্ধমনা হয়ে যদি মার্ক্সের সমাজচেতনার কথা ভাবি তাহলে বলতে হয় বুর্জোয়া উদারনৈতিক মতবাদের উপর নির্মিত সমালোচনা সত্ত্বেও মার্ক্স মুক্তমনা মানবিকতার ধারাকে অমূল্য গণ্য করেছেন। এখান থেকেই সমাজবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সম্ভবত বর্তমান সময়ের সাম্যবাদের মানবিকতা বিরোধী ব্যবহারিক প্রয়োগগুলিকেও তিনি ঘৃণা করতেন। মার্ক্সীয় দর্শনের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সমাজদর্শনের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এটা একটা বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মার্ক্সই প্রথম দেখালেন জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষের কতকগুলি প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান উৎপাদনের জন্য মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, তার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সমাজ। তাঁর এই দার্শনিক চিন্তাধারাগুলি কেবলমাত্র ছোট সামাজিকতার বাঁধাবৃত্তি দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা যাবে না।

মার্ক্সীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে সোভিয়েত রাশিয়া, চিন এবং পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠিত হলেও পুরোপুরি সাম্যবাদের নীতি অনুসৃত হয়নি। আমাদের দেশে কয়েকটি রাজ্যে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হলেও তারা মার্ক্সবাদের মূল নীতি থেকে সরে আসার জন্য শ্রমিক-কৃষকদের উপর ন্যায়বিচার হয়নি। সাম্যবাদের নামে অনেক মানবতানিয়োগী পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল। আমেরিকা সারা পৃথিবীতে তার পুঁজিবাদের শক্তি এমনভাবে কায়েম করেছে যে, অনেক দেশই ভাবছে আমেরিকা ছাড়া তাদের গতি নেই। এমনকী, চিনও এখন রং বদলে চাইছে পুঁজিবাদকে আঁকড়ে দেশের অগ্রগতি বাড়াতে। মার্ক্সীয় দর্শন এবং সাম্য কথাটি এখন নিছক অচল পয়সার মতো গণ্য হলেও মার্ক্সবাদ শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে, এবং সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে সেটি একটি বৃহত্তম ক্রিয়াশীল শক্তি। সমাজতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্রকে উৎখাত করার মতো কাজেও তা প্রাসঙ্গিক। একটা কমিউনিস্ট সরকার গঠন করাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল শ্রমিক শ্রেণিকে কতটা সচেতন করা হল তার উপর। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করার ব্যাপারে কতটা সে বৈপ্লবিক দায়িত্ব গ্রহণ করল তার উপর। প্রকৃত কমিউনিস্টের কাজ কিন্তু এটাই।

দিলীপকুমার দত্ত, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০২

লেখকদের প্রতি আবেদন

পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য আমাদের অনুরোধ, 'দেশ'-এ প্রকাশিত কোনও লেখা, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। লেখার প্রতিলিপি নিজের কাছে রেখে লেখা পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়।

দেশ

সম্পাদকীয় বিভাগ

নির্বাচনের নামে প্রহসন

'স্বাধীন দেশে এই রাজ্যে কৃষকদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লড়াই সংগঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর।... অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, দিনাজপুর— বহু জেলায় এই আন্দোলনের বিস্তার হয়। ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমি দখল হয়। অধিকাংশ দখলীকৃত জমিতে চাষ হয়, কৃষকের ঘরেই ফসল ওঠে।... এই সাফল্যের সঙ্গেও কয়েকটি প্রশ্নও বড়ো করে দেখা দেয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষকের হাতে যে জমি এসেছে তার আইনগত স্বীকৃতি কি হবে, বর্গাদারদেরও প্রয়োজন আইনি রক্ষাকবচ।... পঞ্চায়েতের যে আইন এ রাজ্যে চালু ছিল উপরিউক্ত কোনো প্রশ্নেই তার সদর্থক কার্যকরী ভূমিকা ছিল না। কায়েমি স্বার্থের প্রবল চাপে পঞ্চায়েতের পুরনো আইনের কোনো ধার তো ছিলই না, উপরন্তু যেটুকু স্বল্প সম্পদ গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সেটুকুও তাদের ভোগ দখলেই চলে গেছিল। এই অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই প্রবলভাবে অনুভূত হল নতুন পঞ্চায়েত আইনের'। (ফিরে দেখা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)

কী সেই আইন?

ক) যুক্তফ্রন্ট আমলের ভূমি সংস্কার আন্দোলনের স্থায়ী রূপায়ণ;

খ) গরিবদের স্বার্থে গ্রাম প্রশাসন পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণ;

পার্টির অভ্যন্তরে, বামফ্রন্টে সফল আলোচনার পর প্রথম পঞ্চায়েত এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে 'নির্বাচন হলো উৎসবের মতন'। 'ঘুঘু পাখি অশুভের প্রতীক'। তাই ক্ষমতাবানদের ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলেন 'সিপিআই(এম)-এর পোড় খাওয়া প্রবীণ নেতা বিনয় চৌধুরী। তৎসহ, বিশ্বনাথ মুখার্জির "জনগণের হাতে ক্ষমতা চাই" রণধ্বনিতে বামপন্থী প্রার্থীরা কায়েমি স্বার্থকে গুঁড়িয়ে দিয়ে 'বিপুলভোটে জয়ী হলেন'। (ফিরে দেখা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)

যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের অভূতপূর্ব মডেল হিসেবে সমগ্র দেশের মডেল, তার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল বাম শাসনেই। 'চৌত্রিশ বছরের শেষ অর্ধে' বাছবলী নেতাদের দাপটে মাঝের সারির নেতারা 'উন্নয়নকে মাঝরাস্তায় খাড়া করে ভোটে জিতেছিলেন অনেকবার' ('অশুভ 'গণতান্ত্রিক' নির্বাচন': শুভময় মৈত্র: দেশ, ২ জুন সংখ্যা)। বামফ্রন্টের উচ্চশিক্ষিত তাত্ত্বিক নেতারা এখন সচরাচর মাঠে-ময়দানে নামেন না। মাঝে-মধ্যে সারিবদ্ধ

নিরন্ধ্রশ! কিন্তু কী উপায়ে...

প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন মাত্র। তাই তাঁদের ডাকা বনধও চূড়ান্ত ফ্লপ হয়। নইলে সদ্য সমাপ্ত 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন'-এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা বুদ্ধুমার আন্দোলন বা ধর্মঘট হতেই পারত। ভোটপর্বে গিয়ে সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক কর্মী, শিক্ষকরা যে ভাবে এবার হেনস্থা হয়েছেন, তার অতি সামান্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে বা প্রদর্শিত হয়েছে মিডিয়া মারফত। সরকারি কর্মচারিরা হয়তো হেনস্থা হওয়ার ভয়ে সরাসরি মুখ খুলছেন না। নইলে দারি ওঠে, নির্বাচন কমিশন বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভোটকর্মে নিযুক্ত করুক? রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করবার জন্য এত মৃত্যু, খুন, অনৈতিক কার্যাবলি, ছাপ্পা ভোট, ভোটকর্মীদের ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে বুথ দখল, বোমাবাজি, পুলিশ প্রশাসনকে নিজিয় রেখে দাদাগিরি— এ কোন 'গণতান্ত্রিক' নির্বাচনের নিদর্শন দেখলেন রাজ্যবাসী? দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের দৌলতে সারা দুনিয়া দেখে নিল 'ঘুঘুর বাসা' বহাল তবিয়তেই আছে। চড়াম-চড়াম করে ঢাক বাজে ভোটের আগে। কেউ প্রতিবাদ করলেই চামড়া গুটিয়ে নেওয়ার হুঙ্কার শোনা যায়। অশ্লীল ভাষা প্রয়োগও সীমা ছাড়ায়। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমে লাল-সবুজ-গেরুয়া শিবির যুযুধান প্রতিপক্ষ হিসেবে পরস্পরকে পরখ করে। আত্তিন গুটিয়ে বন্দুকবাজিতে নামে। চতুর্দিকে এত উন্নয়ন, আর তোমরা বেয়াদপি করে কুৎসা প্রচার করছ? এই অন্তর্হীন প্রচারের মুখে বিদগ্ধ জন কেউ যদি (প্রবাদপ্রতিম হলেও) নগ্ন-সত্য উচ্চারণ করেন, তিনিও রেহাই পান না। হায় কুশিক্ষা! হায় অশিক্ষিত দম্ভ! এ আমাদের লজ্জা।

বিপুল ব্যবধানে জেতার অর্থটা এখন অতীব সাধারণ মানুষও বোঝেন। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল— সব ক'টি রাজনৈতিক দল এই প্রবচনে বিশ্বাসী। আঁতাঁত-ফাঁতাত কিস্যু নয়। মূল লক্ষ্য: ক্ষমতা দখল। নির্বাচনী আঁতাঁতের জন্য মতবাদকে লাথি মেরে লাভের অঙ্ক কষে বাম-কংগ্রেস বা বিজেপি-তৃণমূল। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। সেমি ফাইনালে সিপিএম কুপোকাত। লোকসভা নির্বাচনে যদি দিদি বিরোধী-নেত্রী হিসেবে আসীন হন তাহলে 'জেতা হারাটা বাজিয়ে নেওয়া যাবে সহজে।' এ ওকে আসন-ভাগাভাগির রফা সূত্রে বিঁধছে। অবশ্যম্ভাবীভাবেই শিক্ষিত নেতারা হারিয়ে ফেলেছেন 'বোধ'। এই বোধের অভাবেই সুদূরপ্রসারী সর্বনাশের স্বখাত সলিলে নিমজ্জমান পশ্চিমবঙ্গ। সঙ্গে আছে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অতি সস্তা পন্থায় বাজিমাত করবার প্রক্রিয়া। পরিশেষে উল্লেখ না করলেও চলে 'নিরন্ধ্রশ বিরোধীশূন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা' লাভ: এখন শাসকদলের মূল লক্ষ্য বাম শাসনের যতই বিরূপ প্রচার চলুক, উন্নয়নকে খাড়া করে এত মগ্ন অত্যাচার বা কলুষিত পন্থা অবলম্বন পূর্বে দেখা যায়নি। গ্রামে গঞ্জে এখন ঝাঁ-চকচকে রাস্তা ঘাট, বিভিন্ন 'শ্রী' প্রকল্পের জোয়ার—গ্রামের মানুষকে কিছুটা হলেও দুর্দশামুক্ত করেছে। এখন হতদরিদ্র অবস্থা থেকে গাঁয়ের মানুষ অনেকটাই উন্নয়নের সাফল্য ভোগ করছেন। এই সত্য অস্বীকৃত হওয়ার নয়। তবু, এত গা-জোয়ারির প্রয়োজন অনুভূত হল? তাহলে সাধারণ মানুষ 'উন্নয়ন' বোঝেন না, বলুন! চৌত্রিশ বছর সময়টা নেহাত কম ছিল না। কেন 'উন্নয়ন রাস্তায়' খাড়া হয়ে দাঁড়ায়নি বলতে পারবেন প্রাক্তন শাসকদল? আজ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুফল ভোগ করছেন গ্রামের মানুষ। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন, এই ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার রূপকারদের। এত ডামাডোল, অবক্ষয়, নির্বাচনের নামে প্রহসন দেখে সবুজ আবিরের হোরি খেলা তবুও কেন এত বেমানান লাগে!

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী, কলকাতা-৭০০১২৫

দুই

পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হল 'একনায়কতন্ত্র' (মন্তব্য, ২ জুন ২০১৮)। শুধু ভোটে নয়, দিনক্ষণ নির্ধারণ থেকে শুরু করে মনোনয়ন, প্রত্যাহার, শান্তি অথবা অশান্তি রক্ষা, গণনা, বিজয় মিছিল— প্রায় সবকিছুই শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে হয়েছে। আজকাল সংবাদমাধ্যম তথা টিভি-মাধ্যমে একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, 'দলনেত্রীর এতদিনের কাজকর্ম এত উন্নয়নমুখী যে এমনিতেই প্রবল ভোটে জয়যুক্ত হতেন, এত সন্ত্রাসের কোনও প্রয়োজন ছিল না।' আমার মনে হয় শাসকদলের পক্ষে এটার প্রয়োজন ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ, 'একনায়কতন্ত্র' কোনওরকম বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না। অথবা বলা উচিত যে, কোনওরকম বিরোধিতা সহ্য করা সম্ভব নয়। কেননা, সামান্যতম বিরোধী অবস্থান একটু একটু করে গণতন্ত্রের জন্ম দেবে। আর যেটা ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে একনায়কতন্ত্রের মরণ বাণ। অতএব (অ) সাধু সাবধান।

শ্রীদীপ কুমার, চেন্নই, মুম্বই

তিন

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সাফল্য সারা দেশের পথিকৃৎ ছিল। এক দশক আগে কর্নাটক বিধানসভার এক প্রতিনিধিদল এ রাজ্যের পঞ্চায়েতের কাজকর্ম দেখার জন্য ঘুরে গিয়েছিল। বস্তুত, গ্রামীণ ক্ষমতায়ন ও বামফ্রন্টের ভোটব্যাঙ্কের এক বড় ভিত্তি ছিল পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা। কালক্রমে পার্টির ছত্রছায়ায় এক শ্রেণির অপারেটর গজিয়ে ওঠে। আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে, অনুজ-ডালিম পান্ডের প্রাসাদোপম বাড়ির কথা সংবাদমাধ্যমের সুবাদে রাজ্যবাসী জানতে পারে, রেশন ডিলারদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিকে দিকে জনরোষ আছড়ে পড়ে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, জঙ্গল মহলের মাওবাদী, জনসাধারণের কমিটির আন্দোলন, সুশীল সমাজের বিরূপতায় বামশাসনের যবনিকাপাত দ্রুত ঘটতে থাকে। প্রকাশ কারাটের একক উদ্যোগে পরমাণুচুক্তি ইস্যুতে ইউপিএ-২ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার ও কংগ্রেস-তৃণমূল এক ব্র্যাকেটে আসায় পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

বামশাসনে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে হিংসা হানাহানির ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ছিল। বহু আসনে বিরোধীরা (শতকরা প্রায় ১১ ভাগ) মনোনয়ন দাখিল করতে ব্যর্থ হত, সাদা থান পাঠিয়ে নীরব সন্ত্রাস কায়েম করা হত, শরিকেরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হত।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকায় প্রায় চৌত্রিশ শতাংশ আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি। দুটি জেলা পরিষদ শাসক

গৌতম সেনগুপ্তর
অন্তরঙ্গ নাট্য
(লেখকই এ-নাটের প্রথম ও পঠিকই)
এবং
নাটক ও নাট্যগ্রন্থ
প্রস্তুতিতে
খতম ও কলাভূষ
৯৯০৩৭২৮১২১
৯৮০২৭৯৪৭১৮
৯৮৭৪৪৮০৩০৬(হোম ডেলিভারি)

জীবন/দেবাশিস বহুয়া
সমস্ত ধ্বংসের মাঝে
জেগে থাকে জীবন
শত শোকের অন্তরে
বেঁচে থাকে প্রেম—
এভাবেই হাজারো
সম্ভাবনির হয় স্পন্দন
হামাগুড়ি দিতে দিতে
উঠে দাঁড়ায় নবজাতক।
দেবাশিস বহুয়া
সম্পাদক : নিজভূমি
৩২ ইন্দ্রাণীপল্লি, সেদিনপুর
কল-১১৩ এবং কবিতা পাঠান

দেশ
বিজ্ঞাপন দেবার জন্য
যোগাযোগ করুন
9830224386

ড. পবিত্র চক্রবর্তী রচিত
বাক্‌ধর্মী বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস
বাক্‌ধর্মী ধারায় অন্তর্ভূত লোককথা, লোকভাষা, গীতিকা প্রভৃতি চর্চার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যুগবিভাগ ভিত্তিক কালানুক্রমিক ইতিহাস। ৫৯৫
আশিস সরকার সম্পাদিত
দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক দপ্তরখানা
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তিদের পত্র সংকলন যা ইতিহাস-রচয়িতা তথা উৎসাহী পাঠককের নতুন করে ইতিহাস ভাবনার রসদ যোগাবে। ৪০০
ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় রচিত বাংলার ডোকরা শিল্প
ডোকরা শিল্পের বিস্তৃত বিবরণসহ রয়েছে ডোকরা শিল্পীদের অনালোকিত জীবনআলেখ্য। ১৪০
ড. ফণী পাল রচিত আনকাপ
প্রায় অনালোচিত অথচ একদা জনপ্রিয় এই লোকনাট্যক ধারার উৎস, ইতিহাস, পরিচয় ও বিশ্লেষণ। ৩০০
অমর ভারতী ৮সি ডামার সেন, কলকাতা—৯
মো : ৯৯০৩২৭১৫৬৬

সাহিত্য সংস্কৃতির মননাশ্রয়ী সাময়িকী
গ্রীষ্ম কবিতীর্থ ১৪২৫
বিদ্যাসাগর
দ্বিশত জন্মবর্ষের প্রাক্কালে
বিদ্যাসাগরের রচনার সঙ্গে সাহিত্যে হয়েছে বিশিষ্টজনের রচনা-আলোচনা-পুনরালোচনা, নিবেদিত কবিতা সঙ্গে জীবনপঞ্জি-রচনাপঞ্জি
সম্প্রতি প্রকাশিত
ফ্রিড্রিখ নিশের কবিতা : ভালোবাসি, হে অশেষ, অনুবাদ : প্রদীপন দাশগুপ্ত বামনের চন্দ্রস্পর্শ : দেবাশিস চক্রবর্তী সূর্যভানার চিল : রোকে দালতোন ক্লারিবেল আলেগ্রিয়া, অনুবাদ : শান্তনু ঘোষ বাংলা অসমীয়া ও ওড়িয়ার উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ : নিখিলেশ পুরকাইত
কবিতীর্থ ৬৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কল-৯
৫০/৩, কবিতীর্থ সরণি, কল-৩
ট্রিভ২২১৬৫৯৬৮, ৩৩৩-২৪০১০-৯৫৪

চিঠিপত্র

দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে। বেশ কিছু আসনে শাসক দলের গোঁজ প্রার্থীরা নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী একশো শতাংশ আসনে জয় দেখতে চেয়েছেন, ডাকসাইটে মন্ত্রী বিরোধীশূন্য জয়ের জন্য পাঁচকোটি টাকা ইনাম ঘোষণা করেছেন। নির্বাচনের দিন বুথ দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ছাঞ্চা ভোট, সাংবাদিক নিগ্রহ, প্রাণহানি, প্রিসাইডিং অফিসারের মৃত্যু, গণতন্ত্রের উৎসবকে ঘিরে সন্ত্রাসের সব নৈবেদ্য প্রত্যক্ষ করে অনেককেই হা-হুতাশ করতে শোনা গেছে।

প্রশ্ন হল, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী, সবুজসাথী, কৃষকবন্ধু, যাত্রা-বাউল শিল্পীদের অনুদান, ক্লাবগুলোতে নগদ টাকা বিলানো এবংবিধ বহু উন্নয়নের সুফল থাকা সত্ত্বেও শাসক দল জনগণের রায় যাচাই করতে ভয় পেল কেন? তবে কি পঞ্চায়েতকেন্দ্রিক অর্থ বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে যাতে মৌষল পর্ব এড়ানো যায় তাই এত আয়োজন? না কি অট্রট জনভিত্তি নিয়ে নিজেরাও দ্বিধাগ্রস্ত। পাছে সামান্য পরাজয়ের কলঙ্ক উনিশের নির্বাচনের আগে দলের গায়ে না লাগে ? প্রতিবাদীদের জীবন নরক করে দেওয়ার নাম কিন্তু স্বৈরতন্ত্র।

রাজশেখর দাস, কলকাতা-৭০০১২২

চার

গত ২ জুন সংখ্যায় শুভময় মৈত্রর নিবন্ধের প্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। বাঙালি চিরকালীন বুদ্ধিজীবী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর জাতি। শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ শ্রেণিতে অবস্থান, তাদের মধ্যে হুজুগ বেশি, তাই অনেকটা ধর্মভীরুও। মহামতি গোখলে যে যুক্তি দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন, 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow'-এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির চাতুর্য ও কূটনৈতিকতার ইঙ্গিত বিদ্যমান। বাঙালি জাতি গর্ব করে বলতে পারে: আমরা হুজুগে, কথায় কথায় দাঙ্গা বাঁধাতে পারি, পরস্বাপহরণ করতে সিদ্ধহস্ত। লর্ড ক্লাইভ যেভাবে বাংলা দখল করে ভারতকে শাসন করে গেছেন, সেদিনের সেই ঘটনার পশ্চাতেও বাঙালির সুনিপুণ হাত ছিল অস্বীকার করতে পারি না, বরং সুগভীর চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা রায় যাচাই ছিল। লর্ড ক্লাইভ তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করে বলেন যে, যেদিন নবাব সিরাজকে বন্দি করে টানতে টানতে মুর্শিদাবাদের রাজপথে টেনে এনে খুন করা হয়েছিল, সেদিন যতজন ব্যক্তি আনন্দ ও মশকরা উপভোগ করেছিল, তারা যদি একটা করে ঢিল ছুড়ে মারত, বোধ করি ইংরেজ সৈন্যগণ পরাজিত হত ও বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু বদলে যায়নি বাংলার ইতিহাস। মিরজাফরি শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। অদ্ভুত 'ণগতান্ত্রিক' নির্বাচন বাংলায় ঘটে গেছে, যেখানে কোনও বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেবেন না। এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা ইতিহাস শোনেনি, ইতিহাসে লেখাও নেই। জার্মানির হিটলার কিংবা মায়ানমারের সু চি সরকারও ভাবতে পারে না। সুতরাং, মহান গোখলের সেই কথার পুনরাবৃত্তি, আজ বাংলা যা করে দেখাল, কাল তা ভারতে প্রচলিত হবে। কোনও কোনও মহান রাজনীতিবিদ মনে করছেন দেশ বা রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করতে চেয়ে আস্ফালন মূর্খের কচকচানি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। নদীর সঙ্গে বালিমাটির যে-সম্পর্ক, সাগরের জলে লবণ যেমন সম্পৃক্ত, সেরকম সুস্থ ও উন্নত গণতন্ত্রে বিরোধীদের অবস্থানও অপরিহার্য।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে নতুন প্রবচন জন্ম নিয়েছে: ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে রেপ করে দেওয়া, বিরোধীদের ঘরে ভক্ষণ নিষিদ্ধ, ঘরে যেমন গোখরো সাপকে দেখলে মেরে ফেলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা উন্নয়ন ইত্যাদি। তেমনই চালু হয়েছে বিরোধীদের খুন করো, পেটাও, ইত্যাদি জিগির। উন্নত গণতন্ত্রের নতুন নজির গড়ে তুলতে কেউ আরও একধাপ উপরে উঠে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েতের জন্য কোটি টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছেন। এসব তো হিংসাকে উৎসাহ দেয়! এর পরিণতি হল আত্মঘাতী হওয়া।

যাই হোক, বাংলায় ভোট রাজনীতিতে শাসনক্ষমতায় থাকার জন্য শাসকদল বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে বেয়াড়া ভোটারদের মুখে স্বৈরাচারের লাগাম পরায়, এ কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভোটহরণের বীভৎস ও কদর্য রূপ প্রথম দেখলেন বাংলার জনগণ। ইতিহাস ফিরে আসে। দেখা যাক, কোথাকার জল গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

নাসির ওয়াজেদ, বীরভূম-৭৩১২১৯

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : ভারত ইতিহাসের সন্ধানে (আদি পর্ব) [পরিমার্জিত পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ : ১ম খণ্ড ৪০০। ২য় খণ্ড ৪০০]
পবিত্র সরকার : পদ্যরীতি পদ্যরীতি [পরিবর্তিত নতুন সংস্করণ] ২৬০
ভাষাস্পর্শ [গ্রন্থকারের ভাষা-সংগ্রহ নতুন প্রবন্ধাবলি। এতে 'ভাষা ও উপভাষা', 'অনুবাদ-সমস্যা' ও 'ভারতীয় ভাষা'...গবেষণা ও বিদ্যানির্ধারক চেমন আছে তেমনই আছে ভাষার জীবন মরণ... ইত্যাদি।] ২২০
সমিতা চক্রবর্তী : আধুনিক কবিতার চালচিত্র [পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ] ৪২০
জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল [পরিবর্তিত নতুন সংস্করণ] ৩৫০
রামবহাল তেওয়ারী : রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দি সাহিত্য ২২০, ছন্দপরিচয় ১২০
ছন্দ সাহিত্যের ইতিহাস ৪৩০, ভোজপুরী সাহিত্যের ইতিহাস ৩৫০,
সাহিত্যলোক। কলকাতা-৬ ■ বিক্রয় কেন্দ্র : ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩

সস্তার অবস্থা শোচনীয়!

সম্প্রতিক ১৭ মে সংখ্যার মন্তব্য বিভাগে 'সমাজ' বিষয়ে সুমিত মিত্রের 'সস্তার অবস্থা' শীর্ষক রচনা প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। নিঃসন্দেহে শ্রীমিত্রের এটি একটি মনোজ্ঞ রচনা। তবে কয়েক জায়গায় লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। লেখাটি পড়ে মনে হচ্ছে সমগ্র দেশের মধ্যে কেবল পশ্চিমবঙ্গবাসী, বিশেষত বাঙালি, প্রবেশের গুণমান বিষয়ে সচেতন নন, তাঁরা কেবল স্বল্পমূল্যের বিষয়ে আগ্রহী। এই প্রবণতা কিন্তু কেবল বাঙালির নয়, আমার মতে তা সর্বভারতব্যাপী, তা না হলে অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত চিনা কোম্পানির স্বল্পমূল্যের দ্রব্যে গোটা দেশের বাজার ছেয়ে যেত না। প্লাস্টিকজাত দ্রব্য থেকে মহার্ঘ ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদির স্বল্পমূল্যের বাজার আজ অখ্যাত চিনা কোম্পানির নিম্নমানের দ্রব্যে ভরে গেছে। এ প্রবণতা কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গে আটকে নেই, তা গোটা দেশেই ছেয়ে গেছে, যা দেশের সরকারেরও শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গবাসী গুণমানের সঙ্গে আপোস করেন তা ঠিক নয়।

আসলে দেশবিভাগ ও তৎপরবর্তী অর্থনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিরতা এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের শিল্পপ্রদানগত কারণে বাঙালির অস্থিমজ্জায় মিতব্যয়িতা ঢুকে গিয়েছে, যা কখনও সযনও গুণমানের সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য করায়। দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদে বাঙালি জন্মগতভাবে আমিষভোজী, পাতে বাঙালি আমিষ খুঁজবে, খুব স্বাভাবিক, সে সুযোগ অসাধু ব্যবসায়ীরা ভাগাড়ের মাংস পাতে নিয়ে নিয়েছে, খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু তার দায় কি শুধু আমিষাশী বাঙালির?

পরিশেষে বলি, দীর্ঘদিন দিল্লি প্রবাসের সূত্রে জানি, উত্তর ভারতীয় অনেক জাতিগোষ্ঠী 'শো অফ' বা দেখনদারিতে বিশ্বাসী, কতিপয় আধুনিক শহুরে বাঙালিকে বাদ দিলে বাঙালির রক্তে 'শো অফ' নেই। তাই মহার্ঘ আই-ফোনের বিক্রি বাংলায় বা কলকাতায় স্বাভাবিকভাবেই কম। দিল্লি মুম্বইয়ের আই-ফোন ব্যবহারকারীদের কত শতাংশ তার প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, সম্পূর্ণভাবে, তার কোনও সমীক্ষা হয়নি। হলে জানা যেত, ওই ব্যবহারকারীদের অনেকেই কানে অ্যাপেল কোম্পানির খণ্ডিত আপেলের ছবিযুক্ত স্মার্টফোনটি ধরছেন নিজের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা দেখানোর জন্য, প্রযুক্তির সুবিধা নেওয়ার জন্য নয়। শহরের 'ease of doing business'-এর রান-সংখ্যা বাড়াতে শহুরে মানুষকে প্রযুক্তির প্রয়োজন না থাকলেও আইফোন ব্যবহার করতে হবে, একথা তাই মানা গেল না।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, কলকাতা-৭০০০৪৭

প্রসঙ্গ ডার্ক ম্যাটার

'বেশিটাই অন্ধকার' শীর্ষক বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধে (২ মে ২০১৮) প্রবীর রায় ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি বা আঁধার বস্তু ও আঁধার শক্তির মতো একটা জটিল বিষয় যতটা সম্ভব সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

তবে আমার কিছু সাধারণ ধারণা প্রবন্ধকারকে বলার আছে। যেমন: এক, রহস্যময় শক্তি অর্থাৎ ডার্ক এনার্জি বা আঁধার শক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রবন্ধকার বলেছেন আঁধারবস্তুর মতো এরও উৎপত্তির কোনও কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, এর আগেই তিনি বলেছেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্যালাক্সি বসে আছে আঁধারবস্তুর এক-একটা গোলকের মধ্যে, যাকে বলা হয় গ্যালাক্টিক হেলো। গ্যালাক্সির যে-ঘূর্ণনবেগ তার ওপর অনেকটাই প্রভাব ফেলে এই হেলোস্থিত আঁধারবস্তু বা আঁধারকণাগুলোর ভর। তা হলে বোঝা যাচ্ছে আঁধারবস্তুর বিন্যাস ও বণ্টনের একটা ছবি অন্তত পাওয়া যাচ্ছে।

দুই, প্রবন্ধকার বলেছেন, বিকর্ষণ শক্তি বা আঁধারশক্তি অর্থাৎ মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করছে যে-শক্তি এবং যার ফলে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দ্রুততার সঙ্গে সরে সরে যাচ্ছে, সেই শক্তির আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে। জানতে আগ্রহ হয়, এই আঁধারশক্তি কি ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের প্রায় সমসময় থেকেই আছে, যেমন আছে আঁধারবস্তু বা আঁধারকণাগুলো!

তিন, ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু কতটা তা কি অনেকটাই নির্ভর করছে এই ডার্ক এনার্জি বা আঁধার শক্তি-র ওপর?

চার, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি সম্মিলিত

সাহিত্যবিহার
চিরস্মরণীয় বিজ্ঞানীদের জীবনী
দেবব্রত দাশগুপ্ত
• সামুয়েল হ্যানিম্যান ১৪০ • আইনস্টাইন ১৪০
• ডারউইন ১০০ • মাদাম কুরি ১৫০
• জেমস ওয়াট ৯০ • ল্যাভয়সিয়ার ৭০
• লুই পাস্তুর ৭০ • অলেকজান্ডার ফ্লেমিং ৭০
• নিউটন ১০০ • ফ্র্যাঙ্কলিনও ৪ • মেন্ডেল ৬০
পরিবেশক ওরিয়েন্টাল বুক কো. প্রা. লি.
৫৬ সূর্য সেন স্ট্রিট, কল-৯ • ফোন ২৫৫০-৪৫৩৪, ২৩৫৪-৩৭২৮

গুলশনারা ২৫০
মুসলিম চরিতাভিধান
ড. মালা মৈত্র ও ড. মৌমিতা কর্মকার
মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে জারিগান ৩০০
কথোনা ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯
৮৭৭৭৫৫০৫৯৩, ৯৮৩৬১৪০২৫০

জাতপাত, ধর্ম, বর্ণের ভেদাভেদ, পূজারী ব্রাহ্মণের অবস্থান বর্তমান প্রেক্ষাপটে খোলামেলা আলোচনা
তপনকুমার সেন-এর
তর্কে-বিতর্কে : ধর্ম লোকাচার সংস্কার ২০০
লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রামীণ পুঁথিতে পত্রিকা লেখা পাঠান বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, ফোন ৯৪৩৩৭৬৮০৫
প্রভা প্রকাশনী কলেজস্ট্রিট, ফোন ৯৪৩৩১৯৪২১৮

প্র কা শি ত হ য়ে ছে

লক্ষ্মী চক্রবর্তী-র
চিনিটুস্কু ২০০
রামধনুর মতো চিত্রময় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসধর্মী চিনিটুস্কুর পরিসর ১৯৩৭-২০১৭, বিস্তৃত ক্যানভাস, পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে থাকা অতুলনীয় নিসর্গ বর্ণনা, দেশভাগে ছিন্নভিন্ন পরিবার, ক্ষত-বিক্ষত অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় সমকালীন সমাজ-জীবনের রোলার, আটটি দশকের আবিষ্কৃত এক নিটোল ছবি, দেশভাগ নিয়ে গবেষকদের কাছে এটি একটি আকর হয়ে উঠতে পারে। বইটি নিঃসন্দেহে সংগ্রহযোগ্য।
একুশ শতক ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩

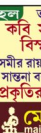
মন্টুকুমার মণ্ডল
রবিভাস্কর রামকিঙ্কর ৩০০
বাংলা সাহিত্যে 'রবিভাস্কর রামকিঙ্কর' একটি বিরল গবেষণামূলক গ্রন্থ
Muni Chakravorti
CANDIDLY 300/-
Philosophy and Life 300/-
Ed. Dr. Prabhakar Bhattacharyya
নিত্যরঞ্জন ধর কথায়, ছড়ায় ও রূপকথায় বাংলার পাখি ২০০
গীতা কাভার বিধিলিপি ১৫০
প্রকাশিত হল
তরুণ মুখোপাধ্যায়
কবি সমর সেন : এক বিস্ময় নাবিক ১০০
সমীর রায় অশরীরী আতঙ্ক ১২৫
সাম্বন্না বরাট গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন
প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি ১৫০
নিজের লেখা বই প্রকাশ করুন
মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন
mainstreampublicationindia@gmail.com
১০এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯
৯৮৩০৩২৫২৮৩
আমাদের বই AMAZON.IN পাওয়া যাবে
(০৩৩)২২৫৭০১৩০
GREEK AND LATIN ANTHOLOGY thought INTO ENGLISH VERSE 500/-
by William Stebbing [Part-I]
(Greek Masterpieces)

ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক শক্তি (ও ভর)–এর ৯৫ শতাংশ। এমনটা কি হতে পারে যে, আমাদের দৃশ্যমান জগৎ যা ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র ৫ শতাংশ, তাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এগুলি এক বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে!

সবশেষে আমার এই চিঠির ইতি টানছি মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিৎজ জুইকি (Fritz Zwicky)কে নমস্কার জানিয়ে।

শ্যামল সাহা, কলকাতা-৭০০০৩৫

উদ্ধৃতিপ্রমাদ এবং...

➡ 'দেশ' (১৭ মে) পত্রিকায় আলপনা রায়ের 'গানের নাটক নাটকে গান' নিয়ে সুধীর চক্রবর্তীর সমালোচনাটি এক কথায় অনবদ্য। তিনি লিখেছেন, "লেখক 'বাঙ্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'-র যুগ থেকে গীতকার-নাট্যরচয়িতার ক্রমিক নাট্যশক্তির বিবর্তন, অন্তত গানের সূত্রে, প্রতিষ্ঠা করেছেন।" — সেই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলতে চাই।

'বাঙ্মীকিপ্রতিভা' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমি গীতকার হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রতি ঋণ জানিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর নাটকটি গীতিনাট্য, অপেরা নয়। অর্থাৎ, এই নাটকের বিষয়বস্তু সুরে সুরে বিধৃত— কিন্তু এতে স্বাধীন গানের সুষমা নেই। এটি নিশ্চয়ই অপেরা ও গানের নাটকের মৌলিক তফাত ধরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কবির একটি মূল্যবান মন্তব্য। সমসাময়িক ইউরোপিয়ান অপেরা এর আগে পুরোপুরি নাটকীয় ভঙ্গিতে গানের সুরে গাওয়া হত, সঙ্গে থাকত শুধু যন্ত্রসংগীতের অনুষঙ্গ। বিষয়বস্তু মূলত ধর্মীয় হত, কিন্তু ধর্ম একটা নাটকীয় নয়। গানের নাটক এসে এই ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিল, সেখানে পরিষ্কার কাহিনির ব্যবহার শুরু হল— একক গান, সমবেত সংগীত আর 'রেসিটেটিভ' (একক সংলাপ ও সংগীতের মাঝামাঝি) ব্যবহার করে। রবীন্দ্রনাথের ১৮৮২-র 'বাঙ্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'-য় এই বিশেষ শৈলীর ব্যবহার সম্ভবত বিখ্যাত জার্মান কম্পোজার রিচার্ড ভাগনারের (১৮১৩-৮৩) সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় ঘটেছিল, মিনি ইউরোপিয়ান অপেরায় যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। ভাগনারের প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ একজন সমালোচকের কথা তুলে একবার বলেছিলেন যে, ভাগনারের আগে অপেরা ছিল কিছু গায়কের ফুসফুসের দমের জোরে উঁচু পর্দায় বাঁধা C-এর নানা প্রয়োগ দেখানো, বিষয়বস্তুর দিকে কোনও দৃকপাত না করে।

রবীন্দ্রনাথের মতোই ভাগনার ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী: গানের নাটক রচয়িতা, নাট্য পরিচালক এবং প্রবন্ধকার, যদিও আদতে তিনি সংগীতকারই— গীতিনাট্য ও লিরিক দুই-ই লিখতেন। ভাগনার বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর সামূহিক শিল্পকৃতি ("Gesamkunstwerk") বা 'টোটাল আর্টওয়ার্কের' সুবাদে, যেহেতু তিনি কাব্য, দৃশ্য, সংগীত আর নাট্যকলার সমাহার ঘটিয়েছিলেন এক জীবনে, আমাদের বিশ্বকবিরই মতো। যদিও শোপেনহাওয়ারের মতোই ভাগনার বিশ্বাস করতেন, সংগীত সব শিল্পের সেরা, তিনি এও মানতেন যে, অপেরার গান নাটকের অনুসারী হবে। উল্লেখযোগ্য যে, ভাগনার এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই সংগীতশিল্পে যে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন, তার প্রধান অংশ ছিল বর্ণময়তা বা chromaticism, শ্রুতির মাধ্যমে স্বরগ্রামের আরোহ ও অবরোহে অবারিত গতিশীলতা আর নিশ্চয়ই তাঁদের ঐতিহ্যময় tonal system।

তবে আর-একটি কথা: কবি যখন 'মায়ার খেলা' রচনা করলেন ১৮৮৮ সালে, তিনি ভাগনারের আগের অপেরা-যুগে ফিরে গিয়েছিলেন, মূলত 'রেসিটেটিভ' ও গানের ব্যবহার করে— সেখানে প্রেম-বিচ্ছেদ-বিরহের বাইরে গল্পের অংশ ছিল না বললেই চলে। (তারও অর্ধ শতাব্দি পরে 'মায়ার খেলা'-কে নৃত্যনাট্য করতে চেয়ে প্রতিমা দেবীর অসফল প্রচেষ্টার কথা সকলেরই জানা।)

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০১০৭

বিজ্ঞপ্তি

এবার থেকে দেশ-এ গল্প, উপন্যাস কিংবা অন্য কোনও লেখা পাঠাতে হলে সেটার ইউনিকোড ফাইল নিজের কাছে রাখবেন। অভ্র, বুন্দা-র মতো আরও কিছু ইউনিকোডের ফন্ট রয়েছে বাংলায়। তাতে লিখুন। আপনি চাইলে, লেখাটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে টাইপ করে আমাদের দফতরে পাঠাতে পারেন। তবে লেখার একটি সফ্‌ট কপি মানে ওয়ার্ড ফাইলে লেখা কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। লেখাটি মনোনীত হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেশ-এর পক্ষ থেকে আমরা সেটা চেয়ে নেব।

দেশ

সম্পাদকীয় বিভাগ

দুই

➡ সুধীর চক্রবর্তীকৃত 'রবীন্দ্রনাট্যে সংগীত' শিরোনামের মনোজ্ঞ আলোচনা প্রসঙ্গে এই চিঠি। আলপনা রায়ের 'গানের নাটক নাটকে গান' বইটির মননশীল ও মনশ্চীমন্তিত আলোচনা করেছেন শ্রদ্ধাভাজন সুধীরবাবু। তবু, হয়তো মুদ্রণপ্রমাদবশতই, আলপনা রায়ের বইটি থেকে উদ্ধৃত দু'টি অংশে অর্থবিভ্রাট ঘটেছে। 'দেশ' পত্রিকার ওই সংখ্যার ৭৯ পৃষ্ঠার মাঝের কলামে উদ্ধৃত 'রবীন্দ্রনাট্যে গীতপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য' স্পষ্টতই আলাদা ক'রে নেওয়া যায় দুটি বিভাজনে; এক গানের নাটক; দুই নাটকে গান।'— এই বাক্যটির 'দুটি বিভাজনে' কথাটি স্পষ্টতই অর্থহীন। আলপনা রায়ের বইতে (পৃ. ১৩) কথাটি আছে 'দুটি বিভাজনে'। এই উদ্ধৃত অংশটিই আবার ওই পৃষ্ঠায় লাল অক্ষরে হাইলাইট করা হয়েছে বলে স্বভাবতই ওই একই ভুল একই পৃষ্ঠায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। নিতান্তই মুদ্রণপ্রমাদ হিসেবে বিষয়টি উপেক্ষা করা যেত হয়তো, কিন্তু আলপনা রায়ের বইয়ের অন্যতম নির্ণায়ক সূত্র এই বাক্যটির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রসঙ্গটি পুনরুত্থাপন করা প্রয়োজন মনে হল। দ্বিতীয় আর-একটি উদ্ধৃতিপ্রমাদ রয়ে গেছে 'দেশ' পত্রিকার ৭৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের মাঝামাঝি। "নাট্যশক্তি অন্বেষণে সংলাপ ও গানের ভিন্নতা দূর হল নাটক রচনার শেষপর্যায়ে, নৃত্যনাট্যে।" আলপনা রায়ের বইয়ের ২৬৪ পৃষ্ঠা অনুসারে 'নাট্যশক্তি' শব্দটি হবে 'নাট্যমুক্তির'।

পরিশেষে, এমন মনোগ্রাহী আলোচনার জন্য সুধীরবাবুকে আরও একবার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন

দোষ শুধু ল্যাপটপের!

➡ 'এ দোষ আমার' (১৭ এপ্রিল ২০১৮) শীর্ষক সুবোধ সরকারের চিঠিটি পড়ে অবাক হলাম। এবং আরও অবাক হলাম 'দেশ' পত্রিকার সেই সংখ্যাটির প্রচ্ছদকাহিনি তাঁকে নিয়েই। একটি স্বীকারোক্তি এবং ল্যাপটপের ওপর দায় চাপিয়েই কি কবি মুক্তি পাবেন?

তপনমোহন চক্রবর্তী, কলকাতা-৭০০০৯১

প্রয়াণ

■ তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং গল্পকার। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে জীবনানন্দ দাশকে পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরবিন্দ গুহ ওরফে **ইন্দ্রমিত্র** (১৯২৮-২০১৮) রচনা করেছিলেন বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ— 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', 'সাজঘর', 'শরৎ কথামালা', 'ইতিহাসে আনন্দবাজার', 'বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা', 'দক্ষিণনায়ক' প্রভৃতি। 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থটির জন্য পেয়েছিলেন রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার (১৯৭২)। পরে ২০০৭ সালে 'দেখাসাক্ষাৎ' কাব্যগ্রন্থের জন্য পুনরায় রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর লেখা 'আপনজন' গল্পটিকেই পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন পরিচালক তপন সিংহ।

■ 'ডোন্ট ইট বিফোর রিডিং দিস'— আমেরিকার একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল এই লেখাটি। প্রকাশের পরই নজর কেড়েছিলেন লেখক **অ্যান্টনি বুরডেন** (১৯৫৬-২০১৮)। 'পার্টস আননোন' নামক টিভি শো-এর মাধ্যমে আমেরিকার সেলেব্রিটি শেফ অ্যান্টনি দর্শকদের হৃদয় জয় করেছিলেন। খাবারদাবার নিয়ে তাঁর গবেষণা, নানা অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ— 'অ্যা কুক্স্ ট্যুর: ইন সার্চ অফ দ্য পারফেক্ট মিল', 'নো রিজ়ার্ভেশনস: অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অন অ্যান এম্পটি স্টম্যাক' প্রভৃতি।

মুখোমুখি ট্রাম্প-কিম

■ বিশ্ব-মিডিয়া, বিশ্বরাজনীতি বহু প্রতীক্ষায় ছিল এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির। উত্তর কোরিয়ার 'কুখ্যাত' একনায়ক কিম জং উন-এর সঙ্গে অবশেষে সাক্ষাৎ-বৈঠক হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের, সিঙ্গাপুর সামিটে। হুমকি-পালটা হুমকি, নিউক্লিয়ার থ্রেট আপাতত ইতিহাস। কারণ, ট্রাম্প নিশ্চিত যে, 'উই উইল হ্যাভ আ টেরিফিক রিলেশনশিপ'।

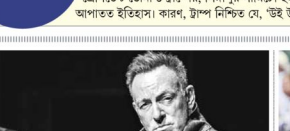

বিশেষ সম্মান

■ 'স্পেশ্যাল টোনি অ্যাওয়ার্ড' পেলেন বিশিষ্ট মার্কিন সংগীতশিল্পী ব্রুস স্প্রিংস্টিন। ৭২তম টোনি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হল। নিউ ইয়র্কের ঐতিহ্যপূর্ণ ব্রডওয়ে থিয়েটারে অনুষ্ঠিত নানা প্রযোজনার মধ্য থেকে 'সেরা' প্রযোজনাগুলিকে বেছে নিয়ে সম্মান জানানো হয় এই পুরস্কার-মঞ্চে। স্প্রিংস্টিন বেশ কিছুদিন ধরেই স্বল্পদৈর্ঘ্যের শো করছিলেন ব্রডওয়ে-তে। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিতেই এই পুরস্কারপ্রদান।

উদীয়মান

■ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অনূর্ধ্ব উনিশ-এ সুযোগ পেলেন অর্জুন তেন্ডুলকর। আগামী জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কায় পাঁচটি ওয়ান-ডে ইন্টারন্যাশনাল এবং দু'টি চারদিবসীয় ম্যাচ খেলবেন তিনি। কিংবদন্তি ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকরের সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে কতটা সফল হবেন অর্জুন— ক্রিকেট-বিশ্ব তাকিয়ে আছে সেই আগামীর দিকে।

ফরাসি ওপেন ২০১৮

■ আবারও শিরোনামে রাফায়েল নাদাল। এই নিয়ে একাদশতম ফরাসি ওপেন খেতাব জয় করলেন তিনি। রোলাঁ-গারোজ-এ তাঁর অপ্রতিরোধ্য পারফরম্যান্স দেখল টেনিস-বিশ্ব। প্রতিপক্ষে ছিলেন অস্ট্রিয়ার ডমিনিক থিম। মহিলাদের বিভাগে খেতাব জিতলেন রোমানিয়ার জনপ্রিয় টেনিসতারকা সিমোনা হালেপ। টেনিসের দুনিয়ায় তিনিও এখন সেরাদের তালিকায় পাকাপাকিভাবে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন। মার্কিন টেনিসতারকা স্লোন স্টিফেন্স-কে হারিয়ে বিজয়ী হলেন সিমোনা।

সু দো কু

১২৩

				৯	৭	৪	৫	
					৮		৩	
		৯			৪			
					৯	৮	৭	
৯		১				৫		২
	৭	৬	২					
			১			৭		
	৯		৮					
	৬	৪	৯	৩				

উপরের চতুষ্কোণটিতে মোট ৯ টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। যে-বর্গক্ষেত্রগুলি ফাঁকা আছে, সেখানে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে ওপরে-নিচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু'বার না বসে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

৮	২	৪	৩	১	৭	৯	৬	৫
৬	৫	৯	৮	২	৪	১	৭	৩
১	৩	৭	৫	৬	৯	২	৮	৪
৭	৮	৩	৪	৯	৬	৫	২	১
৫	১	৬	৭	৩	২	৮	৪	৯
৯	৪	২	১	৮	৫	৭	৩	৬
৪	৯	১	২	৭	৩	৬	৫	৮
২	৬	৫	৯	৪	৮	৩	১	৭
৩	৭	৮	৬	৫	১	৪	৯	২

শে ষ ক থা সুবর্ণ বসু

পড়াশোনার 'আমরা-ওরা'

দুয়োরানির স্থান হিউম্যানিটিজ় বিভাগের। সায়েন্স না পড়লে আবার ভাল ছাত্র কীসের!

আমার পরিচিত জনৈক নামী বাংলা শিক্ষক আমাকে খুব দুঃখ করে বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে বিখ্যাত বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিকের ছাত্ররা কোচিং নিতে আসে। এতে দুঃখ করার কী আছে জিজ্ঞেস করায় উনি বলেছিলেন, "আজ ফিজিক্সের মক টেস্ট, কাল কেমিষ্ট্রির একক্টা ক্লাস, পরশু বায়োলজি টিউশন, বাংলা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। সারা বছর নোট জমিয়ে পরীক্ষার আগে পড়ে নিলেই হল। বাবা-মাকে জানিয়ে কিছু হয় না। বাংলা টিউশন কামাই আবার দোষের নাকি! সব বাবা-মা'রই হাবভাব হল, রকেট সায়েন্স পড়তে তো আর বাংলা জানতে হয় না..."

এ ছবি কিন্তু বহু পুরনো আমল থেকেই একইরকম। শুধু বাংলা নয়, দুয়োরানির মহলে ঠাঁই পেয়ে থাকে আর্টস এবং হিউম্যানিটিজ় বিভাগের সকলেই। সায়েন্স না পড়লে আবার ভাল ছাত্র কীসের! সায়েন্স না পড়লেই 'মধ্যমেধা' গোত্রভুক্ত। এখন তো আবার সায়েন্স পড়ার দিকে শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে যাচ্ছে আলোর গতিতে। বেশ কয়েকটি স্কুল তো নার্সারি থেকেই বাচ্চাদের জয়েন্ট-আইআইটি-আইটি দুনিয়ার প্রতি অভিমুখ তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে। ঘটনা হল, ভবিষ্যতের আইনস্টাইনের বাবা-মা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর বাবা-মাও টোপ গিলছেন টপাটপ। বাচ্চাটির মধ্যে আইনস্টাইন হওয়ার কোনও ইচ্ছে আছে কি না, সে জেনে কী হবে! শিশু তো মাটির তাল! যেভাবে গড়বে, সেভাবেই তৈরি হবে... শুধু 'আর্টস-ফার্টস'-এর মতো রাবিশ, বাচ্চাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখলেই হল।

আমার সন্তান সায়েন্স পড়বেই! চাঁদে রকেট না পাঠাক, তৃতীয় শ্রেণির একটা আইটি ফার্মে সকাল আটটা থেকে রাত আটটার জোয়ালই ঠেলুক, তাতে কী! ছেলে একবার মাধ্যমিকের পর আর্টস পড়বে বলেছিল বটে, কিন্তু বাবা-মা হয়ে তো আজেবাজে খেয়ালখুশিতে কান দিলে চলে না...' মনোভাব স্পষ্টই এরকম এবং তা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়। বিদ্যার অসঙ্গত বিভাজনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ভাল ছেলেরা সায়েন্স, মাঝারিরা কমার্স, যাদের কিছুই হওয়ার নয় তারা আর্টস। সায়েন্সেও আবার পরিষ্কার মাথারা পড়বে ফিজিক্স-কেমিষ্ট্রির মতো পিয়ার সায়েন্স, বাকিরা বায়োলজি জাতীয় 'ইমপিয়োর'(!) সায়েন্স ইত্যাদি। আমরা ভুলে যাই যে, ছাত্ররা তার আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নিয়ে সাধনা করলেই উৎকর্ষের সীমা স্পর্শ করতে পারে, সে সাধনার পথ যা-ই হোক না কেন! মিলটনকে চাবকে নিউটন করার চেষ্টায় সমাজে বকচ্ছপ জাতীয় জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া কিছু হয় না। সাম্প্রতিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বহু পস্তিতম্মন্য অভিভাবকের চোখ কপালে তুলে দিয়ে একজন কলাবিভাগের ছাত্র রাজ্যে প্রথম হয়েছে। বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য সায়েন্স-পড়া ফড়ুয়ারাও ছুঁতে পারেনি তাকে। এই ঘটনা বিরল, কিন্তু এতে মানুষের চোখ খোলা উচিত। এই ছেলেটি তার পছন্দের বিষয় পড়তে বাড়ির সমর্থন পেয়েছে, তাই তার সেরাটা দিতে পেরেছে। অ্যাপটিটিউড তৈরি করে দেওয়া যায় না, এটা মানুষ নিয়ে আসে এবং কেরিয়ারের প্রশ্নে অ্যাপটিটিউডকে গুরুত্ব দিতে হয়। এই সত্যিটা বাবা-মায়েরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল। নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের বোঝা বাচ্চাদের কাঁধে চাপিয়ে তাদের 'আউট অফ কমফর্ট জ়োন'-এ পাঠানোটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়, তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা। এ খেলা এবার বন্ধ হোক।

মিলটনকে চাবকে নিউটন করার চেষ্টায় সমাজে বকচ্ছপ জাতীয় জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া কিছু হয় না।

কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতাল

মা হওয়া মুখের কথা নয়

আপনার সন্তান জন্মানোর আগে কখনো অবস্থা জটিল হয়ে পড়তে পারে

আশঙ্কাজনক গর্ভাবস্থা এবং নিওন্যাটাল কেয়ার–এর জন্য

আমাদের কল করুন: ৯৮৩৬০ ১৭৫০১

কলম্বিয়া এশিয়া হাসপাতাল - সল্টলেক

আই.বি. - ১৯৩, সেক্টর III, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

০৩৩-৩৯৮৯ ৮৯৬৯ / ৬৬০০ ৩৩০০

০৯৮৭৪৮৫১৫১৪

www.columbiaasia.com

www.facebook.com/ColumbiaAsiaIndia

COLUMBIA ASIA

INDIA | INDONESIA | MALAYSIA | VIETNAM

BANGALORE | GHAZIABAD | GURGAON | KOLKATA

MYSORE | PATIALA | PUNE | AHMEDABAD